১৯২০ সালে সাহিত্যে
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
নরওয়েজীয় লেখক

ন্যুট হ্যামসুন

ক্ষুধা

অনুবাদ সৌরীন নাগ

ন্যুট হ্যামসুন ১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ক্ষুধা (হাঙ্গার) উপন্যাসটি প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর সেরা উপন্যাসগুলির অন্যতম। এই উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যুট হ্যামসুন সাহিত্য-প্রেমী পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত এই উপন্যাসটি একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেদন এবং বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বাস্তবতা আর উপন্যাসটির গঠন ও বিন্যাস অত্যন্ত ইমপ্রেশনিস্টিক। একটা মানুষের চরিত্র, তার নৈতিকতা আর জীবনবোধ খাদ্য না পেলে কিভাবে প্রভাবিত হয়, এটি তার একটি উৎকৃষ্ট, জাজ্বল্যমান আলেখ্য। এটি সত্যিই সাহিত্যের শিল্পে উত্তরণ।

হাঙ্গার-কে আধুনিক ধারার উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি প্রধান সাহিত্যকর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এটি পরবর্তীকালে জয়েস এবং কাফকা থেকে কামু এবং কেলম্যান পর্যন্ত সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। অস্‌লো শহরের পটভূমিতে লেখা হাঙ্গার পাঠকদের একটা অল্পবয়সের লেখকের মনোজগতে টেনে নিয়ে যায়। যে লেখক কখনো আনন্দবিহ্বলতা কখনো হতাশার অন্ধকার, এই দুই-এর চরম অবস্থার মধ্যে দোদুল্যমান। এটি মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত রহস্যভূমির একটা সমীক্ষা– অভিজ্ঞতার শেষ সীমানায় যেখানে খুব কম লেখকই যেতে সাহস করেন।

ক্ষুধা

SULT

(Hunger)

KNUT HAMSUN

১৯২০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নরওয়েজীয় লেখক

ন্যুট হ্যামসুন

ক্ষুধা

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

ISBN-984-70209-0033-7

ক্ষুধা

মূল : ন্যুট হ্যামসুন

অনুবাদ : সৌরীন নাগ

Sult by Knut Hamsun
Copyright © Gyldendal Norsk Forlag AS 1890
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১০

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : info@sandeshgroup.com
www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৯৫.০০ টাকা

অনুবাদকের উৎসর্গ

ছোটবেলায় আমাদের বারো ভাইবোনের বৃহৎ সংসার
যে সামান্য শিক্ষিতা বিধবা মহিলা একা হাতে সামলেছেন,
কোনো সন্তানকে না খেয়ে থাকতে দেননি,
অথচ নিজে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করেছেন আর
প্রত্যেকটি সন্তানকে একা হাতে লড়াই করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,
আমার সেই পরম রমণীয়া পূজনীয়া মা'য়ের উদ্দেশে

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

১.

সেই সময়ের কথা, যখন আমি ভবঘুরে এবং ক্রিশ্চিয়ানাতে না খেয়ে পড়ে আছি। ক্রিশ্চিয়ানা, একটা অনন্য শহর, যেখান থেকে চলে গেলেও সেখানকার সাময়িক বসবাসের স্মৃতির ছোঁয়া গায়ে লেগে থাকে।

চিলেকোঠার ঘরটিতে জেগে শুয়ে আছি। নিচের থেকে কোনো ঘড়িতে ছটা বাজবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ততক্ষণে বেশ রোদ উঠে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে লোকজনের নামা-ওঠা শুরু হয়ে গেছে। দরজার পাশে ঘরের দেওয়ালে যেখানে 'মর্গেনব্লাডেট' কাগজের পুরনো সংখ্যাগুলো সাঁটা রয়েছে, সেখানে বাতিঘরের ডাইরেক্টরের একটা নোটিশ আর তার একটু বাঁ দিকে ফ্যাবিয়ান ওলসেন-এর তাজা সেঁকা পাউরুটির একটা বড়সড় বিজ্ঞাপন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

চোখ খোলামাত্র পুরনো অভ্যেসে আমি ভাবতে শুরু করলাম এই নতুন দিনটিতে আনন্দ করার মতো কিছু আছে কিনা। সম্প্রতি আমার বেশ দুরবস্থা চলছে, নিজস্ব জিনিসপত্রগুলো একটার পর একটা আমার 'খুড়ো'র কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে। স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছি, খিটখিটে হয়ে পড়েছি। কয়েকবার সারাদিন মাথা ঝিমঝিমানি নিয়ে বিছানায় পড়েছিলাম। মাঝেমধ্যে ভাগ্য সহায় হলে খবরের কাগজে একটা ছোটখাটো পর্যালোচনা লিখে পাঁচ শিলিং জোগাড় করতে পেরেছি।

রোদ আরো চড়া হচ্ছে। আমি দরজার পাশে সাঁটা কাগজে বিজ্ঞাপনগুলো পড়তে শুরু করলাম। এমনকি, ডানদিকে দাঁত বের করা হেলানো অক্ষরে 'মিস অ্যান্ডারসেনের দোকানে শবাচ্ছাদনের বস্ত্র বিক্রয়' পর্যন্ত পড়তে পারছিলাম। এতে আমি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম। নিচের ঘড়িতে যখন আটটা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম, তখন আমি উঠে কাপড়চোপড় পরে নিলাম।

জানালা খুলে বাইরে তাকালাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে একটা কাপড় টাঙানোর তার আর খানিকটা খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছিল। আরো খানিকটা দূরে একটা পুড়ে যাওয়া কামারশালার ধ্বংসস্তূপ, কিছু মজুর পরিষ্কার করছিল। জানালার ফ্রেমে কনুই-এ ভর দিয়ে আমি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিনটা, মনে হয়, পরিষ্কার যাবে- শরৎকাল এসে গেছে; বছরের সেই নরম, ঠাণ্ডা সময় যখন সব কিছুর রঙ বদলায় আর মরে যায়। রাস্তার ক্রমবর্ধমান গোলমাল আমাকে বাইরে টানছে। শূন্য ঘরটা, যার মেঝেয় পা ফেললে ওপরে নিচে দুলতে থাকে, মনে হল একটা হাঁ করা অলক্ষুনে কফিন। ঘরে কোনো আগুন জ্বালানোর স্টোভ নেই আর দরজাটাও ঠিকভাবে আঁটকানো যায় না। রাত্রে আমি মোজা পরেই শুতাম, যাতে সকাল হতে হতে একটু শুকিয়ে যায়। ঘরে কেবল একটাই জিনিস ছিল, একটা লাল রঙের ছোট দোলনা চেয়ার, যেটাতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসে ঝিমুতে ঝিমুতে আমি সব রকম বিষয়ের ভাবনায় ডুবে থাকতাম। যখন বাতাস খুব জোরে বইত, আর নিচের দরজাটা খুলে যেত, ঘরের মেঝে আর দেওয়াল ফুঁড়ে নানা রকম ভুতুড়ে আওয়াজ গোঙানির মতো উঠে আসত; আর দরজায় সাঁটা মর্গেনব্লাডেট কাগজটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে যেত। বিছানার পাশে ঘরের কোনায় রাখা পুঁটলিটা হাতরাতে লাগলাম, যদি প্রাতরাশ সারার মতো কিছু থাকে, কিন্তু কিছুই না পেয়ে ফের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঈশ্বর জানেন, চাকরি-বাকরি কিছু পাব কিনা। প্রায়ই তো তাড়িয়ে দিয়েছে, বা কথা দিয়ে কথা রাখেনি, বা সোজাসুজি মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছে; কত আশা লালন করেছি, কতবার প্রতারিত হয়েছি, আবার আশায় বুক বেঁধে নতুন করে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো ফলই হয়নি, আর এইসব মিলে আমার সাহসকে মেরে ফেলেছে। শেষ ভরসা হিসেবে ঋণ আদায়কারী পদের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু তাতেও খুব দেরি করে পৌঁছেছিলাম আর তাছাড়া জামিন হিসেবে পঞ্চাশ শিলিংও জোগাড় করতে পারতাম না। সব সময়েই কিছু না কিছু বাধা এসে যাচ্ছে। এমনকি দমকল বাহিনীতে নাম লেখানোর জন্যও গিয়েছিলাম। ওখানে একটা ঘরে আমরা, জনাপঞ্চাশেক লোক, বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, যেন আমরা কতই শক্তিশালী আর সাহসী। একজন ইন্সপেক্টর সামনে পেছনে ঘুরে ঘুরে দরখাস্তকারীদের দেখছিলেন, হাত-টাত টিপে দেখছিলেন আর কাউকে কাউকে কিছু প্রশ্ন করছিলেন। আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় উনি কেবল মাথা নেড়ে বললেন যে আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ থাকার দরুন আমাকে বাতিল করা হল। আমি দ্বিতীয়বার দরখাস্ত করলাম আর এবার চশমা ছাড়াই লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ভুরু কুঁচকে চোখ দুটোকে ছুঁচের মতো সরু করে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু সেই ভদ্রলোকই এবারও আমার সামনে দিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন, কারণ উনি আমায় চিনতে পেরেছিলেন। আর সবচেয়ে খারাপ হল এই যে, এরপর আর কোনো চাকরির জন্যই আমি ভদ্রলোক সেজে দরখাস্ত করতে পারলাম না।

অনেক দিন ধরেই আমার অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত এখন আমার নিজস্ব বলতে কিচ্ছু নেই। একটা চিরুনী পর্যন্ত নেই, মন খারাপ হলে পড়বার মতো একটা বই-ও নেই। সারাটা গ্রীষ্মকাল ধরে গীর্জা সংলগ্ন কবরখানায় বা পার্কে, যেখানে বসে সাধারণত আমি খবরের কাগজের জন্য লিখতাম, বসে আমি নানান বিষয়ের ওপর লেখা নিয়ে ভেবেছি। আমার অস্থির মস্তিষ্কপ্রসূত কত না অদ্ভুত ধারণা, খেয়ালী স্বপ্ন, উদ্ভট চিন্তা। হতাশ হয়ে আমি এমন সব অকল্পনীয় বিষয় বেছে নিয়েছি, যা নিয়ে ভাবতে এবং লিখতে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। একটা লেখা শেষ হলেই আমি আর একটা নিয়ে পড়েছি। সম্পাদক 'না' বললেও আমি হতোদ্যম হইনি। নিজেকে খালি বোঝাতাম, একদিন আমার সাফল্য আসবেই এবং সত্যিই, মাঝে মাঝে কখনো ভাগ্য সহায় হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হত এবং একটা পুরো বিকেলের কাজের জন্য আমি পাঁচ শিলিং পেয়েও যেতাম।

আবার আমি জানালা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আর হাত-মুখ ধোয়ার জায়গায় গিয়ে জল নিয়ে আমার প্যান্টের হাঁটুর জায়গাটা ঘষতে লাগলাম, যাতে অতি ব্যবহারে চকচকে হয়ে যাওয়া জায়গাটা একটু নতুনের মতো দেখায়। তারপর যথারীতি পকেটে পেন্সিল আর কাগজ ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খুব চুপিচুপি চোরের মতো সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, যাতে বাড়িওয়ালি শুনতে না পায়। বেশ ক'দিন হল বাড়িভাড়া বাকি পড়ে গেছে আর আমার কাছে বাড়ি ভাড়ার টাকা জোগাড় করার মতো কিচ্ছু নেই।

ন'টা বাজে। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার, কচোয়ানের চাবুক হাঁকড়ানোর, লোকজনের চলাচলের, কথা-বার্তার আওয়াজ, একটা প্রচণ্ড ব্যস্ত সকাল। রাস্তায় সর্বত্র এই শব্দতাণ্ডবে আমার মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হল এবং আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম। খোলা হাওয়ায় প্রাতর্ভ্রমণ করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। এই বাতাস আমার ফুসফুসে কী করবে? আমি একটা দৈত্যের মতো শক্তিশালী। কাঁধ দিয়ে একটা মালভর্তি ঠেলাগাড়িকে আটকে দিতে পারি। মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল আর একটা যা খুশি তাই করতে পারি ভাব আমার ওপর ভর করল। যেসব লোক আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, দেওয়ালে সাঁটা ইশতেহারগুলো পড়তে লাগলাম, এমনকি চলন্ত ট্রামগাড়ি থেকে কেউ আমাকে তাকিয়ে দেখছে, এটাও লক্ষ্য করলাম, আমার চলার পথে ঘটতে থাকা প্রতিটি সামান্য, তুচ্ছ ঘটনাগুলোও যেন আমার বেশ ভাল লাগছিল।

এই রকম একটা হাসিখুশি দিনে যদি সামান্য একটু খাবারও পাওয়া যেত। আনন্দময় সকালের এই বোধটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার মনের সন্তুষ্টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠল আর কোনো কারণ ছাড়াই আমি আনন্দে গুনগুন করে গেয়ে উঠলাম।

মাংসের দোকানে এক মহিলা সসেজ-এর দরদাম করছিল। আমি তার পাশ দিয়ে যাবার সময়, সে আমার দিকে তাকাল। ওর মুখের সামনের পাটিতে মাত্র

একটা দাঁত। গত কদিনে আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম এবং সামান্য কারণে এত ঘাবড়ে যেতাম যে, মহিলার মুখটা আমার ওপর একটা জঘন্য ছাপ ফেলল। ওর মাড়ি থেকে বেরোনো লম্বা, হলদে গোঁজটা যেন একটা আঙুলের মতো দিক-নির্দেশ করছে আর ও যখন আমার দিকে তাকাল, ওর চোখের দৃষ্টিতে যেন সসেজ মাখানো। হঠাৎ আমার খিদে একেবারে মরে গেল আর একটা বমির ভাব জেগে উঠল। বাজার এলাকায় পৌঁছে আমি একটা কল থেকে জল খেলাম। ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, টাওয়ারের ঘড়িতে দশটা বাজে।

রাস্তা দিয়ে আনমনে হেঁটে চললাম, কোনো কিছুই আমার মনে দাগ কাটছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর কিছু না ভেবেই পাশের রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, মনোরম সকাল বেলাটায় সুখী মানুষদের মাঝখানে বেপরোয়া মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরিষ্কার ঝকঝকে বাতাস বইছে, আমার মনের মধ্যেও কোনো ছায়া নেই।

গত দশ মিনিট ধরে একটা বুড়ো খোঁড়া লোক আমার আগে আগে যাচ্ছে। ওর এক হাতে একটা পোঁটলা, ওর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তাড়াতাড়ি হেঁটে যাবার চেষ্টা করছে। ওর হাঁফানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, ভাবলাম ওর পোঁটলাটা আমার হাতে দিতে বলি, কিন্তু এগিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই আমি করলাম না। গ্র্যান্ডসেন-এ পৌঁছে হ্যান্স পওলি-র সাথে আমার দেখা হল, ও কিন্তু মাথা নেড়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ওর কীসের এত তাড়া? ওর কাছে এক শিলিং চাইবার আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না, তাছাড়া কয়েক সপ্তাহ আগে ওর কাছ থেকে যে কম্বলটা আমি ধার নিয়েছিলাম,সেটা প্রথম সুযোগেই ফেরত দেবার ইচ্ছে ছিল।

একটু দাঁড়াও, মই-এর ধাপে আমার পা-টা রাখতে দাও, কোনো মানুষের কাছে আমার কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না, এমনকি একটা কম্বলের জন্যও নয়। হয়তো আজই আমি একটা লেখা শুরু করতে পারি, 'ভবিষ্যতের অপরাধবৃত্তি,' কিংবা 'ইচ্ছার স্বাধীনতা'ও হতে পারে, যা মানুষে পড়বে, যার জন্য অন্তত দশ শিলিং আমি পাবোই। চিন্তাটা মাথায় আসামাত্রই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এক্ষুনি লেখাটা লিখে ফেলতে হবে, মাথার ভেতর বিষয়বস্তুগুলো গাদাগাদি করে আছে, ওগুলো বের করে ফেলতে হবে। পার্কে বসে লিখবার জন্য একটা সুবিধামতো জায়গা দেখতে হবে আর লেখাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিশ্রাম নয়।

কিন্তু খোঁড়া বুড়োটা এখনও আমার আগে আগে সেই হাত-পা টান-টান করে রাস্তা দিয়ে চলেছে। আমার সামনে এই পঙ্গু প্রাণীটার ক্রমাগত হেঁটে যাওয়া, মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে হাঁটছে, আমার মনে দারুণ অস্বস্তির উদ্রেক করল। মনে হচ্ছে, ও বোধহয় মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যে, আমি যেখানে যাব, ও-ও সেখানেই যাবে এবং সমস্ত পথটা ও আমার চোখের সামনে থাকবে। এই অস্বস্তির মধ্যে আমার মনে হল, ও যেন প্রতিটি রাস্তার মোড়ে ওর হাঁটার গতি কমিয়ে দিচ্ছে, যেন দেখতে চায় আমি কোন্‌দিকে যাব, আর তারপরই ওর হাতের পোঁটলাটা

দুলিয়ে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে হাঁটবে, যাতে আমার আগে আগে থাকতে পারে। এই বিরক্তিকর লোকটাকে দেখতে দেখতে আমি ওর পেছন পেছন যেতে থাকি, আর প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে। বুঝতে পারছি যে, একটু একটু করে ও আমার খুশির মেজাজটা নষ্ট করে দিচ্ছে আর এই অনাবিল, সুন্দর সকালটাকে ওর নিজস্ব কুশ্রীতার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন একটা বিশাল হাত-পা ছড়ানো সরীসৃপ, সর্বশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে জায়গা করে নিতে চাইছে আর রাস্তার ফুটপাথটায় নিজের মালিকানা কায়েম করতে চাইছে। টিলাটার ওপরে যখন পৌঁছলাম, তখন মনে মনে ঠিক করলাম, এটাকে আর চলতে দেওয়া যায় না। আমি একটা দোকানের জানালায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, যাতে ও এগিয়ে চলে যায়। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যখন আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম, তখনও লোকটা আমার আগে আগেই হাঁটছে, তার মানে, ও-ও একদম চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কী করছি তা না ভেবেই আমি রাগের চোটে তিন চারটে বড় বড় পা ফেলে ওকে ধরে ফেললাম আর ওর কাঁধে এক চড় কষালাম।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল আর আমরা পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। মাথাটা একপাশে বেঁকিয়ে ও গুঙিয়ে উঠল, 'দুধ খাব, আধা পেনি দিন।'

ও, তাহলে এই ব্যাপার। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি বললাম, 'দুধ খাবে, অ্যাঁ? হুম, আজকাল টাকা-পয়সা দুর্লভ হয়ে পড়েছে আর আমিতো জানিই না তোমার কত দরকার।'

'গতকাল থেকে একটা দানাও পেটে পড়েনি; একটা ফার্দিং-ও নেই আর এখনও পর্যন্ত কোনো কাজও জোটেনি।'

'তুমি কি মিস্ত্রি?'

'হ্যাঁ, আমি একজন বাঁধিয়ে।'

'একজন কী?'

'একজন জুতা বাঁধিয়ে; অবশ্য আমি জুতা তৈরি করতেও পারি।'

'ও! তাহলে তো অন্য ব্যাপার।' আমি বললাম, 'এখানটায় মিনিট কয়েক দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য কিছু পয়সাকড়ির ব্যবস্থা করি, নিদেনপক্ষে কয়েক পেনি।'

আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাইল স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চললাম, ওখানে একটা বাড়ির তিন তলায় একজন বন্ধকী কারবারীর দোকান আছে আমি জানি (যদিও ওর দোকানে আমি আগে কখনও যাইনি)। বাড়িটার হলঘরে ঢুকে আমি তাড়াতাড়ি আমার ওয়েস্টকোটটা খুলে গুটিয়ে নিলাম আর ওটা বগলে চেপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দোকানের দরজায় ধাক্কা দিলাম। ঢুকে আমি নমস্কার জানালাম আর ওয়েস্ট কোটটা কাউন্টারের ওপর রাখলাম।

'এক শিলিং ছ পেনী,' লোকটা বলল।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' আমি বললাম, 'এটা আমার গায়ে একটু ছোট হচ্ছিল, নইলে এটাকে বিদায় করতাম না।'

টাকাটা আর রসিদটা নিয়ে আমি ফিরে চললাম। সবদিক ভেবে দেখলে এই ওয়েস্টকোট বাঁধা দেওয়ার মতলবটা দুর্দান্ত। খুব ভালভাবে প্রাতরাশ সারার মতো যথেষ্ট টাকাও হাতে থাকবে, আর সন্ধের আগেই আমার 'ভবিষ্যতের অপরাধবৃত্তি' প্রবন্ধটাও লেখা হয়ে যাবে। বেঁচে থাকাটা বেশ লোভনীয় মনে হতে লাগল আর আমি তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে ফিরে এলাম ওর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য।

'এই যে,' আমি বললাম, 'আমি খুব খুশি যে তুমি প্রথমে আমার কাছেই চেয়েছ।'

লোকটা টাকাটা হাতে নিয়ে আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ও কী দেখছে? আমার মনে হল, ও আমার প্যান্টের হাঁটুর কাছটা নিরীক্ষণ করছে আর ওর এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা আমাকে বিরক্ত করে তুলল। আমার চেহারা দেখে ছোটলোকটা কি আমাকে সত্যিই গরিব ভাবছে? আমি একটা আধা গিনি মূল্যের লেখা লিখতে যাচ্ছি না? তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য আমি মোটেই ভীত নই। আমার মাথায় অনেক লেখা মজুত আছে। এই রকম একটা সুন্দর দিনে একটা অচেনা লোক, যাকে কিনা আমি দুধ খাবার টাকা দিলাম, আমার দিকে কেন এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে? লোকটার চোখের দৃষ্টি দেখে আমি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠলাম আর ভাবলাম, যাবার আগে ওকে ভালো রকম শিক্ষা দিতে হবে। আমি কাঁধ উঁচিয়ে বলে উঠলাম।

'ও ভাই, একজন ভদ্রলোক তোমাকে একটা শিলিং দিল আর তুমি তার হাঁটুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, এটা তো খুব বাজে অভ্যেস।'

লোকটা পেছনের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু ওর শূন্য মুখগহ্বর থেকে কোনো কথাই বেরোল না। শেষ পর্যন্ত ও ভাবল বোধ হয় আমি ওকে কোনোভাবে হ্যাটা করতে চাইছি, কারণ ও আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিল। আমি ফুটপাথে পা ঠুকে ওকে দিব্যি দিয়ে টাকাটা রেখে দিতে বললাম। ও কি ভাবল আমি বিনা কারণে এত কষ্ট করলাম? হয়তো আমি ওর কাছে এক শিলিং ঋণী ছিলাম, সেই পুরনো ঋণ এখন শোধ করলাম। ও একটা সৎ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একজন সম্মানীয় লোক, এক কথায় এই টাকাটা ওর। ওঃ, না, কোনো ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, এতে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। বিদায়!

আমি এগিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত এই অকেজো উপদ্রবটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, এখন আমি শান্তিতে নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আমি আবার পাইল স্ট্রিটে ঢুকলাম আর একটা মুদিদোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানালায় থরে থরে খাদ্যদ্রব্য সাজানো রয়েছে। ঠিক করলাম, ভেতরে গিয়ে কিছু নিতে হবে।

'এক টুকরো চিজ আর একটা ফ্রেঞ্চ রোল দিন,' আমার ছ' পেনীটা কাউন্টারে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম।

'পুরো টাকায় রুটি আর চিজ?' মেয়েলোকটা আমার দিকে না তাকিয়েই বিদ্রূপের স্বরে বলল।

'হ্যাঁ, পুরো ছ'পেনীর,' আমি অবিচলিতভাবে উত্তর দিলাম।

আমি খাবারগুলো নিয়ে খুব নম্রভাবে মোটা বুড়িকে সুপ্রভাত জানিয়ে কাসল হিল হয়ে পার্কের দিকে জোর দৌড় লাগালাম।

একটা বেঞ্চে বসে খাবারগুলো গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম। আমার ভালই লাগছে, অনেকদিন হল এমন পেট ভরা খাবার খাইনি, আর একটু একটু করে একটা পরিতৃপ্তির শান্তভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, যেমনটা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর হয়ে থাকে। আমার সাহস বেড়ে গেল। 'ভবিষ্যৎ-এর অপরাধবৃত্তি,' এ রকম একটা সহজ, সোজা-সাপটা প্রবন্ধ, যা একটা গাধাও ইতিহাসের পাতা খুঁজে লিখে ফেলতে পারে, তা লিখে আমি মোটেই খুশি হব না। এর চেয়ে আরও মহৎ কিছু লেখার ক্ষমতা আমার আছে, সব কঠিন বাধা জয় করার মেজাজ নিয়ে স্থির করলাম, 'দার্শনিক জ্ঞান' এই বিষয়ের ওপর তিন অধ্যায়ের একটা প্রবন্ধ লিখব। এতে কান্ট-এর কুযুক্তিগুলোকে নির্দয়ভাবে চূর্ণ করার সুবিধা পাব,– কিন্তু লেখা শুরু করার জন্য কাগজ পেন্সিল বার করতে গিয়ে দেখলাম যে, পেন্সিলটাই নেই। ওটা আমি বন্ধকী-দোকানে ভুলে ফেলে এসেছি, আমার ওয়েস্ট কোটের পকেটেই পেন্সিলটা রয়ে গেছে।

হা ঈশ্বর! আজ সবকিছুই যেন আমাকে বাধা দিয়ে মজা পাচ্ছে। আমি কয়েকবার দিব্যি গাললাম, বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আর পার্কের রাস্তায় বার দুয়েক ঘুরপাক খেলাম: চারপাশে সব কিছু একদম চুপচাপ, নিচে রানীর বাগানের দিকে দুজন আয়া তাদের প্যারাম্বুলেটর ঠেলে নিয়ে চলেছে, এছাড়া কোথাও কোনো প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে না। আমার মেজাজটা একদম তেতো হয়ে গেছে, আমি পাগলের মতো বেঞ্চিটার সামনে ঘুরপাক খাচ্ছি। কী অদ্ভুতভাবে সব কিছু বেঁকে চুরে যাচ্ছে। ভাবতে পারা যায় যে, আমার পকেটে একটা একপেনীর পেন্সিল নেই, এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা আমার তিন অধ্যায়ের প্রবন্ধটাকে একদম ধসিয়ে দিল। পাইল স্ট্রিটে ফিরে গিয়ে কি আমার পেন্সিলটা চেয়ে নিয়ে আসব? ভ্রমণকারীদের ভীড়ে পার্কটা ভরে যাওয়ার আগে একটা লেখা শেষ করার মতো সময় এখনও আছে। 'দার্শনিক জ্ঞান'- এই প্রবন্ধটার ওপর কত লোকের ভালমন্দ নির্ভর করছে, কেউ বলতে পারে না; আমি নিজেকে বোঝালাম যে, এতে অনেক অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের অনেক উপকার হতে পারে। পরে ভেবে দেখলাম যে কান্টের ওপর আক্রমণ করব না, এটা আমি এড়িয়ে যেতে পারি। সময় ও স্থানের প্রশ্নে যখন আসব, তখন ওই জায়গার ওপর দিয়ে অস্পষ্ট হাল্কা ভাবে ভেসে গেলেই হবে, অবশ্যই রেনান, বুড়ো যাজক রেনানের হয়ে জবাবদিহি করব না।

যেভাবে হোক, কয়েক কলাম-এর এই প্রবন্ধটাকে শেষ করতেই হবে। না-দেওয়া ভাড়া আর সকালবেলা সিঁড়িতে দেখা হওয়া বাড়িওয়ালির সন্ধানী চাউনি আমাকে সারাদিন পীড়ন করেছে। আমার খুশির মুহূর্তগুলোতে যখন আমার মনে কোনো বিষণ্ন ভাবনা নেই, তখনও মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা বন্ধ করতেই হবে, তাই আমি পার্ক থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে বন্ধকী দোকান থেকে আমার পেন্সিলটা আনতে ছুটলাম।

টিলার পাদদেশে পৌঁছে আমি দু'জন মহিলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। যাবার সময় অন্যমনস্কভাবে ওদের একজনের হাতে আলতো ছোঁয়া লেগে গেল। চোখ তুলে দেখলাম একটা ভরাট, একটু ফ্যাকাশে মুখ। কিন্তু তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল, আর হঠাৎ সেই মুখ আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠল। জানি না, কেন তার মুখ লজ্জায় লাল হয়। হয়তো কোনো পথচারীর কোনো কথা শুনে কিংবা নিজেরই মনের কোনো লুকোনো ভাবনা থেকে। অথবা আমি যে ওর হাতটা ছুঁয়ে ফেলেছি, তার জন্যেই কি? তার ভরাট, উঁচু বক্ষদেশ কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল আর সে তার হাতের ছাতার বাঁটটা সজোরে মুঠো করে ধরল। তার হ'লটা কী?

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর ওকে এগিয়ে যেতে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অসাধারণ বলে মনে হল, আমি আর এগিয়ে যেতে পারলাম না। এমনিতেই আমার মেজাজটা খিঁচড়ে আছে, পেন্সিলের ব্যাপারে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে আছি আর একেবারে খালি পেটে এতগুলো খাবার খেয়ে শরীরটাও গণ্ডগোল করছে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বদখেয়াল চাপল। একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হল মহিলাকে ভয় পাইয়ে দিই, ওর পেছন পেছন যাই, আর যে কোনোভাবে ওকে বিরক্ত করি। আমি আবার ওকে পার হয়ে গেলাম আর তারপরেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে একেবারে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম, যাতে ওকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারি। দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আর আচমকাই ওর জন্য একটা নাম আমি ঠিক করে ফেললাম। এমন নাম যা আমি এর আগে কোনোদিন শুনিনি, অথচ নামটায় একটা হাওয়ায়-ভেসে-যাওয়া নার্ভাস অনুরণন আছে, 'ইয়ালাজালি'! ও যখন আরো কাছে ঘেঁষে এল, আমি সটান দাঁড়িয়ে গভীর গলায় বললাম, 'মাদাম, আপনার বইটা পড়ে গেছে।' বলবার সময় আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ শুনতে পেলাম।

'আমার বই?' সে তার সঙ্গিনীকে জিগ্যেস করল, তারপর হাঁটতে শুরু করল।

আমার শয়তানি বেড়েই চলেছে, আমি আবার ওদের অনুসরণ করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমি থামতে পারছি না, পাগলের মতো রঙ্গ কৌতুকের খেলায় মেতে উঠেছি। আমার এলোমেলো মনের অবস্থায়, মাথায় যত উদ্ভট চিন্তা আসছে, সব অন্ধের মতো করে চলেছি। নিজেকে যতই বোঝাই না কেন যে, আমি একটা বোকার মতো কাজ করে চলেছি, কিন্তু নিজেকে থামাতে পারছি না। মহিলাদের পেছন থেকে আমি একটা গাড়লের মতো ভেংচি কাটছি আর মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রচণ্ড জোরে কাশতে লাগলাম। এইভাবে

খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম, সব সময়েই ওদের থেকে কয়েক পা আগে। টের পেলাম, ওর দৃষ্টি আমার পিঠে বিঁধছে। অজান্তেই আমার মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে গেল, ওর বিরক্তির উদ্রেক করছি ভেবে। একটু একটু করে একটা আশ্চর্য উপলব্ধি হতে লাগল, যেন আমি অনেক অনেক দূরে অন্য একটা জগতে আছি আর এই যে পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে লোকটা, সেটা আমি নই।

মিনিট কয়েক পরে ওরা পাশ্‌কার বইয়ের দোকানের কাছে পৌঁছল। আমি আগে থেকেই দোকানের একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আর ওরা পাশ দিয়ে যাবার মুহূর্তে আমি এগিয়ে এসে পুনরাবৃত্তি করলাম, 'আপনার বইটা পড়ে গেছে মাদাম।'

'না; কী বই?' সে ভীত স্বরে বলে উঠল, 'কী বইয়ের কথা লোকটা বলছে, বলতে পারিস?' মহিলা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওর এই বিভ্রান্তি দেখে আমার বেশ মজা লাগল। ওর চোখের অস্থির হতবুদ্ধিভাব আমাকে আকর্ষণ করল। আমি যে বেশ আবেগের সঙ্গে ছোট্ট করে ওকে সম্বোধন করলাম, সেটা ওর মাথায় ঢুকছে না। ওর কাছে কোনো বই-ই নেই, বইয়ের একটা পাতা পর্যন্ত নেই, তবু ও পকেট হাতড়াচ্ছে, বার বার নিজের হাত দুটো দেখছে, মাথা ঘুরিয়ে পেছনে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, ওর ছোট্ট সংবেদনশীল মস্তিষ্ক খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন্ বইয়ের কথা আমি বলছি। ওর মুখের রঙ পালটাচ্ছে, একেকবার একেকরকম মুখভাব, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, এমন কি ওর গাউনের বোতামগুলো পর্যন্ত মনে হচ্ছে আমার দিকে একসারি ভয়ার্ত চোখের মতো তাকিয়ে আছে।

ওর সঙ্গিনী ওর হাত ধরে বলল, 'ওই লোকটার কথা বাদ দে; দেখছিস না, ও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে?'

এই মুহূর্তে আমার নিজেকে কেমন অচেনা মনে হচ্ছে, আমার ভেতরের একটা অদ্ভুত অদৃশ্য সত্তার হাতের পুতুল হয়ে পড়েছি, অথচ চারপাশে যা কিছু ঘটছে, সবই কিন্তু আমার নজরে আসছে। একটা মস্তবড় বাদামি রঙের কুকুর এক লাফে রাস্তা পার হয়ে ওপারে ঝোপের দিকে দৌড়ে গেল, তারপরে নিচে টিভোলির দিকে চলে গেল; ওর গলায় একটা সরু জার্মান সিলভারের বেল্ট আঁটা রয়েছে। রাস্তায় ওপরের দিকে একটা বাড়ির তিন তলার জানালা খুলে গেল আর একটা কাজের মেয়ে, ওর হাতের আস্তিনটা গুটোনো, জানালা দিয়ে ঝুঁকে জানালার শার্শীর বাইরের দিকটা পরিষ্কার করতে লাগল। কিছুই আমার নজর এড়াচ্ছে না; আমার মাথা পরিষ্কার, বুদ্ধিও সজাগ। সব কিছুই একেবারে ঝকঝকে স্পষ্ট হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে, যেন হঠাৎ আমি তীব্র আলোর মধ্যে ডুবে গেছি। আমার সামনে দাঁড়ানো মহিলা দুজনের মাথার টুপিতে একটা করে নীলরঙের পাখির ডানা আটকানো আর দুজনেরই গলায় সিল্কের ফিতের মতো ওড়না। আমার মনে হল ওরা দুজনে দুই বোন।

ওরা ঘুরে গিয়ে সিস্‌লারের বাদ্যযন্ত্রের দোকানের সামনে দাঁড়াল আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। ওরা আবার ফিরে এল আর যে রাস্তা ধরে আসছিল, সেই দিকেই ফিরে চলল। আমাকে পার হয়ে গেল, তারপর ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের মোড় ঘুরে সেন্ট ওলাভ প্লেসের দিকে চলল। আমি সারাক্ষণ ওদের পায়ে পায়ে অনুসরণ করে চললাম। একবার ওরা ফিরে তাকাল, ওদের দৃষ্টিতে খানিকটা ভয় আর কিছুটা প্রশ্ন মিশে রয়েছে, কিন্তু কোনো অসন্তুষ্টি বা বিরাগের ভাব দেখতে পেলাম না।

এই যে আমি ওদের এত বিরক্ত করলাম, অথচ ওরা আমাকে ক্ষমার চোখে দেখছে, এতে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম, আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। আর আমি ওদের বিরক্ত করব না, কেবল কৃতজ্ঞতাবোধে ওদের শুধু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করব, যতক্ষণ না ওরা নিরাপদে কোনো জায়গায় পৌঁছে ভেতরে চলে যায়। দু'নম্বর বাড়িটা একটা মস্তবড় চারতলা বাড়ি। তার সামনে এসে ওরা আবার ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল। আমি রাস্তায় ফোয়ারার পাশে একটা ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ শুনবার অপেক্ষায় রইলাম। ওদের পায়ের শব্দ তিনতলায় উঠে মিলিয়ে গেল। আমি ল্যাম্পপোস্ট থেকে এগিয়ে এসে বাড়িটার ওপরের দিকে তাকালাম। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। তিনতলার একটা জানালার পর্দা দুলে উঠল, আর সেকেন্ড খানেক পরে জানালাটা খুলে গিয়ে একটা মাথা বাইরে বেরিয়ে এল আর দুটো অনন্য চোখ আমায় দেখতে লাগল। 'ইয়ালাজালি' আমি বিড়বিড় করে বলে উঠলাম আর বুঝতে পারলাম, আমার মুখ লাল হয়ে গেছে।

ও কেন কারও কাছে চেঁচিয়ে সাহায্য চাইছে না, বা ওপর থেকে আমার মাথার ওপর একটা ফুলের টব ফেলে দিচ্ছে না কিংবা আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কাউকে নিচে পাঠিয়ে দিচ্ছে না? চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, এক মিনিট ধরে। জানালা ও রাস্তার মাঝে ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারিত হচ্ছে না। ও ঘুরে দাঁড়াল। আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, ওর কাঁধটা ঘুরে যাচ্ছে, ওর পেছন দিকটা ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে দিয়ে একটা হাল্কা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন বয়ে গেল। ওর এই জানালা থেকে অনিচ্ছুকভাবে সরে যাওয়া, কাঁধের ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতপূর্ণ ঝোঁক দেওয়া যেন আমার প্রতি ওর ইশারা। ওর এই সূক্ষ্ম, ইঙ্গিতময় প্রীতি সম্ভাষণ আমি বুঝতে পারলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তারপর আমি উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম।

পেছন ফিরে তাকাতে ভরসা পাচ্ছি না, জানি না ও জানালায় ফিরে এসেছে কিনা। যতই একথা ভাবতে থাকি, ততই আরো নার্ভাস, অস্থির হয়ে পড়ি। হয়তো এই মুহূর্তে ও জানালায় দাঁড়িয়ে আমার হেঁটে চলা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। পেছন থেকে কেউ তোমাকে লক্ষ্য করছে, এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগে না। আমি নিজেকে স্থির করে

নিয়ে এগিয়ে চললাম, আমার দুই পায়ে ঝাঁকুনি হচ্ছে, আমার হাঁটা টলে টলে যাচ্ছে, কারণ আমি জোর করে নিজেকে সোজা রাখতে চাইছি। নিজেকে বেপরোয়া উদাসীন দেখানোর জন্য আমি দুদিকে হাত ছড়িয়ে থুতু ফেলে, মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে হেঁটে চললাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা– কারণ সারাক্ষণই আমার ঘাড়ের পেছনে দুটো চোখ বিঁধে আছে মনে হচ্ছে আর আমার পিঠ বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমি পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম আর সেখান থেকে পাইল স্ট্রিটে যাবার রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমার পেন্সিলটা আনতে।

পেন্সিলটা পেতে কোনো অসুবিধা হল না। লোকটা নিজেই আমার ওয়েস্টকোটটা নিয়ে এল আর আমাকে সব পকেটগুলো ভাল করে খুঁজতে বলল। পেন্সিলটা ছাড়াও আমি আরও দুটো বন্ধকী রসিদ খুঁজে পেলাম আর এই মানুষটিকে তার ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। লোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগতে লাগল এবং হঠাৎ-ই আমার মনে উদগ্র বাসনা জেগে উঠল যে, যেমন করে হোক, ও যাতে আমার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করে এ রকম কিছু করতে হবে।আমি দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফের ঘুরে কাউন্টারে চলে এলাম যেন আমি কিছু ভুলে ফেলে গেছি। আমার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা খোলসা করে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি গুনগুন করে গাইতে লাগলাম। তারপর পেন্সিলটা হাতে নিয়ে বলতে শুরু করলাম,–

'যে কোনো পেন্সিলের জন্য এতদূর আসার কথা আমার মাথায় আসত না, কিন্তু এই পেন্সিলের টুকরোটা একটা আলাদা ব্যাপার। এর পেছনে কারণ আছে, বিশেষ কারণ আছে। এই পেন্সিলের টুকরোটা দেখতে যতই তুচ্ছ মনে হোক, এটাই আমাকে পৃথিবীতে আমি আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি, সেটা করিয়েছে। অর্থাৎ আমাকে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।' আর কিছু বলতে হল না, লোকটা একেবারে কাউন্টার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে।

'সত্যি!' লোকটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'এটিই হচ্ছে সেই পেন্সিল,' আমি ঠাণ্ডা মাথায় বলে চললাম, 'যা দিয়ে আমি তিন অধ্যায়ে আমার 'দার্শনিক জ্ঞান' এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখেছি।' ও কি এটার কথা শোনেনি?

'হ্যাঁ, এই রকম একটা নাম যেন শুনেছে বলে মনে পড়ছে ওর।

হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন, ওটা আমারই লেখা।' অর্থাৎ ও এখন মোটেই অবাক হবে না যে কেন আমি এই ছোট্ট পেন্সিল-এর টুকরোটা ফেরত পাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এটা আমি হারাতে চাই না, এটার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি, প্রায় একটা ছোট মানব শিশুর মতো। যাই হোক, তার এই ভদ্রতাবোধের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আর এর জন্য ওকে আমার মনে থাকবে। হ্যাঁ, সত্যিই মনে থাকবে। প্রতিজ্ঞা হচ্ছে প্রতিজ্ঞাই আর আমিও হচ্ছি সেই জাতের মানুষ! তাছাড়া এটা তো ওর প্রাপ্য। 'বিদায়!' আমি এমনভাবে দরজার

দিকে হেঁটে গেলাম, যেন আমি এমন ক্ষমতাশালী যে, যে কোনো মানুষকে যে কোনো উচ্চ পদে বসিয়ে দিতে পারি, এমনকি দমকল অফিসেও। ওই সৎ বন্ধকী-দোকানদারটি দুবার মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে অভিবাদন করল। আমি দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার বিদায় সম্ভাষণ জানালাম।

সিঁড়িতে একটি মহিলাকে দেখলাম, হাতে একটা বেড়াতে যাবার ব্যাগ। আমাকে পাশ দেবার জন্য একদম দেয়াল ঘেঁষে অবিশ্বাসীভাবে দাঁড়িয়ে গেল আর আমার হাতটা আপনা থেকেই পকেটে ঢুকে গেল ওকে কিছু দেব বলে। কিন্তু পকেটে কিছুই না থাকায় আমি বোকা বনে গেলাম আর তাই মাথা নামিয়ে ওকে পার হয়ে গেলাম। মহিলা অফিস ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল, দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল, সব শুনতে পেলাম।

সূর্য এখন দক্ষিণ আকাশে, প্রায় বারোটা বাজে। সারা শহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, কারণ এই সময়টাই চলতি রীতি অনুযায়ী বেড়ানোর সময়। কার্ল জোহান স্ট্রিট ধরে হাস্যমুখর লোকেরা চলাফেরা করছে। আমি কনুই দুটো গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে শরীরটাকে সঙ্কুচিত করে কিছু পরিচিত লোকের পাশ দিয়ে, যাতে বুঝতে না পারে এমনভাবে চলে গেলাম। ওরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের দেখছিল। আমি কাস্‌ল স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চললাম আর কেমন যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

যাদের দেখলাম, এই লোকগুলোর জীবন কেমন আনন্দময়, ঝলমলে, ওরা জীবনের পথে যেন বলরুমের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ওদের কারো চোখে দুঃখের ছায়া নেই, কাঁধে কোনো বোঝা নেই, হয়তো এইসব সুখী আত্মার মধ্যে কোনো গ্লানির ছায়া, কোনো গোপন বেদনা পর্যন্ত নেই। আর এদের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি আমি, একটা অল্পবয়েসি তরুণ, যার সবে পালক গজিয়েছে, অথচ ইতিমধ্যেই সুখের চেহারাটা পর্যন্ত ভুলে গেছি। আমি এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলাম আর বুঝলাম যে আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার হয়েছে। কেন গত কমাস আমার এত কষ্টকর হল? আমার খুশির মেজাজটা কোথায় হারিয়ে গেল, চারিদিক থেকে কেবল অদ্ভুত বিরক্তি আমাকে ছেয়ে ফেলল। আমি কোনো বেঞ্চিতে নিশ্চিন্তে বসতে পারি না, কোথাও একটা পা-ও ফেলতে পারি না, ছোটখাটো কোনো দুর্ঘটনা ঘটবেই। এইসব দুঃখজনক ঘটনাগুলো আমার কল্পনার জগতে জোর করে ঢুকে পড়ে আর আমার সৃষ্টিমূলক চিন্তাধারাকে ছারখার করে দেয়। একটা কুকুর পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল, কিংবা একটা লোকের কোটের বোতামে একটা হলদে গোলাপফুল গোঁজা, এইসব আমার চিন্তায় কাঁপন ধরায় আর আমি অনেকক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

আমার অসুখটা কী? ঈশ্বরের হাত কি আমার বিরুদ্ধে? কিন্তু শুধু আমার বিরুদ্ধেই বা কেন? দক্ষিণ আমেরিকার একটা লোকের বিরুদ্ধেই বা নয় কেন? ব্যাপারটা নিয়ে যখন ভাবতে বসলাম, তখন এটা আরো বেশি করে অবোধ্য মনে হল যে, সমস্ত লোকের মধ্যে আমাকেই বা কেন সৃষ্টিকর্তার খেয়ালের গবেষণার জন্য

বাছা হবে। জগতের সমস্ত লোককে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়েই বা কেন এত টানাটানি? কেন বই-বিক্রেতা পাশকা বা স্টিম এজেন্ট হেন্নেকেনকে বাছা হবে না?

যেতে যেতে এই সমস্ত কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল, কিছুতেই এর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। অন্য সকলের পাপের মূল্য আমাকেই চোকাতে হবে, সৃষ্টিকর্তার এই একচোখামির বিরুদ্ধে বেশ ভারী যুক্তিজাল খাড়া করলাম। একটা বেঞ্চি পেয়ে বসে পড়লাম, কিন্তু এই চিন্তাগুলো আমার মনের ভেতর জেঁকে বসে রইল, আর অন্য কিছু চিন্তা করতেই দিল না। মে মাসে যেদিন থেকে আমার দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছিল, তখন থেকে আমার ক্রমবর্ধমান দৌর্বল্যর কথা স্পষ্ট মনে করতে পারি। আমি এমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছি যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, বা কী করব, কোথায় যাব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না। একঝাঁক ছোট ছোট জঘন্য পোকা আমার সত্তার ভেতরে ঢুকে পড়েছে আর আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফোঁপা করে দিয়েছে।

এমন যদি হয় যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে ধ্বংস করতে চান? আমি উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চটার সামনে পায়চারি করতে লাগলাম।

এই মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হচ্ছে। আমার দুই হাতে ব্যথা, হাত দুটো ঠিক মতো রাখতেও পারছি না। শেষ যে খাবারটা খেলাম, সেটাতেও দারুণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। বেশি খেয়ে ফেলেছি। তাই কোনোদিকে না তাকিয়ে ক্রমাগত সামনে পেছনে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। যে সব লোকেরা আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, মনে হল, তারা যেন মৃদু আলোর মতো আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুটো লোক এসে আমার বেঞ্চিটায় বসে পড়েছে, আর সিগার ধরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। আমার রাগ হয়ে গেল, ওদের কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলাম, তারপর পার্কের একেবারে অন্যপ্রান্তে গিয়ে একটা বেঞ্চি দেখে বসে পড়লাম।

ঈশ্বরের চিন্তাটা আমার মন জুড়ে রইল। মনে হল এই যে উনি আমার সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন, আমাকে জায়গা পেতে দিচ্ছেন না, সব কিছু বিগড়ে দিচ্ছেন, অথচ আমি তো আর কিছুই চাইছি না, কেবল দুবেলা দুমুঠো খেতে চাইছি, এতে ওনার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো যুক্তিই নেই।

আমি এত স্পষ্ট করে বলছি, কারণ যখনই আমি দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুধার্ত হয়ে থেকেছি, মনে হয়েছে আমার মাথার ভেতর থেকে ঘিলু বের হয়ে গেছে আর মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। মাথাটা হাল্কা হয়ে গেছে আর ঘাড়ের ওপর মাথার কোনো ওজনই টের পাচ্ছি না। আমি বুঝতে পারছি যে, যখনই কোনো কিছুর দিকে তাকাচ্ছি আমার চোখ দুটো যেন সম্পূর্ণ চওড়া হয়ে খুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকছে।

আমি বেঞ্চে বসে এই সমস্ত ভাবতে লাগলাম আর এই যে ঈশ্বর দীর্ঘদিন ধরে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমার তিক্ততা ক্রমাগত বাড়তে লাগল। এসবের মধ্যে দিয়ে যদি তিনি আমাকে কাছে টানতে চান আর

আমার পথে বাধার পর বাধা এনে আমাকে নিঃশেষ করতে চান এবং তার দ্বারা আমার ভালো করতে চান বলে মনে করেন, তাহলে তাঁকে আমি বলতে চাই যে, তিনি একটু ভুল করছেন। এইভাবে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আমি আকাশে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তাঁকে এইসব কথা মনে মনে শেষবারের মতো বলে ফেললাম।

আমার মনের মধ্যে ছেলেবেলার শিক্ষার টুকরোটাকরা ভেসে উঠল। বাইবেলের ভাষার ছন্দময় সুর আমার কানে গান হয়ে বেজে উঠল, আর আমি নিজের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগলাম, আমার মাথাটা অবজ্ঞার সঙ্গে একপাশে বেঁকিয়ে। আমি যা খাই, যা পান করি, তার জন্য আমি কেন দুঃখ করব অথবা পোকার জঘন্য খাদ্য আমার এই শরীরটা আমি কীভাবে সাজাব? স্বর্গের ঈশ্বর কি আমার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেননি, যেমন তিনি বাড়ির ছাদে বাসা-বাঁধা একটা চড়াই পাখির জন্যও করেন? তিনি কি তাঁর অশেষ করুণায় তাঁর এই দীনহীন পরিচারককে নির্দেশ করছেন না? ঈশ্বর আমার শরীরের স্নায়ুজালের মধ্যে আলতো করে আঙুল রেখেছেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই এলোমেলোভাবে, আর তাতেই আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলো বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। আর তারপরই ঈশ্বর তাঁর আঙুল তুলে নিলেন আর তাঁর আঙুলে আঁশ আর সরু সরু শিকড়ের মতো সুতাগুলো লেগে রইল, আর সেগুলো আমার স্নায়ুতন্ত্রীর সুতাগুলো। ঈশ্বরের আঙুল থেকে আমার মগজে সৃষ্টি হল একটা মস্তবড় গর্তের মতো ক্ষত। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আঙুল দিয়ে আমাকে ছোঁয়ার পর আমাকে একলা ছেড়ে দিলেন, আর স্পর্শ করলেন না, আর আমার কোনো অমঙ্গলও হতে দিলেন না। আমাকে শান্তিতেই যেতে দিলেন, কিন্তু মস্তিষ্কের ভেতর একটা হাঁ-করা গর্ত সমেত। এবং এই অনন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে আমার ওপর আর কোনো অমঙ্গল আসেনি।

স্টুডেন্টস অ্যালির দিক থেকে বাতাসে গানবাজনার শব্দ ভেসে এল। তার মানে দু'টো বেজে গেছে। কিছু লিখব বলে কাগজ পেন্সিল বার করলাম, আর অমনি পকেট থেকে আমার দাড়ি কামানোর টিকিটগুলো* পড়ে গেল। গুনে দেখলাম, ছটা আছে। 'ঈশ্বর মঙ্গলময়,' আমি অজানিতে বলে ফেললাম, 'এখনও সপ্তাহ দুয়েক দাড়ি কামিয়ে ভদ্রলোক থাকা যেতে পারে।' এই সামান্য সম্পত্তির মালিকানায় আমার মনটা সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেল। আমি টিকিটের পাতাগুলো মসৃণ করে টিকিটের বইটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম।

কিন্তু লিখতে মোটেই পারছি না। কয়েক লাইন লেখার পর মাথায় আর কিছু আসছে না। চিন্তা-ভাবনাগুলো অন্যদিকে দৌড়ে পালাচ্ছে, একান্ত মনোনিবেশ করে কাজ করার মতো অবস্থায় কিছুতেই নিজেকে আনতে পারছি না।

---

*নাপিতরা এইগুলো সস্তায় দেয়, কারণ নরওয়ে-তে খুব কম লোকই নিজের হাতে দাড়ি কামায়।

আশপাশের সব কিছুই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে, আমার মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। যা কিছু দেখছি, সবই যেন নতুন মনে হচ্ছে। মাছি, ছোটছোট মশা আমার লেখার কাগজের ওপর এসে বসছে আর ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আমি ওগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই, কিন্তু যত জোরেই ফুঁ দিই না কেন, ওই ছোট ছোট পোকাগুলো উল্টে যাচ্ছে, ওদের শরীরগুলো ভারী হয়ে যাচ্ছে,তারপর ওরা আমার ফুঁয়ের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে, যতক্ষণ না ওদের পাগুলো বেঁকে যায়। ওদের কাগজের ওপর থেকে কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না। ওরা কিছু না কিছু ওদের পা দিয়ে আঁকড়ে ধরছে, হয়তা লেখার একটা কমা বা কাগজের কোনো উঁচুনিচু অংশ আর একেবারে শক্ত অনড় হয়ে বসে আছে, যতক্ষণ না ওরা নিজেরাই উড়ে চলে যাচ্ছে।

এই পোকাগুলো আমাকে অনেকক্ষণ ব্যস্ত রাখল আর আমি পা দুটো আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে অলসভঙ্গীতে ওদের দেখতে থাকলাম। এই সময় হঠাৎ ব্যান্ডস্ট্যান্ড থেকে ক্লারিওনেটের দুটো উঁচু পর্দার সুর ভেসে এল আর আমার চিন্তাকে অন্যদিকে নিয়ে গেল।

লেখাটা শেষ করতে পারছি না দেখে হতাশ হয়ে কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম আর বেঞ্চিতে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। এই মুহূর্তে আমার মাথাটা এত পরিষ্কার যে, কোনোরকম ক্লান্তিবোধ না করেই আমি খুব সূক্ষ্ম চিন্তার স্রোতে ভেসে যেতে পারছিলাম। এইভাবে হেলান দিয়ে শুয়ে আমি আমার বুক ও পায়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিলাম। দেখলাম যে, আমার নাড়ির প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে আমার পা দুটোও ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ছে। আমি খানিকটা উঠে বসে পায়ের দিকে তাকালাম আর সেই মুহূর্তে আমার এমন একটা উদ্ভট অনন্য অনুভূতি হল, যা আগে কখনও হয়নি– একটা সূক্ষ্ম আশ্চর্য ঝাঁকুনি আমার স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল, যেন একটা ঠাণ্ডা আলোর ঝলক আমার স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে যাচ্ছে- যেন আমার জুতা দুটো দেখে মনে হল আমার এক পুরনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল, অথবা আমার সত্তার ছিন্ন হারিয়ে যাওয়া অংশটা ফিরে পেলাম। আমার চেতনায় একটা পরিচিতিবোধের উন্মেষ হল, আমার দু' চোখ জলে ভরে উঠল, আর মনে হল আমার জুতা দুটোর যেন মৃদু গুনগুন স্বর, আমার দিকে উঠে আসছে। 'দুর্বলতা,' আমি কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, তারপর দুহাত মুঠো করে আবার চিৎকার করলাম, 'দুর্বলতা!' এই হাস্যকর অনুভূতির জন্য আমি নিজেই হেসে উঠলাম, নিজেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলাম আর খুব সচেতনভাবেই নিজেকে ধমকালাম আর তারপর শক্ত করে দুচোখ বন্ধ করে রাখলাম, যাতে চোখ থেকে জল না পড়ে।

যেন আমি আগে কোনোদিন আমার জুতাজোড়া দেখিনি, এইভাবে আমি ওদের চেহারা, ওদের বৈশিষ্ট্যগুলো আর যখন আমি পা নাড়ছি তখন ওদের এবং ওপরের মোজার চেহারা কেমন পাল্টে যায়, তা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম। আমি আবিষ্কার করলাম যে, ওদের ভাঁজগুলো আর সাদা জোড়ের জায়গাগুলো ওদের

একটা চেহারা দিচ্ছে, একটা স্পষ্ট অবয়ব দিচ্ছে। আমার স্বভাবের কিছুটা যেন এই জুতাগুলোর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে, ওরা যেন আমার অন্য আমিটার ভূত, আমার নিজস্ব সত্তার একটা জীবন্ত অংশ।

দীর্ঘ সময় ধরে, প্রায় এক ঘণ্টা, আমি এই কল্পরাজ্যে মগ্ন রইলাম। একটা ছোটখাটো বুড়ো লোক এসে আমার বেঞ্চিটার অন্য প্রান্তে বসল আর হেঁটে আসার ধকলে হাঁফাতে হাঁফাতে বিড়বিড় করতে লাগল, 'আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, একদম সত্যি!'

ওর কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই মনে হল আমার মাথার মধ্যে দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল। জুতা থাক জুতার মতো, আমার মনে হল এতক্ষণ আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছিল, সেগুলো অনেক অতীতের কথা, হয়তো এক বছর দুবছর আগের ব্যাপার আর আমার স্মৃতি থেকে ওগুলো নীরবে মুছে যাচ্ছে। আমি বুড়ো লোকটাকে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম।

এই ছোটখাটো লোকটা কি কোনোভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্কিত? মোটেই না, একদমই না! কেবল ওর হাতে একটা খবরের কাগজ আছে, একটা পুরনো কাগজ (বিজ্ঞাপনের পাতাটা বাইরের দিকে রয়েছে) যার মধ্যে কিছু একটা গোটানো রয়েছে; আমার কৌতূহল জাগ্রত হল আর আমি ওই কাগজ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না। আমার মাথায় একটা পাগলের মতো চিন্তা ঢুকে গেল যে, এই কাগজটার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আমার কৌতূহল বাড়তেই থাকল আর আমি বেঞ্চিতে এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। হয়তো এর ভেতর কোনো দলিল আছে, কোনো মহাফেজখানা বা অন্যত্র থেকে চুরি করা বিপজ্জনক নথিপত্র আছে; কোনো গোপন চুক্তি, একটা ষড়যন্ত্র, এই সব আমার মাথায় ঘুরতে লাগল।

লোকটা কিন্তু চুপচাপ বসে আছে, নিজের চিন্তায় মগ্ন। অন্য সকলে যেমন ভাবে খবরের কাগজ নিয়ে ঘোরে, কাগজের নামটা বাইরের দিকে দেখা যায়, সে রকম ভাবে এই লোকটা কাগজটা ধরেনি কেন? এর ভেতরে কোন্ ধূর্ততা লুকিয়ে আছে? লোকটা কাগজের প্যাকেটটা হাত থেকে ছাড়তেই চাইছে না, পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েও না; বোধহয় ওটা নিজের পকেটে রাখতেও ভরসা পাচ্ছে না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এই প্যাকেটটার তলার দিকে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। এই রহস্যময় ব্যাপারটা কিছুতেই ধরতে পারছি না ভেবে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। আমি আমার পকেট হাতড়ালাম, কিছু একটা লোকটাকে দিয়ে আলাপ জমাব বলে, হাতে ঠেকল দাড়ি কামানোর টিকিটের বইটা, কিন্তু ওটা আর বার করলাম না। হঠাৎ আমার মাথায় খেয়াল চাপল, একটু দুঃসাহসী হওয়া যাক। আমি আমার শূন্য বুকপকেটটা চাপড়ে বলে উঠলাম,

'আপনাকে কি একটা সিগারেট দিতে পারি?'

'ধন্যবাদ!' লোকটা ধূমপান করে না, ওর চোখ বাঁচানোর জন্য ও ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে। ও প্রায় অন্ধ। যাই হোক, আবার ধন্যবাদ জানাল। ওর চোখ কি অনেকদিন খারাপ হয়েছে? সেক্ষেত্রে, ও কি মোটেই পড়তে পারে না, খবরের কাগজও নয়?

না, খবরের কাগজও না, দুঃখের বিষয়। লোকটা আমার দিকে চোখ তুলল, ওর দুর্বল চোখ দুটোর ওপর পাতলা পর্দার আস্তরণ, যেন কাচের চোখ। ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠল আর আমার মনে বিরক্তির উদ্রেক হল।

'আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন?' ও বলল।

'হ্যাঁ।' ও কি ওর হাতে ধরা কাগজটার নামও পড়তে পারে না?

'একটু একটু।' অথচ ও কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেল যে আমি একজন নবাগত। আমার উচ্চারণের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে ও বুঝতে পেরেছে। বেশি কিছুর দরকার হয়নি, ও খুব ভালই শুনতে পায়। রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, তখন ও পাশের ঘরের লোকদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও শুনতে পায়।

'আমি বলতে চাইছিলাম, আপনি কোথায় থাকেন?'

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় একটা মিথ্যা কথা খেলে গেল। কোনো কিছু না ভেবে, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে আমি অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বললাম,

'দু'নম্বর সেন্ট ওলাভ্স প্লেস।'

'সত্যিই?' ও নাকি সেন্ট ওলাভ্স প্লেসের প্রতিটি নুড়িপাথর চেনে। একটা ফোয়ারা আছে, কতগুলো ল্যাম্পপোস্ট আছে, কয়েকটা গাছ আছে, ওর সব মনে আছে। 'কত নম্বর বললেন?'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দেওয়ার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর ওই খবরের কাগজ সম্পর্কে আমার ধারণাটা আমাকে একেবারে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। যে মূল্যেই হোক না কেন ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

'আপনি যখন কাগজ পড়তেই পারেন না, তাহলে কেন–'

'মনে হচ্ছে, আপনি বললেন দু নম্বরে থাকেন,' লোকটা আমার উত্তেজনা লক্ষ্য না করেই বলে চলল, 'একটা সময় ছিল, যখন আমি দু নম্বরের সবাইকে জানতাম। আপনার বাড়িওয়ালার নাম কী?'

ওর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমি তাড়াতাড়ি মুহূর্তের মধ্যে একটা নাম তৈরি করে ফেললাম আর বলে উঠলাম, 'হ্যাপ্পোলাটি।'

'হ্যাপ্পোলাটি, অ!' লোকটা মাথা নাড়ল। এই অস্বাভাবিক নামটার কোনো শব্দাংশই ওর কান এড়াল না।

আমি ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। কেমন গম্ভীরভাবে বোদ্ধার মতো বসে আছে। যে বোকাবোকা নামটা আমার মাথায় হঠাৎ এসে গেল, সেটা উচ্চারণ করার আগেই বুড়োটা নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে আর আগেই ও নামটা শুনেছে, এমন ভান করেছে।

ইতিমধ্যে ও প্যাকেটটা বেঞ্চির ওপর রেখেছে আর আমার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠেছে। আমি লক্ষ্য করলাম, কাগজটার ওপর কয়েক জায়গায় তেলের দাগ রয়েছে।

ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাড়িওয়ালা তো সমুদ্র ভ্রমণ করেন, তাই না?' ওর কথায় কিন্তু কোনো বিদ্রূপের সুর ছিল না, 'আমার সেই রকমই মনে পড়ছে।'

'সমুদ্র ভ্রমণ করেন? মাপ করবেন, মনে হচ্ছে আপনি ওনার ভাই-এর কথা বলছেন। এই ভদ্রলোকের নাম জে এ হ্যাপ্পোলাটি, উনি একজন এজেন্ট।'

মনে হল, এবার ও চুপ করে যাবে, কিন্তু ও আমার সব কথাতেই সায় দিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি অন্য কোনো নাম, যেমন বারাব্বাস রোজবাড বলতাম, তাতেও বোধহয় ওর সন্দেহ হত না।

'আমি শুনেছি, তিনি একজন সমর্থ মানুষ,' ও কথা চালিয়ে যাচ্ছে।

'ওঃ, খুব সেয়ানা লোক,' আমি বললাম, 'খুব পাকা ব্যবসা বুদ্ধি। যত রকমের জিনিস হতে পারে, সব কিছুরই এজেন্ট। চিন থেকে ক্র্যানবেরি, রাশিয়া থেকে পালক, চামড়া, মণ্ড, লেখার কালি–'

বুড়োটা খুব উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'তিনিই, তিনিই, একটা শয়তান!'

ব্যাপারটা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। আমি মজা পেয়ে গেলাম, আর মাথায় একটার পর একটা মিথ্যা কথা ভিড় করতে লাগল। আমি আবার বসে পড়লাম, খবরের কাগজ আর সব অদ্ভুত নথিপত্রের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম আর বেশ উজ্জীবিত হয়ে লোকটাকে থামিয়ে দিলাম।

এই বেঁটে ভূতটার সন্দেহাতীত সারল্য আমাকে হঠকারী করে তুলল। ওকে বেপরোয়াভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা বলে যাব আর ওকে বিস্মিত করে তুলে ওর মুখ বন্ধ করে দেব, ওকে মাঠ থেকে হটিয়ে দেব।

হ্যাপ্পোলাটি যে বিদ্যুৎচালিত প্রার্থনা সঙ্গীতের বই আবিষ্কার করেছে, সে কথা কি ও শুনেছে?

'কী? বিদ্যুৎ– '

'বইয়ের অক্ষরগুলো অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো দেয়। একটা অত্যন্ত অসাধারণ আবিষ্কার। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা; কারখানায়, ছাপাখানায়, দিনরাত কাজ হচ্ছে, গাদা গাদা কারিগর রাখা হচ্ছে, শুনেছি তো প্রায় সাতশ কারিগর কাজ করছে।'

'এইতো, আমি এইমাত্র বললাম না?' লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল।

ও আর কিছু বলল না, আমার সব কথাই ও বিশ্বাস করেছে, অথচ অবাক হয়নি একটুও। আমি অবশ্য একটু হতাশ হলাম; ভেবেছিলাম আমার এই মিথ্যা ভাষণে ও একেবারে হতভম্ব হয়ে যাবে।

আমি মাথা খাটিয়ে আরও মিথ্যা কথা বলতে লাগলাম, হ্যাপ্পোলাটি যে পারস্য দেশে সাতবছর প্রতিমন্ত্রী ছিল, সে রকম ইঙ্গিতও দিলাম।

'আপনার বোধহয় কোনো ধারণাই নেই যে, পারস্যে প্রতিমন্ত্রী হওয়ার মানেটা কি?' আমি জিগগেস করলাম। আমাদের এখানে রাজা হওয়ার চাইতেও বেশি, প্রায় সুলতান হওয়ার সমকক্ষ, কিন্তু হ্যাপ্পোলাটি সমস্ত ব্যাপারটা এমনভাবে সামলেছে যেন ব্যাপারটা ওর কাছে জলভাত। তারপর আমি হ্যাপ্পোলাটির মেয়ে ইয়ালাজালির কথা বললাম। একটা পরীর মতো সুন্দরী, রাজকুমারী, যার তিনশ ক্রীতদাসী আছে আর যে কিনা হলদে গোলাপ ফুলে ঢাকা একটা আরাম চেয়ারে বসে থাকে। আমার দেখা মেয়েদের মধ্যে ও সবচাইতে সুন্দরী। আমার সারা জীবনে তো আমি এমন কোনো মেয়ে দেখলাম না, যে ওর সৌন্দর্যের ধারে কাছেও আসতে পারে!

'তাই নাকি? ও সত্যিই এত সুন্দরী?' বুড়ো মাটির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

'সুন্দরী? ও এত রূপসী, এত আকর্ষণীয় যে বর্ণনা করা যায় না। চোখ দুটো যেন সিল্কের মতো আর হাত দুটি স্ফটিকের। ওর একটি চাহনি যেন সম্মোহিনী চুম্বন! ও যখন আমাকে ডেকেছিল, ওর গলার স্বর যেন একটা মদিরা-রশ্মির মতো আমার আত্মার গভীরে ঢুকে গিয়েছিল। আর কেনই বা ও এত মোহিনী হবে না? বুড়ো কি ভাবছে যে মেয়েটা একটা বার্তাবাহক কিংবা দমকল বাহিনীতে কোনো কাজ করে? মেয়েটা একটা স্বর্গীয় বিস্ময়, একটা পরী-কাহিনী, একথা আমি নিশ্চয়ই বলব।'

'হ্যাঁ, ঠিক কথাই তো!' বুড়ো একটুও হতবুদ্ধি না হয়ে বলল। ওর এই শান্তভাব আমাকে বিরক্ত করল। আমার নিজের কণ্ঠস্বরেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম এবং খুব আন্তরিকভাবেই কথা বলছিলাম। মহাফেজখানা থেকে চুরি করা নথিপত্র, বিদেশি শক্তির সঙ্গে চুক্তির কাগজ ইত্যাদি সব কথাই ততক্ষণে ভুলে গেছি। ওই তুচ্ছ কাগজের প্যাকেটটা তখনও আমাদের দুজনের মাঝখানে বেঞ্চিতে পড়ে আছে আর ওর ভেতরে কী আছে তা জানবার আগ্রহ আমার আর নেই। আমার তৈরি করা মিথ্যেগুলো, যেগুলো আমার মনের চোখের সামনে দিয়ে অদ্ভুত অনন্য দৃশ্যের মতো ভেসে চলেছে, তাতেই আমি এখন মগ্ন হয়ে রয়েছি। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল, আর আমি জোরে জোরে হেসে উঠলাম।

ঠিক এই মুহূর্তেই বুড়োটা উঠে চলে যাবে বলে মনে হল। ও হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল আর তারপর যেন কোনো তাড়া নেই এমনভাবে বলল, 'এই হ্যাপ্পোলাটির তো প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাই না?'

আমি এত বুদ্ধি খাটিয়ে যে নামটা তৈরি করলাম, সেই অসাধারণ নামটা এই ঘোলাটে চোখো, বিরক্তিকর বুড়ো এমন অবহেলায় উচ্চারণ করল, যেন এটা অত্যন্ত সাধারণ নাম, শহরের প্রত্যেকটা গরিব ফেরিওয়ালার দোকানে এই নামটা লাগানো থাকে। নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে একটু হোঁচট পর্যন্ত খেল না। নামটা যেন ওর

মাথার ভেতর ঢুকে একেবারে শেকড় গেড়ে বসেছে। আমি ভীষণ বিরক্ত হলাম; এই তুচ্ছ প্রাণীটাকে কি কোনো কিছুই উত্তেজিত বা সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারে না? আমার ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ হল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, একদম কিছু জানি না! আপনাকে আমি শেষবারের মতো জানাচ্ছি যে, ওনার নাম জোহান অ্যারেন্ডট হ্যাপ্পোলাটি।'

'জোহান অ্যারেন্ডট হ্যাপ্পোলাটি।' লোকটা নামটা পুনরাবৃত্তি করল, আমার প্রচণ্ড রাগ দেখে ও অবাক হয়ে গেছে আর তারপরই চুপ করে গেল।

'আপনি ওর স্ত্রীকে দেখেছেন?' আমি আত্মহারা হয়ে বলে চললাম, 'একটা প্রচণ্ড মোটা... অ্যাঁ? কী? আপনি বিশ্বাস করেন না যে, মহিলা সত্যিই মোটা?'

বুড়ো অস্বীকার করার পথ খুঁজে পাচ্ছে না যে, ওই মানুষের একটা মোটাসোটা স্ত্রী থাকতে পারে। বুড়ো খুব বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রভাবে আমার প্রত্যেকটা বক্তব্যে সায় দিয়ে গেল আর আমি যাতে অসন্তুষ্ট না হই বা রেগে না যাই, সে জন্য সাবধানে কথা বলল।

'নরকের আগুনে পুড়বেন মশাই! আপনি কি ভাবছেন আমি এইখানে বসে বসে আপনাকে গুল ঝেড়ে যাচ্ছি?' আমি রাগে গর্জন করে উঠলাম, 'বোধহয় আপনি বিশ্বাসও করেন না যে, হ্যাপ্পোলাটি নামের কোনো লোক আছে! আপনার মতো গোঁয়ার কুচুটে বুড়ো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আপনার হয়েছেটা কি বলুন তো? বোধহয় আপনি এ-ও ভাবছেন যে, আমি একটা হতদরিদ্র মানুষ, আমার রোববারের সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে এখানে বসে আছি, অথচ পকেটে এক প্যাকেট সিগারেটও নেই। শুনুন মশাই, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনি আমার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করছেন, তাতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই এবং আমি আর সহ্যও করব না। আপনার কাছ থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে এই অসভ্যতা আমি বরদাস্ত করব না, বুঝলেন মশাই।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল, ওর মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না আমার তর্জনগর্জন শেষ হয়। তারপরই ও বেঞ্চি থেকে ওর প্যাকেটটা তুলে নিয়ে রাস্তা ধরে সটান দৌড় লাগালো, বুড়ো মানুষের টলমল ছোট ছোট পদক্ষেপে।

আমি বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে বুড়োর অপসৃয়মাণ শরীরটা দেখতে থাকলাম, প্রতি পদক্ষেপে ছোট হতে হতে বিলীন হয়ে গেল। কোথা থেকে এই ধারণাটা আমার মনে উদয় হল আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হল যেন জীবনে আমি এই লোকটার মতো ইতর লোক আর দেখিনি আর ওকে যে এই বকাবকি করলাম তার জন্যে আমার কোনো অনুতাপ হল না।

দিন ঢলে পড়েছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আশপাশের গাছগুলোর পাতায় হাল্কা সরসর শব্দ শুরু হয়েছে আর যে আয়ারা এতক্ষণ পার্কের প্যারালাল বারের কাছে গোল হয়ে

বসে গুলতানি করছিল, তারা পেরাম্বুলেটারগুলো ঠেলে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমার মনটা এখন শান্ত আর মেজাজটাও শরীফ। এতক্ষণ যে উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে ছিলাম, সেটা একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে আর আমিও কেমন যেন অবসন্ন, নিস্তেজ হয়ে পড়েছি আর একটু ঝিমুনিভাব এসেছে। যে একগাদা রুটি খেয়ে ফেলেছিলাম, সেটাতে অবশ্য এখন আর বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। বেঞ্চিতে ভাল করে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলাম, আর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঝিমুতে ঝিমুতে যখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়বার জোগাড়, ঠিক তখনই পার্কের পাহারাদার আমার কাঁধে হাত রেখে বলল,

'এখানে বসে ঘুমোবেন না।'

'ঘুমোবো না?' আমি বললাম আর স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলাম, আমার চোখের সামনে আমার অসহায় দুরবস্থার ছবি স্পষ্ট ভেসে উঠল। কিছু একটা করতে হবে, কোনোরকম ভাবে এই ঝঞ্ঝাট থেকে বেরোতে হবে। চাকরি-বাকরি খোঁজা আমার কম্মো নয়। যে সব সুপারিশ আমি বরাবর দেখিয়ে এসেছি, সেগুলো পুরনো হয়ে গেছে আর ওগুলোর বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এছাড়া এই পুরো গ্রীষ্মকালটা ধরে ক্রমাগত 'না' শুনতে শুনতে আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। ঘরের ভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকাটা জোগাড় করতেই হবে, বাকিটা পরে দেখা যাবে।

খানিকটা অনিচ্ছাকৃতভাবেই কাগজ আর পেন্সিল হাতে তুলে নিলাম আর যান্ত্রিকভাবে কাগজের দুই কোনায় ১৮৪৮ সালের তারিখটা লিখে ফেললাম। ইস, এখন যদি যে কোনো একটা বিষয় আমার মাথার মধ্যে বুজবুজ করে ওঠে আর আমার মুখে কথা জুগিয়ে দেয়। আরে এক একবার তো আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখে গেছি, প্রায় বিনা প্রচেষ্টায় আর তার জন্য কিছু রোজগারও হয়েছে।

বেঞ্চিতে বসে আছি আর প্রায় বার বিশেক, ১৮৪৮ সাল কথাটা লিখেই যাচ্ছি। তারিখটা লিখছি আড়াআড়ি, লম্বালম্বি, নানারকম কায়দায় আর অপেক্ষা করছি কতক্ষণে আমার মাথায় একটা কাজ করার মতো ভাবের উদয় হয়। এক ঝাঁক আলগা চিন্তা মাথার মধ্যে নড়াচড়া করে। দিনটা শেষ হয়ে আসছে, এই চিন্তাটা আমাকে হতোদ্যম, ভাবপ্রবণ করে তোলে। শরৎ এসে গেছে, সবকিছুকে নিদ্রা ও অসাড়তায় আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। মাছি ও কীটপতঙ্গরা তাদের প্রথম সতর্কবার্তা পেয়ে গেছে।

গাছের ওপর থেকে নিচে মাঠে, সর্বত্র অস্পষ্ট মর্মরে, গুঞ্জনে, অবিশ্রাম ফিসফিসানির মধ্যে বাঁচার লড়াইয়ের প্রাণস্পন্দন শোনা যায়। সমগ্র পতঙ্গ জগতের অস্তিত্ব কিছুক্ষণের জন্য নড়ে চড়ে ওঠে। ওরা ঘাসের মধ্যে থেকে ওদের হলদে মাথাগুলো বার করে পা তুলে, লম্বা শুঁড়গুলো বাড়িয়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করে, তারপর হঠাৎ পড়ে যায়, উল্টে যায়, আর আকাশের দিকে পেট উঁচু করে পড়ে থাকে।

প্রতিটি ক্রমবর্ধমান বস্তু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছে; প্রথম ঠাণ্ডার মৃদু বাতাসের শিরশিরানি, মাঠের ঘাসের গোড়াগুলো নিস্তেজভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে যেন পথভ্রষ্ট, গাছের পাতা মর্মর শব্দ তুলে মাটিতে ঝরে পড়ছে, যেন রেশম গুটিপোকার চলার শব্দ।

এখন শরৎ ঋতুর রাজত্ব, মরণোৎসবের চরম ক্ষণ। গোলাপ ফুলের লালে যেন লালিমার আতিশয্য, একটা ভুতুড়ে, রোগাক্রান্ত লাল রঙ যেন ওদের নরম দামাস্কাস লালিমাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

নিজেকে মনে হচ্ছে যেন একটা বুকে-হাঁটা সরীসৃপ, এক্ষুনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব, একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন জগতের ধ্বংসস্তূপে আটকে আছি। এই ভুতুড়ে আতঙ্ক আমাকে ভয় দেখাচ্ছে,আমি জোর করে উঠে দাঁড়ালাম আর রাস্তাটা ধরে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলাম। 'না!' আমি দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এর শেষ দেখতেই হবে,' আর তারপরই আমি আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লাম, পেন্সিলটা হাতে ধরে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হলাম।

হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অবকাশ নেই, না-দেওয়া বাড়ি ভাড়াটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে আমার ভাবনাকে সংহত করলাম। আমি ভাবনাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করলাম আর শান্তভাবে সুন্দর লিখে চললাম। ভূমিকা হিসেবে দু পাতা লিখে ফেললাম। এটা অবশ্য যে কোনো লেখায় মুখবন্ধ হিসেবে চলতে পারে। একটা ভ্রমণ বর্ণনা, একজন রাজনীতিবিদ নেতা, যা ভালো মনে হবে, তাই। বস্তুত এটা যে কোনো বিষয়ের ওপর লেখার একটা সুন্দর শুরু হতে পারে। আর তাই আমি এবার কোনো একটা বিষয় মনে মনে খুঁজতে শুরু করলাম, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নিয়ে, যেটা আমি সঠিকভাবে কব্জা করতে পারব, কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলাম না। এই নিষ্ফলা পরিশ্রমের সাথে সাথে একটা বিভ্রান্তি আমার ভাবনা চিন্তায় ঢুকে গেল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমার মগজে কিছু একটা ভেঙে গেল আর আমার মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল আর শেষকালে আমার ঘাড়ের ওপর একটা হাল্কা, ভাসমান শূন্যতা জেগে রইল। আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা দিয়ে আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে, আমার করোটির ভেতরটা একদম খালি। মনে হচ্ছিল, যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার সমস্ত শরীরটাই ফাঁপা।

যন্ত্রণায় আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হে ঈশ্বর, প্রভু, আমার পিতা!' আর ক্রমাগত এই একই বেদনার্ত চিৎকার করে চললাম। এর বেশি আর একটাও শব্দ আমার মুখ থেকে বেরোলো না।

গাছের পাতায় শিরশিরানি আওয়াজ তুলে বাতাস বয়ে চলেছে, মনে হয় ঝড় উঠতে পারে। আমি আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম, ভাবনায় ডুবে গিয়ে হাতে ধরা

কাগজটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, তারপর ওটা ভাঁজ করে ধীরে ধীরে পকেটে ভরলাম। কনকনে শীত পড়েছে আর আমার এখন ওয়েস্ট কোটটাও নেই। আমি আমার কোটের বোতাম গলা পর্যন্ত এঁটে দিলাম আর দুই হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।

ইস! অন্তত এই একবারও যদি আমি লেখাটা লিখে ফেলতে পারতাম। আমার বাড়িওয়ালি দুবার আমাকে চোখের ইশারায় বাড়ি ভাড়া দিতে বলেছে, আর আমি মাথা নিচু করে লজ্জায় ওর পাশ দিয়ে পালিয়ে গেছি। এ কাজ আমার দ্বারা আর হবে না; এর পরের বার বাড়িওয়ালির চোখে চোখ পড়লে আমাকে সততার সঙ্গে জবাব দিতেই হবে। এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে না।

পার্ক থেকে বেরোনোর গেটে এসে ওই বুড়োটাকে দেখলাম, যাকে আমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। ও একটা বেঞ্চে বসে আছে, ওর পাশে সেই রহস্যময় খবরের কাগজের প্যাকেটটা খোলা ছড়ানো পড়ে আছে, আর ওই কাগজের ওপর বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার রয়েছে যেগুলো ওই বুড়ো বসে বসে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, ওর কাছে গিয়ে আমার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আসি। কিন্তু ওর ওই খাবারগুলোর চেহারা দেখে আমার দারুণ বিতৃষ্ণা হল। ওর ওই জরাজীর্ণ আঙুলগুলো যেন দশটা নখরের মতো এই চর্বিওলা রুটি মাখনের টুকরোগুলো বিশ্রিভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। আমার বমি বমি পাচ্ছিল, ওকে কিছু না বলেই ওর পাশ দিয়ে চলে এলাম, ও আমাকে চিনতেই পারল না, অথচ ওর দুটো চোখ শুকনো হুলের মতো আমার দিকে চেয়ে রয়েছে আর মুখের একটা মাংসপেশিও নড়ছে না।

আমি নিজের রাস্তায় চলে গেলাম। অভ্যাসবশে, প্রতিটি টাঙানো খবরের কাগজ দেখতে থাকলাম, যেগুলোতে কর্মখালির বিজ্ঞাপন থাকে, আর কপাল জোরে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, যেটার জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

গ্রোয়েনল্যান্ডস্লেরেটে একজন মুদি দোকানদারের সপ্তাহে প্রতিদিন দুঘণ্টা খাতা লেখার কাজের জন্য লোক চাই, মাইনে চুক্তি অনুযায়ী হবে। আমি লোকটার ঠিকানাটা টুকে নিলাম আর নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, যাতে কাজটা পাই। আমি অন্যদের চেয়ে কম পয়সায় কাজটা করতে রাজি, ছ পেনি যথেষ্ট, অথবা পাঁচ পেনি হলেও চলবে। ওতে কিছু যায় আসে না।

ঘরে এসে দেখি টেবিলের ওপর বাড়িওয়ালির লেখা এক টুকরো চিঠি পড়ে আছে, যাতে আমাকে বাড়ি ভাড়াটা আগাম দিতে বলা হয়েছে, না হলে যত শিগগির সম্ভব বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আমি যেন কিছু মনে না করি, কারণ এটা ওর নিতান্তই প্রয়োজন। বন্ধুপ্রীতি জানিয়েছেন, মিসেস গুন্ডারসেন।

আমি ক্রিস্টি নামের ওই মুদি দোকানদারকে ১৩ নম্বর গ্রোয়েনল্যান্ডস্লেরেট, এই ঠিকানায় একটা দরখাস্ত লিখে খামে ভরে রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলে এলাম। ঘরে ঢুকে দোলনা চেয়ারটায় বসে ভাবতে লাগলাম। অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে, বেশি রাত করে বসে থাকাটা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলেছি, তখনও বেশ অন্ধকার আর অনেকক্ষণ পরে নিচে ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আবার ঘুমোবো বলে পাশ ফিরে শুলাম। কিন্তু ঘুম উড়ে পালিয়েছে। আমি জেগে জেগে হাজারো চিন্তা করতে লাগলাম।

হঠাৎ কতগুলো ভালো ভালো বাক্যবিন্যাস মনের মধ্যে এসে গেল, যেগুলো একটা রম্য রচনা বা ছোটগল্পের একদম উপযোগী, এমন কতগুলো সূক্ষ্ম ভাষার অলঙ্কার, যা আগে কখনো আমি দেখিনি। আমি শুয়ে শুয়ে ওই শব্দ বিন্যাসগুলো বার বার আবৃত্তি করতে লাগলাম আর বুঝতে পারলাম, এগুলো একেবারে অসাধারণ। আস্তে আস্তে আরো লাইনের পর লাইন আসতে লাগল আর আগের বাক্যগুলির সঙ্গে জুড়ে যেতে লাগল। আমি তখন পূর্ণ জাগ্রত। তাড়াতাড়ি উঠে বিছানার পেছন দিকে টেবিল থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেলাম। যেন আমার শরীরের একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে আর সমানে রক্ত বেরিয়ে আসছে এমনি ভাবে শব্দের পর শব্দ একে একে আসতেই থাকল আর আগের বাক্যগুলোর সাথে জুড়ে গিয়ে অসাধারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে লাগল। দৃশ্যের পর দৃশ্য আসছে। মাথার মধ্যে পাত্র-পাত্রীদের নড়াচড়া, কথা বলা, বুদ্বুদের মতো ফেনিয়ে উঠছে, আর একটা অপূর্ব সৃষ্টির উন্মাদনা আমাকে গ্রাস করেছে। আমার ওপর যেন ভূতে ভর করেছে, এইভাবে আমি বিন্দুমাত্র না থেমে পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগলাম।

ভাবনাগুলো এত তাড়াতাড়ি আমার মধ্যে আসতে লাগল আর মাথার মধ্যে দিয়ে ভেসে যেতে থাকল যে, আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কিছু ধরতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে পারলাম না। ওরা আমাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগল, বিষয়বস্তু আমার সম্পূর্ণ দখলে আর প্রতিটা কথা লিখে চলেছি যেন কোনো অনুপ্রেরণায়।

এই আশ্চর্য অবস্থাটা একটা আশীর্বাদের মতো বহুক্ষণ ধরে চলল। আমার সামনে হাঁটুর ওপর পনেরো কুড়ি পাতা লেখা হয়ে পড়ে রয়েছে, এই সময় আমার লেখা বন্ধ হল আর পেন্সিলটা এক পাশে সরিয়ে রাখলাম। এই পাতাগুলোর মূল্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত, আমি যে বেঁচে গেলাম, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, পোশাক পরে নিলাম। দিনের আলো বাড়ছে। দরজার কাছে দেওয়ালে বাতিঘরের ডাইরেক্টরের ঘোষণাটা অল্প-অল্প পড়া যাচ্ছে আর জানালার কাছে এখন আলো এত পরিষ্কার যে, দরকার হলে আমি এখনই লেখা শুরু করতে পারি। এ পর্যন্ত যা লিখে ফেলেছি, সেটার পরিষ্কার কপি করার জন্য আমি কাজে লেগে পড়লাম।

আমার এইসব উদ্ভট কল্পনাগুলোর থেকে একটা তীব্র, অদ্ভুত আলো আর রঙের ছটা বের হয়। আমার লেখার মধ্যে একটার পর একটা ভালো ভালো জিনিস দেখি আর অবাক হয়ে যাই; নিজেকে বলি যে, আমি এ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছি, তার মধ্যে

এটাই সবচেয়ে ভাল। আমার মাথা আত্মতুষ্টির স্রোতে সাঁতার কাটতে থাকে, আনন্দ আমাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে, আমি একেবারে আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে যাই।

আমি আমার লেখাটা হাতে নিয়ে ওজন করি, দাম করি, আর মোটামুটি আন্দাজ করি যে, এটার জন্য হাতে হাতে পাঁচ শিলিং পাওয়া যাবে।

পাঁচ শিলিং নিয়ে দর কষাকষি করার কথা নিশ্চয়ই কারো মাথায় খেলবে না। আবার উল্টোদিক থেকে দেখলে, এই লেখাটার গুণগত উৎকর্ষ বিচার করলে, আধা গিনিতে এটা পাওয়া মানে, একেবারে জলের দামে পাওয়া ভাবা যেতে পারে।

এই রকম একটা অসাধারণ লেখা বিনা পয়সায় দেওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। আমার যতদূর ধারণা, এই ধরনের গল্প রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় না, আর তাই আমি এটার দাম ধার্য করলাম আধা গিনি।

ঘরটা আরো আলোকিত হচ্ছে। আমি দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিশেষ কষ্ট না করেই, ডান পাশে মিস অ্যান্ডারসেনের শবাচ্ছাদনের বস্ত্রের বিজ্ঞাপনের কঙ্কালের হাতের মতো অক্ষরগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘড়িতে সাতটা বাজার পরও অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

আমি উঠলাম এবং ঘরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। সব দিক ভেবে দেখলে, মিসেস গুন্ডারসেনের সতর্কীকরণ উপযুক্ত সময়েই এসেছে। এই ঘরটা ঠিকভাবে বলতে গেলে, মোটেই আমার উপযুক্ত নয়। জানালাগুলোয় অতি সাধারণ সবুজ পর্দা লাগানো আর ঘরের দেওয়ালে গোঁজটোজও বেশি নেই। কোনায় যে ছোট্ট অতি সাধারণ দোলনা চেয়ারটা রয়েছে, ওটা আসলে একটা দোলনা-চেয়ারের অনুকরণ মাত্র। সামান্য রসবোধসম্পন্ন মানুষও ওটা দেখলে হাসতে হাসতে মরে যাবে। একটা বয়স্ক লোকের পক্ষে এটা অত্যন্ত নিচু, তাছাড়া একবার বসে পড়লে উঠতে গেলে সেই জুতা খোলার জ্যাক দরকার হয়। সোজা কথায়, এই ঘরটা বুদ্ধিজীবীদের কাজ করার মোটেই উপযোগী নয় আর আমি এটা বেশিদিন রাখতেও চাই না। রাখবোই না। এই রকম একটা গর্তে আমি ঠাণ্ডা মাথায় অনেক সহ্য করে অনেক দিন কাটিয়েছি।

মনটা আশা ও খুশিতে ভরপুর, পকেট থেকে আমার অসাধারণ লেখাটা ঘন ঘন বের করে পড়ছি, ঠিক করে ফেললাম, বাসাটা বদলাতেই হবে। আমার জামাকাপড়ের বান্ডিলটা, একটা লাল রুমাল, যেটাতে কয়েকটা পরিষ্কার জামার কলার রয়েছে, আর কয়েকটা কোঁচকানো খবরের কাগজ, যাতে করে মাঝে মাঝে ঘরে রুটি-টুটি কিনে নিয়ে আসতাম, এগুলো বের করলাম। কম্বলটা গুটিয়ে নিলাম আর বাদবাকি সাদা পরিষ্কার লেখার কাগজগুলো পকেটে ভরলাম। তারপর সারা ঘর ভাল করে খুঁজে দেখলাম আর কিছু ফেলে যাচ্ছি কিনা। তারপর জানালায় গিয়ে বাইরে তাকালাম।

সকালটা কেমন যেন বিষণ্ন ভিজে ভিজে। পুড়ে-যাওয়া কামারশালাটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না আর নিচে উঠোনে দেওয়াল থেকে দেওয়ালে কাপড় টাঙানোর টান

'কাঁচি' বলল, 'ঠিক আছে, আসুন।' তারপর ও আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মনে হল, ও যেন ব্যাপারটা বিশেষ আমল দিল না। কিন্তু আমি কিছুই না বলে ওর দিকে একটু মাথা হেলিয়ে চলে এলাম।

এখন হাতে প্রচুর সময় আছে। আকাশটা যদি একটু পরিষ্কার হত! একদম হতচ্ছাড়া আবহাওয়া, একটুও বাতাস নেই, একটুও তাজা ভাব নেই। মেয়েরা সব সাবধান হয়ে হাতে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে, পুরুষদের মাথার পশমের টুপিগুলো দেখাচ্ছে যেন ন্যাতানো, বিষণ্ন।

আমি আবার একপাক ঘুরে বাজারের দিকে এলাম আর সবজি, গোলাপ ফুল, এগুলো দেখতে লাগলাম। কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল। আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি, 'মিসি' আমাকে সুপ্রভাত জানাচ্ছে। জবাবে আমিও সুপ্রভাত জানালাম, যদিও 'মিসি'কে আমার খুব একটা পছন্দ নয়।

ও আমার বগলের তলায় মস্তবড় নতুনের মতো বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটাতে কী আছে?'

'ওঃ, আমি সেম্ব-এর দোকানে গিয়েছিলাম, আর একটা স্যুট বানানোর জন্যে কাপড় নিলাম,' তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলাম। 'পুরনোটা আর পরা যাচ্ছে না, লোকে বলবে কী?'

ও অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল,

'আচ্ছা, আচ্ছা, তা কেমন চলছে?' 'আরে, আশাতিরিক্ত ভালো!'

'তাহলে এখন কিছু করছ?'

'কিছু মানে?' আমি অবাক হবার ভান করে জবাব দিলাম, 'শোনো, এখন আমি পাইকারী ব্যবসায়ী ক্রিশ্চেনসেন-এর ওখানে হিসাবরক্ষক।'

'তাই নাকি?' ও একটু যেন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে ভাই, ঈশ্বর জানেন, তোমার এই ভাল খবরে আমি খুব খুশি হয়েছি। তবে তোমার রোজগারের টাকা থেকে অন্য লোককে টাকা চাইতে দিও না। বিদায়!'

এক মুহূর্ত পরেই ও ফিরে এসে আমার বাণ্ডিলটার দিকে ওর বেতের লাঠিঠা নির্দেশ করে বলল, 'তোমার ওই স্যুট বানানোর জন্য আমার দরজির কাছে যেতে পার, ইসাকসেনের চাইতে ভাল দরজি তুমি পাবে না, ওকে খালি বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

ব্যাপারটা আমার কাছে বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার ব্যাপারে ওর নাক গলাবার দরকারটা কী? আমি কোন দরজিকে দিয়ে কাজ করাবো না করাবো, তাতে ওর কী? এই মাথা মোটা ফুলবাবুটিকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি নির্দয়ভাবে ওকে মনে করিয়ে দিলাম যে, ও আমার কাছ থেকে দশ শিলিং ধার নিয়েছিল। কিন্তু ও জবাব দেবার আগেই আমার এ কথাটা বলার জন্য অনুশোচনা হল আর তাই আমি লজ্জায় ওর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারলাম না এবং ঠিক তখনই একজন মহিলা

আমাদের কাছাকাছি এসে পড়াতে আমি তাড়াতাড়ি তাকে জায়গা দেবার জন্য পাশে সরে গেলাম আর এই সুযোগে ওখান থেকে চটপট কেটে পড়লাম।

এখন ভাবনা হল, এই যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, এই সময়টা কী করা যায়? পকেট ফাঁকা, কাজেই কোনো কাফেতে যাওয়া যাবে না, আর এমন কোনো পরিচিত লোকও নেই, যার কাছে এই সময় যাওয়া যায়। আমি শহরের পথে পথে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, বাজার আর গ্র্যান্ডসেন-এর দোকানে অনেকটা সময় কাটালাম, 'আফটেন পোস্টেন' কাগজটা ওদের অফিসের বাইরে বোর্ডে লাগিয়েছিল, সেটা পড়লাম, কার্ল যোহান রাস্তায় মোড় নিয়ে আবার ঘুরে সোজা আওয়ার সেভিয়ার সমাধিস্থলে চলে গেলাম আর সেখানে মরচুয়ারি চ্যাপেলের কাছে ঢালু জমিতে একটা নির্জন জায়গায় বসে পড়লাম। ওখানে ওই সম্পূর্ণ নির্জনতায়, ভিজে ভিজে বাতাসে বসে বসে ঢুলতে লাগলাম, কখনও চিন্তায় ডুবে গিয়ে, কখনও বা আধো ঘুমে, ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম।

সময় কেটে চলেছে। এখন আবার অন্য চিন্তা শুরু হল। গল্পটা কি সত্যিই একটা অনুপ্রাণিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম? ঈশ্বর জানেন, ওটায় এখানে ওখানে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে। সব দিক বিচার করে দেখলে, ওটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে; না, মনে হচ্ছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ওটা বোধহয় একটা মাঝারি মানের কাজ, হয়তো সম্পূর্ণ বাজে, মূল্যহীন। ওটা যে এই মুহূর্তে বাজে কাগজের ঝুড়িতে পড়ে নেই, তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? আমার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে গেল। আমি লাফিয়ে উঠে, কবরখানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

অ্যাকার্সগ্যাডেনে এসে একটা দোকানের জানালায় উঁকি মেরে দোকানের ঘড়িতে দেখলাম, সবে বারোটা বেজেছে। বিকেল চারটের আগে সম্পাদক মশাই-এর খোঁজ করে লাভ নেই। আমার গল্পটির ভাগ্যে কী আছে, সেটা ভেবে আমার আশঙ্কা হতে লাগল। আমি যত গল্পটি সম্বন্ধে ভাবতে লাগলাম, ততই আমার ব্যাপারটা খুব আজগুবি মনে হতে লাগল, যে আমি কেমন করে এত তাড়াতাড়ি, আধা ঘুমন্ত অবস্থায়, মাথায় জ্বর আর উদ্ভট স্বপ্ন নিয়ে এই রকম একটা লেখা লিখে ফেললাম। আমি বোধহয় নিজেকেই ঠকিয়েছি, সারা সকাল বিনা কারণেই খোশ মেজাজে রয়েছি। নিশ্চয়ই তাই। আমি দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলাম, উল্লাভোল্ডসডেইন, সেখান থেকে সেন্ট হ্যানস টিলা ছাড়িয়ে একেবারে খোলা মাঠে এসে পড়লাম, তারপর সাগেনের সংকীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে, কিছু কিছু অনাবাদী জমি আর কিছু চাষ করা জমির পাশ দিয়ে এসে পৌঁছলাম একটা গ্রাম্য পথে, যার শেষ দেখা যাচ্ছে না।

এইখানে এসে আমি থেমে গেলাম আর ভাবলাম, এবার ফিরে যাই।

হেঁটে হেঁটে গা গরম হয়ে গেছে, আমি খুব বিমর্ষ চিত্তে ধীরে ধীরে ফিরে চললাম। দুটো খড়ের গাড়ির দেখা পেলাম, গাড়োয়ান দুটো খড়ের গাদার ওপর শুয়ে গান গাইছে। দুজনেরই মাথায় টুপি নেই আর দুজনেরই গোলগাল বেপরোয়া

মুখের ভাব। ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম, ওরা নিশ্চয়ই আমার পেছনে লাগবে, কিছু ঠাট্টা তামাশা করবে বা কোনো ইয়ারকি করবে। কাছাকাছি আসতে, ওদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল আমার বগলের তলায় ওটা কী?

'একটা কম্বল।'

'এখন কটা বাজে?' ও জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক জানি না, মনে হয় তিনটে-টিনটে হবে।'

ওরা একথায় হেসে উঠল আর এগিয়ে চলল। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওদের একটা চাবুক আমার একটা কানে আঘাত করে জড়িয়ে গেল আর আমার মাথার টুপিটা ছিটকে পড়ে গেল। কোনো বদমায়েশি না করে ওরা আমায় যেতে দেবে না। আমি হতবুদ্ধির মতো হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে রাস্তার পাশের খানা থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সেন্ট হ্যানস হিল-এর কাছে একটা লোকের দেখা পেলাম, ও বলল যে এখন চারটে বেজে গেছে। চারটে বেজে গেছে! আমি দ্রুত পা চালালাম, প্রায় দৌড়ে শহরে ঢুকে খবরের কাগজের অফিসের দিকে ছুটে চললাম। সম্পাদক মশাই হয়তো কয়েক ঘণ্টা আগেই অফিসে এসেছিলেন। এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছেন। আমি দৌড়চ্ছি, রাস্তায় লোকজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, হোঁচট খাচ্ছি, গাড়ির সঙ্গে টক্কর, সক্কলকে পেছনে ফেলে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে দৌড়বাজি করে পাগলের মতো ছুটছি, যাতে সময়মতো অফিসে পৌঁছতে পারি। আমি এক হ্যাঁচকায় দরজা খুলে, চার লাফে সিঁড়ি টপকে অফিস ঘরের দরজায় আওয়াজ করলাম।

কোনো উত্তর নেই।

'চলে গেছেন, চলে গেছেন!' আমি ভাবলাম। আমি দরজায় আরেকবার টোকা দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম, দরজা খোলাই ছিল। সম্পাদক মশাই টেবিলে বসে আছেন, জানালার দিকে মুখ, হাতে কলম, কিছু লিখতে যাচ্ছেন। আমার হাঁপাতে হাঁপাতে বলা অভিবাদন শুনে উনি চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লেন, বললেন :

'ওঃ, আপনার লেখাটা এখনও পড়ে উঠতে পারিনি।'

তার মানে আমার লেখাটা অন্তত বাতিল হয়নি। আমার এত আনন্দ হল যে আমি বললাম :

'ঠিক আছে স্যার, বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। কোনো তাড়া নেই, দু'এক দিন পরে হয়তো...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখব নিশ্চয়ই। তাছাড়া আপনার ঠিকানা তো আমার কাছে আছে।'

আমি বলতে ভুলেই গেলাম যে, এখন আর আমার কোনো ঠিকানা নেই। আমি নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। মনের ভেতর আশার সঞ্চার হয়েছে, কিছুই হারায়নি, বরং জিততে চলেছি। আমার মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের দেবতাদের সভায় এই মাত্র সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আমার জিত হবে এবং আমাকে একটা গল্পের জন্য দশ শিলিং পাইয়ে দেওয়া হবে।

যদি রাত কাটানোর মতো কোনো একটা জায়গা পেতাম! ভাবতে লাগলাম, রাতের আস্তানা কোথায় গাড়া যায়। আমি এই ভাবনায় এতই মগ্ন যে, রাস্তার একেবারে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভুলেই গেছি, কোথায় আছি; মাঝ-সমুদ্রে একটা পাহাড়ের ওপর আলোক স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছি, চারপাশে ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

একটা খবরের কাগজের ছোকরা আমার দিকে দি ভাইকিং কাগজটা বাড়িয়ে দিল। 'ভাল কাগজ স্যার, পয়সা উশুল।'

আমি চমকে তাকিয়ে দেখি সেম্ব-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি বান্ডিলটা সামনের দিকে বাড়িয়ে লুকিয়ে নিয়ে ডানদিকে ঘুরে পালাতে থাকি, লজ্জা ও ভয় আমাকে ঘিরে ধরেছে, জানালা দিয়ে কেউ দেখে ফেলেনি তো। থিয়েটার হল-এর পাশ দিয়ে বক্স অফিস ঘুরে সমুদ্রের দিকে দুর্গটার কাছাকাছি এগিয়ে যাই, তারপর একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে ভাবতে শুরু করি।

রাতের জন্য কোথায় একটা আস্তানা জোগাড় করা যায়? একটা গর্ত টর্ত পাওয়া যাবে কি, যার ভেতর ঢুকে সকাল পর্যন্ত লুকিয়ে থাকা যায়? আমার অহংকার আমাকে পুরনো আস্তানায় ফিরে যেতে মানা করছে, তাছাড়া আমার কথার খেলাপ করার কথা ভাবতেও পারি না। ঘৃণাভরে এই চিন্তাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, আর সেই তুচ্ছ লাল দোলনা-চেয়ারটার কথা ভেবে হাসি পেল। তারপরেই হঠাৎ কিছু চিন্তার যোগসূত্র আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল সেই মস্তবড় জোড়া বিছানাওয়ালা শোবার ঘরটায় যেটাতে আমি একসময় হেগডেহগেন-এ থেকেছিলাম। আমি দেখলাম টেবিলের ওপর একটা ট্রে রাখা, তাতে মাখন মাখানো পাউরুটির গাদা। দৃশ্যপট পালটে গেল, দেখলাম ওটাতে মাংস রাখা রয়েছে, বেশ লোভনীয় বড় একটা মাংসের টুকরো, একটা ধবধবে সাদা ন্যাপকিন, প্রচুর রুটি, একটা রূপার কাঁটা। দরজা খুলল, আমার বাড়িওয়ালির প্রবেশ, আমাকে আরও চা সাধছে...

স্বপ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন। আমি নিজেকে বোঝালাম, যদি এখনই কিছু খাবার খাই, তাহলে আবার মাথা ঝিমঝিম করবে, মস্তিষ্ক জ্বরাক্রান্ত হবে আর আবার নানান উদ্ভট খেয়ালিপনার সাথে লড়াই করতে হবে। এখন পেটে কোনো খাবারই সহ্য হবে না, আমার এ ধরনের কোনো ইচ্ছাই নেই; অবশ্য এটাও আমার নিজস্বতা, আমার মেজাজের বৈশিষ্ট্য।

হয়তো রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আস্তানা খুঁজে বের করার উপায়ও বের করা যাবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, খুব খারাপ কী হতে পারে, বনের মধ্যে একটা জায়গা খুঁজে নেব। এই শহরটার সমস্ত পরিপার্শ্ব আমার হাতের মুঠোয়; তাছাড়া এখনও পর্যন্ত আবহাওয়ায় বলার মতো ঠাণ্ডা পড়েনি।

সামনে সমুদ্র অলস ঝিমুনিতে দুলছে; তার নীলচে জল কেটে কেটে জাহাজগুলো আর চওড়া নাক গাধাবোটগুলো ভেসে চলেছে, ডাইনে বাঁয়ে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে; চিমনিগুলো থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর ইঞ্জিনের পিস্টনগুলো

ভোঁতা শব্দ করে স্যাঁতসেঁতে বাতাসকে ছিঁড়ে দিচ্ছে। একটুও রোদ নেই, একটুও বাতাস নেই, আমার পেছনের গাছগুলো প্রায় ভিজে আর যে বেঞ্চে বসে আছি, ওটাও স্যাঁতসেঁতে আর ঠাণ্ডা। সময় বয়ে চলেছে। আমি একটু ঝিমুতে লাগলাম, ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আর আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারলাম যে চোখের পাতা বুজে আসছে...

যখন জাগলাম তখন চারপাশে অন্ধকার। আমি শিউরে উঠলাম, ঠাণ্ডায় জমে গেছি, হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। পার্শেলটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি জোরে হাঁটতে লাগলাম, আরও জোরে, যাতে গা-টা গরম হয়, হাত দুটো চাপড়াচ্ছি, পা দুটো ঘষে ঘষে গরম করার চেষ্টা করছি, কারণ আমার শরীরের নিচে ওদুটোর অস্তিত্বই বুঝতে পারছি না, এই রকম করতে করতে দমকলের পাহারাঘরের কাছে পৌঁছে গেলাম। দশটা বেজে গেছে; তার মানে আমি বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।

এখন নিজেকে নিয়ে করি কী? কোথাও যেতে হবে। ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা ঘরটার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, পাহারাদারটা পেছন ফিরলেই তাড়াতাড়ি ঢুকে কোনো বারান্দা-টারান্দায় লুকিয়ে থাকা যায় কিনা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে লোকটার সঙ্গে কথা বলবার জন্য তৈরি হলাম। লোকটা ওর হাতের কুড়ুলটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে তুলল আর আমার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল। ওপরে ওঠানো কুড়ুলটা যেটার ধারালো দিকটা আমার দিকেই ঘোরানো, ওটা যেন আমার স্নায়ুতন্ত্রীতে কোপ বসাচ্ছে। ওই সশস্ত্র লোকটাকে দেখে আমি আতঙ্কে বোবা হয়ে গেলাম আর পিছিয়ে এলাম। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে ওর কাছ থেকে দূরে সরে এলাম। কেবল মুখরক্ষার জন্য আমি ওকে দেখিয়ে কপালের ওপর হাত বোলালাম, ভাবখানা এই যে, কিছু যেন ভুলে গেছি। যখন ফের ফুটপাথে পৌঁছলাম, মনে হল যেন এক বিরাট সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে গেছি।

ঠাণ্ডায়, খিদেয়, মৃতপ্রায় হয়ে গেছি। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, আমি কার্ল জোহানের পথে দৌড় লাগালাম। চিৎকার করে দিব্যি গালছি, কেউ শুনলো কি শুনলো না, বয়েই গেল। পার্লামেন্ট হাউসের কাছে প্রথম গাছগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা ছোকরা শিল্পীর কথা, যাকে আমি একবার টিভোলিতে মার খাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম এবং পরে ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম। আমি খুশির চোটে আঙুল মটকে টর্ডেনস্কিওল্ডস স্ট্রিটে পৌঁছে ওর বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখলাম, সি. জ্যাকারিয়াস বার্টেল নামের কার্ড ঝুলছে। আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ও নিজেই বেরিয়ে এল, সারা গা থেকে সাংঘাতিক মদের আর তামাকের গন্ধ বেরোচ্ছে।

'শুভসন্ধ্যা।' আমি বললাম।

'শুভ সন্ধ্যা। কে, তুমি নাকি? তা এত দেরি করে এলে কেন? লণ্ঠনের আলোয় ছবিটা ভালো দেখাবে না। এটাতে পরে আমি কিছু পরিবর্তন করেছি, একটা খড়ের

গাদাও এঁকেছি। ছবিটা তুমি দিনের আলোতে দেখো, এখন দেখার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।'

'এখনই আমাকে ছবিটা দেখতে দাও,' আমি বললাম, যদিও কোন্ ছবিটার বিষয়ে ও বলছে, আমি মনেই করতে পারলাম না।

'একেবারে অসম্ভব,' ও বলল, 'পুরো ছবিটা এখন হলদে দেখাবে; তাছাড়া আর একটা কথা...' ও আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আজ সন্ধ্যায় একটি অল্পবয়েসি মেয়ে ভেতরে রয়েছে, কাজেই এখনতো সম্ভবই নয়।'

'ওঃ, তাহলে অবশ্যই এখন দেখার কোনো প্রশ্নই নেই।'

আমি পিছিয়ে এলাম, শুভরাত্রি জানালাম এবং চলে এলাম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বনের মধ্যে কোনো একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। হায়, মাঠ যদি ভিজে স্যাঁতসেঁতে না থাকত। আমি কম্বলটা চাপড়ে ভাবলাম, বাইরে শুতে ভালোই লাগবে। শহরে একটা আশ্রয় খুঁজে বের করার জন্য আমি এত দুশ্চিন্তা করেছি যে, এই সমস্ত ব্যাপারটায় এখন আমার বিরক্তি এসে গেছে। নিজেকে একদম ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভালোই লাগবে, তাই কোনো চিন্তা ভাবনা মাথায় না রেখে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। হেজহগেন-এ একটা খাবারের দোকানে জানালায় কিছু খাবারদাবার সাজানো ছিল, আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। একটা গোলাকার ফ্রেঞ্চ রোল এর পাশে একটা বিড়াল শুয়ে ঘুমোচ্ছে, পেছনে একগামলাভর্তি চর্বি আর কয়েকটা গামলায় খাবার রয়েছে। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে খাবারগুলোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম; কিন্তু কেনার মতো পয়সা পকেটে নেই, তাই তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের হাঁটা শুরু করলাম। ধীরে ধীরে হাঁটছি। মেজরস্টুয়েন অতিক্রম করে গেলাম, হেঁটেই চলেছি। মনে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটছি, শেষ পর্যন্ত বগস্ট্যাড-এর বনাঞ্চলে পৌঁছলাম।

এখানে রাস্তা থেকে সরে এসে বিশ্রামের জন্য বসে পড়লাম। তারপর একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজতে লাগলাম, একটু খোঁদল মতো শুকনো জায়গা, যেখানে কিছু ঘাস পাতা বিছিয়ে একটু শোয়া যায়। তারপর প্যাকেটটা খুলে কম্বলটা বার করলাম। এতখানি হেঁটে এসে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়লাম। এপাশ ওপাশ করে একটু আরামে শোয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার একটা কান বেশ ব্যথা করছিল, ওটা চাবুকের আঘাতে একটু ফুলেও গেছে, কাজেই ওই পাশ ফিরে শুতেই পারছি না। জুতা দুটো খুলে মাথার তলায় রাখলাম, সেম্ব থেকে পাওয়া কাগজটা ওপরে পাতলাম।

অন্ধকারের আত্মা যেন আমার ওপর চাদর বিছিয়ে দিল। চারিদিক নিঃস্তব্ধ, সব চুপচাপ। কিন্তু ওপর দিয়ে চিরকালীন সংগীত অস্ফুটে বয়ে চলেছে, বাতাসের গান, দূর থেকে সুরহীন একটা গুঞ্জন, যা কখনো নিঃশব্দ হয় না। এই অন্তহীন অস্ফুট গুঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে ধরে শুনতে শুনতে আমি নিশ্চল হয়ে গেলাম, এ নিশ্চয়ই ওপরের ঢেউ খেলানো আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো যন্ত্র সঙ্গীত, নক্ষত্রের গান...।

'দুর বোকা, তাই কখনো হয় নাকি?' আমি বলে উঠলাম, তারপর জোরে জোরে হাসতে হাসতে মাথাটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছি, 'ওটা কান্নান-এর রাত পেঁচাগুলোর ডাক।'

উঠে পড়লাম, জুতা পড়লাম, অন্ধকারের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকটা ঘুরে ফের শুয়ে পড়লাম। রাগ আর ভয়ের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, প্রায় ভোর হয় হয়, তখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন চোখ মেলেছি, বেলা অনেক গড়িয়ে গেছে, মনে হল প্রায় দুপুর হতে চলেছে। জুতা পড়ে, কম্বলটা গুটিয়ে নিয়ে ফের রওনা দিলাম শহরের দিকে। আজকেও সূর্যের দেখা নেই; আমি একটা কুকুরের মতো কাঁপছি, পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হয়ে গেছে, যেন চোখে দিনের আলো সহ্য হচ্ছে না।

তিনটে বাজছে। পেটের ভেতর খিদে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝেই বমি উঠছে। সস্তার খাবার হোটেলের দিকে গেলাম, খাবারের দাম লেখা বোর্ডটা পড়লাম আর ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালাম, যেন কর্ণড বীফ বা নোনা পর্ক, কোনোটাই আমার উপযুক্ত খাবার নয়। তারপর ঘুরে রেলস্টেশনের দিকে হাঁটা দিলাম।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত রকমের বিভ্রান্তি আমার মাথাটা গণ্ডগোল করে দিল। এটাকে পাত্তা দেব না ভেবে আমি হোঁচট খেতে খেতেও এগিয়ে চললাম। কিন্তু এই অবস্থাটা ক্রমশ আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল, আমি আর পারলাম না, একটা বাড়ির সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে পড়লাম। আমার সমস্ত শরীরে যেন একটা পরিবর্তন এল, যেন কিছু একটা আমার শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে কিংবা আমার মাথার ভেতরে কোনো পর্দা বা টিস্যু দু'টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে।

আমি ঠিক সচেতন নই; মনে হল আমার শ্রবণ কিছু গ্রহণ করছে, আর যখন একজন পরিচিত ব্যক্তি পাশ দিয়ে গেল, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম আর উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদনও জানালাম।

যা হচ্ছিল, হচ্ছিল; কিন্তু এই নতুন যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতিটা কেমন জিনিস? এটা কি ভিজে মাটিতে শোয়ার জন্য হয়েছে, না এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাতরাশ খাইনি বলে হয়েছে? সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বর জানেন, এ রকম ভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না। এই যে আমারই ওপরে এই বিশেষ অত্যাচার, এটা আমার পাওনা হল কীভাবে, বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমার মাথায় খেয়াল চাপল, দেখাই যাক না, একটু অমানুষ হয়ে যাই, 'আঙ্কল'-এর কাছে কম্বলটা নিয়ে যাই। এটা এক শিলিং-এ বাঁধা দেওয়া যেতে পারে, তাহলে অন্তত তিনবারের পুরো খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাতে অন্য কিছু ভেবে নেওয়া পর্যন্ত আমার চলে যাবে। এটা ঠিক যে, হান্স পওলিকে ঠকানো হবে, আমি বন্ধকী দোকানে যেতে যেতে ভাবলাম আর ঠিক দোকানের দরজার বাইরে থেমে পড়লাম, শক্তভাবে মাথা নাড়লাম, তারপর পিছন ফিরে হাঁটা দিলাম। যতই দোকান থেকে দূরে, আরো দূরে

যেতে থাকলাম, ততই মনে স্ফূর্তি বাড়তে লাগল, আমি সাংঘাতিক লোভটা সামলাতে পেরেছি। এই যে সচেতনতা, যে আমি এখনও সৎ এবং সম্মানীয়, এটা আমার মাথায় ঢুকে গেল আর আমাকে একটা অনির্বচনীয় উপলব্ধির দরজায় পৌঁছে দিল যে, আমি একটা আদর্শবান চরিত্র, এই পঙ্কিল মনুষ্য-সমুদ্রে ভাসমান আবর্জনার মধ্যে আমি একটা উজ্জ্বল, শুভ্র আলোর হাতছানি।

সামান্য একটু খাদ্যের জন্য অন্য আরেকজনের সম্পত্তি বন্ধক দেব, একটু খাওয়া আর পান করার জন্য নিজেকে মিথ্যাচারী করব, নিজের আত্মাকে কলুষিত করব, নিজের সম্মানের ওপর কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে দেব, নিজের মুখ কালিমা-লিপ্ত করব, নিজের সামনেই নিজের মাথা নিচু হয়ে যাবে? কক্ষনো না! আমার তো এটা সত্যিকারের ইচ্ছা ছিল না, আমি এটা করব বলে তো সত্যি সত্যিই ভাবিনি; আসলে আমার এইসব হঠাৎ হঠাৎ আসা উদ্ভট ভাবনাচিন্তাগুলোর জন্য আমি মোটেই দায়ী নই, বিশেষ করে আমার যে রকম মাথা ধরে আছে এবং অন্য আরেকজন লোকের কম্বলটা বইতে বইতে যখন আমি প্রায় মারা যাচ্ছিলাম।

ঠিক সময় এলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে সাহায্য পাওয়া যাবেই। গ্রোয়েনল্যান্ডস্লেরেটের ওই মুদির কথাই ধরা যাক। দরখাস্তটা পাঠানোর পর থেকে আমি কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওর দোকানে গিয়ে সাধাসাধি করেছি? আমি কি ওর দোকানের ঘণ্টা বাজিয়েছি, সকাল সকাল হোক বা দেরি করেই হোক, আর আমাকে কি তাড়িয়ে দিয়েছে? আরে, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে আবেদন করতে যাইনি কিংবা কোনো উত্তরও চাইনি! তাহলে আমার এই প্রচেষ্টাটা একদম ব্যর্থ হয়ে গেছে, এটা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না!

হয়তো, এবার আমার ভাগ্য খুলবে। ভাগ্য প্রায়ই ঘুরপথে আসে, আর তাই আমি গ্রোয়েনল্যান্ডস্লেরেটের দিকে হাঁটা দিলাম।

মাথার ভেতর শেষ যে ঝাঁকুনিটা এসেছিল, সেটাতে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছি আর তাই খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আমি ভাবতে লাগলাম, ওকে কী বলা যায়।

হয়তো ওই লোকটা ভালো মানুষই হবে। যদি ওর মাথায় ঝোঁক চাপে, তাহলে হয়তো আমি না চাইলেও আমাকে আমার কাজের জন্য এক শিলিং আগাম দিতে পারে। ওই ধরনের লোকগুলোর মাঝে মাঝে খুব ভালো ভালো খেয়াল চাপে।

আমি একটা বাড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থুতু দিয়ে নিজের প্যান্টের হাঁটুর কাছটায় একটু কালচে করে দিলাম, যাতে ওটা দেখতে একটু সম্মানজনক মনে হয়, তারপর একটা বড় বাক্সের পেছনে অন্ধকার মতো জায়গায় কম্বলের প্যাকেটটা লুকিয়ে রেখে ছোট দোকানটায় ঢুকলাম।

একটা লোক দাঁড়িয়ে পুরনো খবরের কাগজের ঠোঙা বানাচ্ছিল আঠা দিয়ে। 'আমি মি. ক্রিস্টির সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আমি বললাম।

'আমিই সেই ব্যক্তি!' লোকটি জবাব দিল।

'তাই!' আমি আমার নাম বললাম, বললাম যে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম, কোনো কাজ হয়েছে কিনা জানি না।

লোকটি বার কয়েক আমার নামটা উচ্চারণ করল, তারপর হেসে উঠল।

'আচ্ছা, এটা একটু দেখুন তো!' লোকটা পকেট থেকে আমার লেখা দরখাস্তটা বার করল,

'আপনি তারিখটা কী লিখেছেন, দয়া করে দেখুন তো মশাই! আপনি চিঠিতে তারিখ দিয়েছেন, ১৮৪৮,' লোকটা হাসিতে ফেটে পড়ল।

'হ্যাঁ, এটা একটা ভুল তো নিশ্চয়ই।' আমি লজ্জিত মুখে বললাম- একটু অন্যমনস্কতা, বা চিন্তাশূন্যতা, আমি স্বীকার করলাম।

'দেখুন, আমার এমন লোক চাই, যে অন্তত অঙ্কের রাশিতে কোনো ভুল করবে না,' লোকটা বলল, 'আমার বলতে খারাপ লাগছে, আপনার হাতের লেখা এত পরিষ্কার আর চিঠিটা লিখেছেনও বেশ ভালো। কিন্তু...'

আমি চুপ করে অপেক্ষা করে রইলাম, এটা নিশ্চয়ই ওর শেষ কথা নয়। ও আবার ঠোঙা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, এটা দুঃখজনক ব্যাপার, খুবই বাজে ব্যাপার, তবে এমন ভুল আর হবে না। তাছাড়া এই সামান্য ছোট্ট ভুলটা নিশ্চয়ই আমাকে খাতা লেখার কাজের জন্য অযোগ্য করে তুলবে না?'

'না, আমি তা বলিনি,' ও জবাব দেয়, 'কিন্তু ইতিমধ্যে এত কাজের চাপ বেড়ে যায় যে, আমি অন্য একজন লোককে ঠিক করে নিই।'

'তার মানে, কাজটা আর খালি নেই?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'ও, ঠিক আছে, তাহলে এ বিষয়ে আর কিছুই বলার নেই?'

'না। আমি দুঃখিত, কিন্তু...'

'গুড ইভনিং।' আমি বললাম।

রাগ চড়ে গেল, মাথার ভেতর আগুন জ্বলতে লাগল। আমি কম্বলের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে পথ চলতে শুরু করলাম, শান্ত ভদ্র পথচারীদের অযথা ধাক্কা মেরে মেরে, আর একবারও দুঃখ প্রকাশ করলাম না।

একজন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়ল আর আমার এই রকম দুর্ব্যবহারের জন্য আমাকে জোর ধমক লাগাল। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে একটা অর্থহীন চিৎকার করলাম, নাকের ওপর ঘুঁষি দেখালাম আর তারপর অসহ্য ক্রোধে অন্ধ হয়ে পথ চলতে লাগলাম।

লোকটা একটা পুলিশকে ডাকল আর আমি সেই মুহূর্তে আমার হাতের নাগালে এইরকমই কিছু একটা চাইছিলাম। আমি ইচ্ছে করে হাঁটার গতি কমিয়ে দিলাম,

যাতে ও আমাকে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু ও এল না। কারো অদম্য আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলো এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, এর কি কোনো কারণ আছে? আমি কেন ১৮৪৮ লিখলাম? ওই নারকীয় তারিখটার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এদিকে আমি না খেতে পেয়ে মরছি, আমার পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়িগুলো পোকার মতো মোচড়াচ্ছে আর আমি যতদূর জানি, আজকের বাকি দিনটায় আমার ভাগ্যের খাতায় খাদ্য নামে কোনো বস্তুর কথা লেখা নেই।

মানসিক এবং শারীরিকভাবে আমি ক্রমাগত আরো বেশি ঝুঁকে পড়ছি; প্রত্যেকদিন আমি অসৎ কার্যকলাপে নিজেকে ডুবিয়ে ফেলছি, যার জন্যে আমি কোনোরকম লজ্জা না পেয়ে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছি, অসহায় মানুষদের ভাড়ার টাকা না দিয়ে প্রতারণা করছি, অন্য লোকের কম্বল ঝেড়ে দেবার জন্য অতি নীচ ভাবনাচিন্তার সঙ্গে লড়াই করছি, তার জন্য কোনো অনুশোচনা বা বিবেকের খোঁচা নেই।

আমার ভেতরে যেন নোংরা নোংরা জায়গা তৈরি হচ্ছে, কালো কালো বীজগুটি আরো বেশি বেশি ছড়িয়ে পড়ছে। আর ওপরে স্বর্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বসে বসে আমার ওপর নজর রেখেছেন আর দেখছেন যাতে ধীরে ধীরে শিল্পকলার সমস্ত নিয়ম সমভাবে এবং ছেদহীনভাবে মেনে আমার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

কিন্তু নরকের পাতালগর্ভে রাগী শয়তানরা আরো ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করছে, আমার কোনো একটা মারাত্মক পাপ বা ক্ষমার অযোগ্য কোনো অপরাধ ঘটতে এত দেরি হচ্ছে কেন, যাতে ঈশ্বর তাঁর বিচারে আমাকে নরকে ছুড়ে ফেলে দেন।

আমি দ্রুত পা চালালাম, আরো দ্রুত, আরো দ্রুত, হঠাৎ করে বাঁ দিকে ঘুরলাম আর অত্যন্ত উত্তেজিত, রাগী অবস্থায় একটা বাড়ির দরজায় পৌঁছলাম, দরজাটায় কী সুন্দর অলঙ্করণ। আমি এক সেকেন্ডের জন্যেও না থেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম, কিন্তু প্রবেশপথের ওই অলঙ্করণের সৌন্দর্য আমার চেতনায় ঢুকে গেল, ওই সুসজ্জিত ঘর, মেঝের টাইল্‌সগুলোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আমার মনের দৃষ্টিতে পরিষ্কার গ্রথিত হয়ে গেল। তিনতলায় উঠে, আমি জোরে ঘণ্টি বাজালাম। আমি ঠিক তিনতলায় কেন থামলাম, কেন সিঁড়ি থেকে খানিকটা দূরের ঘণ্টিটা ধরে বাজালাম?

একটা অল্পবয়েসি মেয়ে, একটা ধূসর রঙের কালো বর্ডার দেওয়া গাউন পরা, দরজা খুলল। একটু অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না, আজকে দেবার মতো কিছু নেই,' আর দরজা বন্ধ করার উপক্রম করল। এতে আমার রাগ হয়ে গেল, মেয়েটা আমাকে সোজাসুজি ভিখারি ভাবল?

আমি খুব ঠাণ্ডা মাথায় টুপিটা তুলে ওকে বেশ সম্মান দিয়ে ঝুঁকে অভিবাদন করলাম, যেন ওর কথাটা আমার কানেই যায়নি এমনিভাবে খুব নম্র ভঙ্গিতে বললাম, 'মাপ করবেন, ম্যাডাম, ঘণ্টিটা একটু জোরেই বাজানো হয়ে গেছে। আচ্ছা,

এখানেই তো একজন পঙ্গু ভদ্রলোক থাকেন, যিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন একটা লোকের জন্য, যে তাঁকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঘোরাবে?'

মেয়েটা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আমার এই মিথ্যা ভাষণটা হজম করল, মনে হল, আমার সম্বন্ধে ওর ধারণাটা নিয়ে একটু দ্বিধান্বিত।

শেষকালে বলল, 'না, এখানে ওরকম কোনো পঙ্গু ভদ্রলোক থাকেন না।'

'না? একজন বুড়ো ভদ্রলোক- দিনে দু'ঘণ্টা-ঘণ্টায় ছ' পেন্স?'

'না।'

'ওঃ! সেক্ষেত্রে মাপ চাইছি ম্যাডাম।' আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে, দোতলায় হবে। আমি আসলে আমার পরিচিত একটা লোককে দিতে চাইছিলাম। আমার নাম ওয়েদেলজার্লসবাগ*'। এই বলে আমি ফের নমস্কার করে পেছন ফিরলাম। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। হতবাক হয়ে জায়গা থেকে নড়তে পারছে না, আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি, ওর চোখ আমাকে অনুসরণ করছে।

আমার মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মাথাটা পরিষ্কার। মেয়েটি যে আমাকে বলল যে, আজকে আমাকে দেবার মতো কিছু নেই, এই কথাটা আমার ওপর যেন বরফ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। তার মানে ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছে যে, যে কেউ আমার দিকে আঙুল তুলে বলতে পারে, 'ওই যে একটা ভিখারি যাচ্ছে, আরে যাদের লোকেরা বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে খাবার দেয়!'

মলার স্ট্রিটে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম, আর ভেতরে মাংস রোস্ট করার তাজা গন্ধ শুঁকতে লাগলাম; আমার হাতটা ততক্ষণে দরজার হাতলে আর উদ্দেশ্যহীনভাবে আমি প্রায় ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমার হুঁশ ফিরে এল আর আমি তাড়াতাড়ি ওই জায়গা পরিত্যাগ করলাম। বাজারে পৌঁছে আমি বিশ্রাম করার জন্য একটা জায়গা খুঁজতে লাগলাম। সব বেঞ্চিগুলোই দখল হয়ে আছে আর আমি বৃথাই গির্জার বাইরে চারপাশে ঘুরে ঘুরে একটা নির্জন জায়গা খুঁজতে লাগলাম, যেখানে একটু বসতে পারি।

স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক, আমি বিমর্ষভাবে স্বগতোক্তি করলাম আর আবার হাঁটতে শুরু করলাম। বাজারের এক কোনায় একটা ফোয়ারার পাশে ঘুরে এলাম আর কয়েক ঢোক জল খেলাম। তারপর আবার পা টেনে টেনে হাঁটা, প্রত্যেক দোকানের জানালার সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়ানো, প্রত্যেকটি চলমান গাড়ি একদৃষ্টে দেখে যাওয়া। মাথার ভেতরে যেন প্রচণ্ড উত্তাপ আর আমার রগ দুটোর ভেতরে কিছু যেন অদ্ভুতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। জলটা পেটের ভেতর বিশ্রিভাবে গুলোচ্ছে আর আমি বমি করছি, খোলা রাস্তায় লোকে যাতে দেখতে না পায়, তাই এদিকে থেমে, ওদিকে থেমে। এইভাবে চলতে চলতে আমি 'আমাদের ত্রাণকর্তার সমাধিস্থলে' পৌঁছে গেলাম।

---

* নরওয়ের শেষ রাজ পরিবারের পদবি

এখানে এসে আমি হাঁটুর ওপর কনুই আর হাতের ওপর মাথা রেখে বসে রইলাম। এই রকম কুঁকড়ে থাকা অবস্থায় আমার ভালই লাগছিল আর বুকের ভেতর সেই যন্ত্রণাদায়ক চিবোনোর মতো ভাবটা আর টের পাচ্ছিলাম না।

আমার একপাশে একটা বড় গ্রানাইট পাথরের ওপর উপুড় হয়ে একজন পাথর-কাটিয়ে কিছু খুদে খুদে লিখছিল। ওর চোখে ছিল নীল চশমা আর আমার এক বিস্মৃত, পরিচিত লোকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

যদি আমি সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ওর কাছে কিছু চাইতে পারতাম! যদি ওকে সত্যি কথাটাই বলতাম যে, আমার অবস্থাটা এখন একটু কঠিন; মানে আমার বেঁচে থাকাটাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ওকে আমার দাড়ি কামানোর টিকিটগুলো দিতে পারতাম।

আরি ব্বাস! আমার দাড়ি কামানোর টিকিটগুলো; প্রায় এক শিলিং-এর টিকিটগুলো!

আমি নার্ভাসভাবে আমার ওই মহামূল্যবান সম্পত্তি খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই তাড়াতাড়ি করেও ওগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। আমি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ে ঘেমে নেয়ে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত বুক পকেটের একদম নিচের দিকে আরো একগাদা, কিছু লেখা, কিছু সাদা, মূল্যহীন কতকগুলো কাগজের সঙ্গে ওগুলো পেয়ে গেলাম।

বার বার ওই ছটা টিকিট গুনে গুনে দেখতে লাগলাম, সামনে থেকে পেছন থেকে। এগুলো এতদিন আমার কোনো কাজেই আসেনি, আর আমার একটা খেয়ালই বলা যেতে পারে, আমি ভেবে দেখলাম, আমার আর দাড়ি কামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

তাহলে ছ পেন্স-এর মতো বাঁচা যাবে, এটা সাদা টাকা, কোন্‌স্‌বার্গ রুপো। ব্যাংক বন্ধ হয় ছ'টায়; আমি তাহলে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে অপল্যান্ড কাফের বাইরে আমার লোকের জন্য নজর রাখতে পারি।

এই ভাবনাটায় আমি এতই খুশি হলাম যে, অনেকক্ষণ ওইখানে বসে রইলাম। সময় কেটে যাচ্ছে। আমার চারপাশে চেস্টনাট গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে জোরে হাওয়া বয়ে চলেছে আর দিন শেষ হয়ে আসছে।

আচ্ছা, ব্যাংকে ভালো পোস্টে কাজ করে এমন একটা অল্পবয়েসি ভদ্রলোকের কাছে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে ছটা দাড়ি কামানোর টিকিট নিয়ে যাওয়াটা একটা ফালতু কাজ নয় কি? হয়তো ওর নিজের কাছেই এ রকম একটা, কি দুটো বই আছে, যাতে একদম ঝকঝকে পরিষ্কার টিকিটগুলো রয়েছে, আর আমারগুলো তো দুমড়েমুচড়ে গেছে!

কে বলতে পারে? আমি আমার সমস্ত পকেটগুলো খুঁজে দেখলাম, যদি অন্য কিছু পাই, যা ওই টিকিটগুলোর সঙ্গে দিতে পারি। কিন্তু কিচ্ছু পেলাম না। আচ্ছা, ওকে আমার টাই-টা দিয়ে দিলে কেমন হয়? টাই ছাড়াই আমার চলে যাবে, যদি কোটের

গলার বোতামটা আটকে দিই, অবশ্য ওটাতো ইতিমধ্যে আটকানোই আছে, কারণ আমার ওয়েস্ট কোটটা তো নেই। আমি টাই-টা খুলে ফেললাম, এটা এত চওড়া যে, আমার বুকের অর্ধেকটা ঢেকে থাকতো– তারপর ওটাকে সাবধানে ঝেড়েঝুড়ে ভাঁজ করে একটা পরিষ্কার লেখার কাগজে টিকিটগুলোর সঙ্গে রাখলাম। তারপর গির্জার উঠোন ছেড়ে অপল্যান্ড-এর দিকে যাবার রাস্তা ধরলাম।

টাউন হলের ঘড়িতে সাতটা বাজে। আমি কাফে-র পাশ দিয়ে সামনে পেছনে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম, লোহার রেলিংগুলো ঘেঁষে, আর কারা ভেতরে ঢুকছে বা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে, তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আটটার কাছাকাছি আমি একটা অল্পবয়েসি, সুন্দর পোশাক পরা তাজা যুবককে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে এসে কাফে-র দরজার দিকে যেতে দেখলাম। ওকে দেখে আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা একটা ছোট্ট পাখির মতো ছটফট করে উঠল আর আমি কোনোরকম অভিনন্দন ছাড়াই বলে উঠলাম, 'বন্ধু, ছ পেন্স! এটা ধরুন, এতে পুরো ছ পেন্সের উপযুক্ত জিনিস আছে,' এবং আমি ওর হাতে আমার ছোট কাগজের প্যাকেটটা গুঁজে দিলাম।

'নেই,' ও বলে উঠল, 'ঈশ্বর জানেন, সত্যিই নেই' ও আমার চোখের সামনে ওর মানিব্যাগটা খুলে উল্টেপাল্টে দেখাল, 'গত রাতে বেরিয়েছিলাম, আর একদম পুরো পকেট খালি হয়ে গেছে! বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমার কাছে কিচ্ছু নেই।'

'না, না, ঠিক আছে ভাই, ঠিকই বলেছেন,' আমি বললাম, আর ওর কথাটা মেনে নিলাম। এ রকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারে ওর মিথ্যা কথা বলার কোনো কারণই নেই। এমনকি যখন ওর পকেটগুলো খুঁজে খুঁজে কিচ্ছু না পেয়ে ওর নীল চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল, সেটাও আমাকে দুঃখ দিল। আমি পিছু হটে এলাম। 'মাপ করবেন,' আমি বললাম, 'আমার অবস্থাটা একটু খারাপ, তাই।' আমি রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা নেমে গেছি,তখন ওই প্যাকেটটা নিয়ে ও আমায় ডাকল। 'রেখে দিন! রেখে দিন!' আমি বললাম, 'ওটা আপনার কাছেই থাকুক। ওতে কয়েকটা তুচ্ছ জিনিস আছে, আমার প্রায় সব পার্থিব সম্পত্তি,' আমার নিজের কথায় আমি এত কাতর হয়ে পড়লাম, এই গোধূলি নিশীথে আমার কথাগুলো এত বিষাদময় শোনাল যে, আমারই কান্না পেয়ে গেল। টাটকা বাতাস বইছে, আকাশে মেঘের টুকরোগুলো একে অপরকে তাড়া করছে, যতই রাতের অন্ধকার বাড়ছে, ঠাণ্ডাও ক্রমাগত বাড়ছে। পুরো রাস্তাটা আমি হাঁটলাম, কাঁদতে কাঁদতে হাঁটলাম, নিজের মধ্যে ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে যাচ্ছি আর বার বার মুখ থেকে কয়েকটা কথা ছিটকে বেরোচ্ছে, যখনই চোখের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, তখনই আবার নতুন করে চোখের জল পড়তে শুরু করছে, 'হে ঈশ্বর, আমি কি হতভাগ্য! হে ঈশ্বর, আমি একটা হতভাগা!'

এক ঘণ্টা কাটল; কি অদ্ভুত ধীরে ধীরে, কি বিষণ্ণতায়। মার্কেট স্ট্রিটে অনেকক্ষণ কাটালাম; সিঁড়ির ধাপের ওপর বসছি, দরজার আড়ালে বসছি, আর যখনই কোনো লোক কাছাকাছি এসে পড়ছে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দোকানের

ভেতরটা দেখছি, যেখানে লোকজন কেনাকাটা নিয়ে, টাকা পয়সা নিয়ে দরদস্তুর করছে। শেষ পর্যন্ত গির্জা আর বাজারের মাঝামাঝি জায়গায়, একটা হোর্ডিং এর পেছনে একটা ঢাকা জায়গা খুঁজে পেলাম।

না, এই সন্ধেতে আজ আর ওই বনটায় যেতে পারব না। গায়ে আর জোর নেই যে ওই পর্যন্ত হাঁটি, আর জায়গাটা এত দূর! রাত্রিটা এখানেই যেভাবে পারি, কাটাতে হবে। যদি খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ে, তাহলে না হয় গির্জার চারপাশে ঘুরতে থাকব। যাই হোক, এ নিয়ে আর ভাবব না। আমি হেলান দিয়ে বসে ঢুলতে আরম্ভ করলাম।

চারপাশে গোলমাল কমে এসেছে; দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। পথচারীর পায়ের শব্দ কদাচিৎ শোনা যাচ্ছে, আর চারপাশের সমস্ত জানালাগুলোয় আলো নিভে গেছে। আমি চোখ খুললাম, বুঝতে পারলাম, সামনে একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চকচকে বোতামগুলো দেখে বুঝলাম, একজন পুলিশম্যান, যদিও তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'গুড নাইট,' ও বলল।

'গুড নাইট।' আমি ভয় পাওয়া স্বরে বললাম।

'আপনি কোথায় থাকেন?' ও জিজ্ঞেস করল।

আমি অভ্যাসবশে কোনো চিন্তা না করেই, আমার পুরনো ঠিকানাটা বলে ফেললাম, ছাদের ওপরের সেই ঘরটা।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আমি উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'না, বিন্দুমাত্র না,' ও উত্তর দিল, 'কিন্তু আপনার এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত; এখানে শুয়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

'ও, তা ঠিক; আমারও মনে হচ্ছে, এ জায়গাটা একটু বেশি ঠাণ্ডা।' আমি গুড নাইট বলে উঠে পড়ে সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমার পুরনো বাসস্থানের রাস্তা ধরলাম। যদি খুব সাবধানে যেতে পারি, তাহলে হয়তো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারব, কেউ শুনতেও পাবে না। মাত্র আটটাই তো সিঁড়ির ধাপ আছে আর কেবল শেষের ধাপ দুটো আমার পায়ের চাপে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে। দরজার কাছে এসে আমি জুতা খুলে ফেললাম আর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। চারিদিক চুপচাপ। কোথাও কোনো একটা ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি, একটা বাচ্চা কোথাও একটু কেঁদে উঠল। তারপর অবশ্য আর কিছুই শোনা গেল না। আমি আমার ঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছি, অভ্যাসমতো ছিটকিনিটা খুলে ঘরে ঢুকলাম আর নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

সব তেমনি আছে আমি যেমন রেখে গিয়েছিলাম। পর্দাগুলো জানালা থেকে সরানো আর বিছানাটা ফাঁকা পড়ে আছে। টেবিলের ওপর একটা লেখা কাগজের টুকরোর ওপর চোখ গেল, বোধহয় বাড়িওয়লিকে লেখা আমার সেই চিঠিটা- আমি এই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরে সে হয়তো ওপরে ওঠেইনি।

আমি টেবিলের ওপর সাদা জায়গাটা হাতড়ালাম, আর অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম কাগজটা একটা চিঠি। ওটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই যতটা পারা যায় দেখতে চেষ্টা করলাম, ঠিকানাটা খুব বাজে হাতের লেখা, কিন্তু তার মধ্যেই আমার নামটা আমি পড়তে পারলাম। ও! আমি ভাবলাম, এটা নিশ্চয়ই আমার বাড়িওয়ালি আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে আর আমাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছে।

খুব ধীরে ধীরে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, আমার এক হাতে চিঠিটা, আর এক হাতে জুতা জোড়া আর বগলে কম্বলের বান্ডিল। আমি সাবধানে দাঁতে দাঁত চেপে ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ির ধাপগুলো পার হয়ে খুশিমনে নিচে নেমে এসে দরজায় দাঁড়ালাম। তারপর জুতা পরে অনেক সময় নিয়ে জুতার ফিতে বেঁধে তৈরি হয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম, হাতে চিঠিটা, চোখে শূন্য দৃষ্টি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।

রাস্তার একটা গ্যাসের আলো দপদপ করে জ্বলছে। আমি সোজা ওটার কাছে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে বান্ডিলটা রেখে চিঠিটা খুললাম। খুব ধীরে, খুব সুচিন্তিতভাবে। আলোর একটা স্রোত যেন আমার বুকের ভেতর ঢুকে গেল, আমি শুনলাম আমি একটা চিৎকার দিলাম, একটা অর্থহীন আনন্দের চিৎকার। চিঠিটা এসেছে সম্পাদকের কাছ থেকে। আমার গল্পটা মনোনীত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ছাপতে চলে গেছে। কয়েকটা সামান্য পরিবর্তন, গোটা দুই লেখার ভুল সংশোধন,... সহজাত দক্ষতার সঙ্গে লেখা হয়েছে,... আগামীকালই ছাপা হয়ে বেরিয়ে যাবে.... আধা গিনি।

আমি হাসছি, কাঁদছি, লাফাচ্ছি,রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছি, থামছি, দুই উরুতে চাপড় মারছি, চিৎকার করে শপথ করছি। সময় কেটে যাচ্ছে।

সারারাত ধরে, ভোর হওয়া পর্যন্ত আমি রাস্তায় হুটোপাটি করেছি আর অনবরত বলে গেছি, 'সহজাত দক্ষতার সঙ্গে লেখা, কাজেই একটা সেরা লেখা– একটা প্রতিভা– আধা গিনি।'

২.

কয়েক সপ্তাহ পরে, একদিন সন্ধেবেলায় বেরিয়েছি। গির্জার উঠোনে বসে একটা খবরের কাগজের জন্যে একটা লেখা তৈরি করছিলাম। কিন্তু যখন লেখাটা নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি, তখন রাত আটটা বাজল আর চারদিক অন্ধকার হয়ে এল, দরজাগুলো বন্ধ করার সময় হয়েছে।

আমার খিদে পেয়েছে,– প্রচণ্ড খিদে। যে দশ শিলিং পেয়েছিলাম, কপাল মন্দ, খুব তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে গেল। আজ দুদিন হল, না, তিনদিন হল, কিছুই খাইনি। মাথাটা ঘুরছে, পেন্সিল ধরে রাখাটাও কষ্টকর মনে হচ্ছে। পকেটে অর্ধেকটা পেন্সিলকাটা ছুরি আর একটা চাবির গোছা রয়েছে। কিন্তু একটা ফার্দিং-ও নেই।

যখন গির্জার উঠোনের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, আমি সোজা বাড়ি যাব ভাবলাম, কিন্তু আমার ঘরটার কথা ভেবে একটা সহজাত ভয় এসে গেল, এক কেটলি-মিস্ত্রির খালি কারখানা, অন্ধকার, একদম ফাঁকা, আমাকে এখন কিছুদিন থাকার অনুমতি দিয়েছে। আমি টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি ভ্রূক্ষেপ নেই, টাউন হল পার হয়ে গেলাম, একদম সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেছি। তারপর রেলপুলের কাছে একটা সিটে বসে পড়লাম।

এই মুহূর্তে কোনো বিষণ্ন চিন্তা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে না। আমি আমার দুঃখকষ্ট ভুলে গেছি, সমুদ্রের দৃশ্য আমাকে শান্ত করে তুলেছে, অন্ধকারে সমুদ্র বিছিয়ে আছে, কী শান্ত, কী সুন্দর! অভ্যাসের বশে আমি এখন এইমাত্র শেষ করা লেখাটা পড়ব, আমার এত যন্ত্রণাবিদ্ধ মাথাতেও মনে হচ্ছে, এটা আমার এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ লেখা।

পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করলাম, চোখের খুব কাছে ধরে পড়তে লাগলাম, লাইনের পর লাইন। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ওটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। সব কিছু যেন নিশ্চল, থেমে আছে। সমুদ্র মুক্তোর মতো সাদা জ্যোতি বিকিরণ করে

শুয়ে আছে, ছোট ছোট পাখিগুলো নিঃশব্দে আমার মাথার ওপর দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে।

দূরে একজন পুলিশম্যান রাত পাহারা দিচ্ছে। এছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সমস্ত বন্দর এলাকা চুপচাপ।

আমার পার্থিব সম্পত্তিগুলো আবার গুনলাম। একটা অর্ধেক-ভাঙা পেন্সিল-কাটা ছুরি, এক গোছা চাবি, কিন্তু একটা ফার্দিং-ও নয়। হঠাৎ-ই আমি আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজগুলো বার করলাম, একদম অচেতন একটা যান্ত্রিক নড়াচড়া। একটা সাদা, কিছু না লেখা কাগজ বেছে নিলাম– ঈশ্বর জানেন, কোথা থেকে মাথায় এই উদ্ভট ভাবনাটা এল, তারপর একটা ঠোঙা বানালাম, মুখটা বন্ধ করলাম, এমনভাবে যে, দেখে মনে হবে ঠোঙার ভেতরে কিছু ভরা আছে, আর তাই ওটা ফুলে আছে। তারপর ওটাকে দূরে ফুটপাথে ছুঁড়ে দিলাম। হাওয়ায় ওটা আর একটু সরে গেল, তারপর চুপচাপ পড়ে রইল।

ততক্ষণে খিদেটা আমাকে একেবারে চেপে ধরেছে। আমি বসে ওই সাদা ঠোঙাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওটা দেখে মনে হচ্ছে যেন চকচকে রূপার মুদ্রা ভরা ঠোঙাটা এখনই ফেটে যাবে, আর নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছি যে, ওটার মধ্যে সত্যিই কিছু আছে। আমি বসে বসে নিজেকেই বলতে লাগলাম, কত টাকা আছে ওটার ভেতরে আন্দাজ কর, যদি আন্দাজ মিলে যায়, তাহলে টাকাটা আমার হবে।

আমি বসে বসে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিলাম, ঠোঙাটার তলার দিকে ছোট ছোট পেনিগুলো রয়েছে আর ওপরের দিকে মোটাসোটা শিলিংগুলো রয়েছে, পুরো ঠোঙাটা টাকায় ভর্তি! আমি বসে বসে ওটার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলাম, আর নিজেকে তাড়া দিতে লাগলাম। যা, ওটা চুরি কর।

সেই সময় আমি ওই কনস্টেবলের কাশির আওয়াজ পেলাম। আমার মাথায় কী ভর করল যে, আমাকেও ওই কাজ করতে হবে। আমি সিটটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক ওর মতোই কাশলাম, তিনবার, যাতে ও শুনতে পায়। ও এসে ঠোঙাটা দেখে লাফিয়ে উঠবে না? আমি বসে পড়ে এই মজাটায় খুব হাসলাম, দু'হাত ঘষতে ঘষতে বেপরোয়া ভাবে আনন্দের চোটে দিব্যি গালতে লাগলাম। ও ঠোঙাটা তুললে কি হতাশই না হবে, কুকুর কোথাকার! এই শয়তানির জন্য ওকে নরকের আগুনে পুড়তে হবে না? উপোস করে করে আমার নেশা হয়ে গেছে, আমার উপবাস আমাকে মাতাল করে তুলেছে।

মিনিট কয়েক পরে পুলিশম্যানটি চারদিকে দেখতে দেখতে আর ফুটপাথে ওর জুতার লোহার নাল-এ শব্দ করতে করতে এসে গেল। ও যথেষ্ট সময় নিচ্ছে। ওর তো সারা রাত্রি পড়ে আছে! ঠোঙাটার খুব কাছে না আসা পর্যন্ত ও ওটা দেখতেই পায়নি। তারপরই ও দাঁড়িয়ে গেল আর ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠোঙাটা রাস্তায় পড়ে আছে, ধবধবে সাদা, ফোলা ফোলা, ভেতরে যেন অনেক কিছু ভর্তি আছে,

হয়তো অনেক টাকা, নাকি? ও ঠোঙাটা তুলে নিল। হ্যাঁ, এটা খুবই হালকা, একটা পালকের মতো। ও ওর বড় বড় হাত দিয়ে ঠোঙাটা খুলল আর ভেতরে তাকিয়ে দেখল। আমি পাগলের মতো হাসছি, উরু চাপড়ে চাপড়ে হাসছি। কিন্তু আমার গলা দিয়ে একটুও শব্দ বেরোচ্ছে না, আমার হাসিটা চাপা আর জ্বোরো রুগির মতো, চোখে জল এনে দেয়।

ফুটপাথের পাথরের ওপর শব্দ হচ্ছে, ক্লিং, ক্লিং, পুলিশম্যান ঘুরে বন্দরের যাত্রী নামার রাস্তার দিকে যাচ্ছে। আমি বসে রইলাম, চোখে জল, শ্বাস নেবার জন্য হেঁচকি তুলছি, জ্বোরো রুগির মতো মজা করছি। আমি নিজের মনেই জোরে জোরে কথা বলতে লাগলাম, পুলিশটা কেমন করে ঠোঙাটা তুলল, ওর হাতের মধ্যে ঠোঙাটা ধরে কেমন করে তাকিয়ে দেখল ভেতরে কী আছে, তারপর আমি নিজের মনেই বারবার বলতে লাগলাম, 'ও কাশলো আর ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।' আমি আরও নতুন নতুন কথা যোগ করতে লাগলাম, পুরো বাক্যটাই পালটে দিলাম, বেশ আকর্ষণীয় আর কৌতুককর করে তুললাম কথাগুলো। পুলিশম্যানটা আর একবার কাশলো, 'খিউ, খিউ।'

কথাগুলোর রকমফের করতে করতে দম ফুরিয়ে গেল, এদিকে সন্ধ্যা রাত্রির দিকে অনেকটা এগিয়েছে। এরপর আমার একটা ঘুম ঘুম ভাব এসে গেল, একটা বেশ খুশি খুশি অবসন্ন মেজাজ, যেটা আটকাবার কোনো চেষ্টাই আমি করছি না। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, একটা মৃদু হাওয়া উঠেছে, সমুদ্রের মুক্ত-নীল বুকে মৃদু ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। জাহাজগুলো, যার মাস্তুলগুলো আকাশের পটভূমিতে দেখতে পাচ্ছিলাম, ওদের কালো কালো কাঠামো নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো যেন আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমার কোনো ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, খিদেটাও তার ধার হারিয়ে ফেলেছে। তার জায়গায় আমার একটা আনন্দময় শূন্যতাবোধ, কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না। কেউ আমাকে দেখছে না। সিটের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বসলাম। এইভাবে বসে আমার একাকিত্ব উপভোগ করছি। মনে কোনো মেঘ নেই, কোনো কষ্ট নেই, কোনো খেয়াল বা ইচ্ছা পূরণ হয়নি, এমন কোনো চিন্তাও মাথায় নেই। চোখ দুটো খোলা, মন একেবারে চিন্তাহীন। শুয়ে আছি, যেন মন্ত্রমুগ্ধ। একটা শব্দও বিরক্ত করছে না। একটা নরম অন্ধকার সমস্ত পৃথিবীটাকে আমার চোখের আড়াল করে রেখেছে, আর আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে সমাহিত করে রেখেছে। কেবল নৈঃশব্দের একটা একঘেয়ে একাকী, ঘুমপাড়ানি গানের মতো স্বর আমার কানে বেজে চলেছে আর ওই সমুদ্রের ওপরের কালো কালো দৈত্যগুলো আমাকে সমুদ্রের বহু ভেতরে টেনে নেবে, আশ্চর্য সব দেশে নিয়ে যাবে, সেখানে কোনো মানুষ বাস করে না, আর আমাকে নিয়ে যাবে রাজকুমারী ইয়ালাজালির প্রাসাদে, যেখানে একটা অকল্পনীয় জাঁকজমক আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আর কোনো মানুষ যার নাগাল পায়নি। আর রাজকুমারী নিজে একটা বিশাল ঝকঝকে হলঘরে বসে আছে, নীলকান্ত মণির তৈরি, সিংহাসনটা হলদে গোলাপের আর আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছে, যখন

আমি এলাম তখন হাঁটু গেড়ে বসে, মুখে হাসি, আমাকে বললো, 'স্বাগতম, হে নাইট, আমার দেশে আর আমার কাছে আপনি স্বাগত। আপনার জন্য আমি কুড়িটি গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা করে আছি আর প্রত্যেক উজ্জ্বল রাত্রে আপনাকে আকুল হয়ে ডেকেছি। যখন আপনি দুঃখ পেয়েছেন, আমি এখানে বসে কেঁদেছি, যখন আপনি ঘুমিয়েছেন, আমি আপনাকে মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে তুলেছি।' তারপর সেই সুন্দরী আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে দীর্ঘ অলিন্দ ধরে হেঁটে চলেছে, আর বিশাল জনতার ভিড় চিৎকার করছে, 'হুররে,' আর আমরা উজ্জ্বল বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি, সেখানে তিনশ' সুন্দরী যুবতীরা হাসছে, খেলা করছে; তারপর আর একটা হলঘরের মধ্যে দিয়ে গেলাম, যেখানে সবকিছুই পান্না দিয়ে তৈরি আর সেখানে সূর্যকিরণে ঝকমক করছে।

অলিন্দে আর গ্যালারিতে বাদ্যকার, সঙ্গীতকাররা হেঁটে চলেছে, চারিদিক সুগন্ধে ম ম করছে।

আমি তার হাতটা আমার মুঠোয় ধরে রেখেছি। আমার রক্তের মধ্যে যেন কোনো ডাইনির জাদুবিদ্যা ঢেউ তুলেছে, আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আর ও আমার কানে কানে বলল, 'না, এখানে নয়, আর একটু দূরে চল।' আমরা একটা গাঢ় লালরঙের ঘরে ঢুকলাম, সমস্ত ঘরটা চুনি দিয়ে তৈরি,মহার্ঘ্য সৌন্দর্য, আর আমি অচেতন হয়ে পড়লাম।

পরে, আমি অনুভব করলাম, ওর দুই হাত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, ওর সুগন্ধি শ্বাস আমার মুখে এসে লাগছে, ও ফিস্‌ফিস করছে, 'স্বাগত, প্রিয়তম, আমাকে চুমু খাও, আরো, আরো...'

আমি সিটে বসে দেখলাম, নক্ষত্ররা ছুটে চলেছে আর আমার ভাবনাচিন্তাগুলো আলোর ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে...

যেখানে শুয়েছিলাম, কখন যেন সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পুলিশম্যানটা আমাকে জাগাল। জীবনের বাস্তবতা আর দুঃখদুর্দশার মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে টেনে আনল আমাকে। জেগে উঠেই নিজেকে খোলা আকাশের তলায় দেখে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। পরমুহূর্তেই একটা তেতো নৈরাশ্যে মন ছেয়ে গেল। এখনও বেঁচে আছি ভেবেই আমার কান্না পেয়ে গেল। যখন ঘুমিয়েছিলাম, সেই সময় বৃষ্টি হয়েছিল, আমার পরনের কাপড়চোপড় পুরো ভিজে গেছে আর আমার হাত পা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অন্ধকার ক্রমশ আরো ঘন হচ্ছে। খুব কষ্ট করে আমার সামনে দাঁড়ানো পুলিশম্যানের মুখটা ঠাহর করতে পারলাম।

'তাহলে এটাই ঠিক,' ও বলল, 'এখন উঠুন তো!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। ও যদি আমাকে শুয়ে পড়ার হুকুম করত, আমি তাহলে তাই করতাম। মনটা দারুণ নিরানন্দ হয়ে আছে। শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই; তার ওপর আবার খিদের কামড় ক্রমাগত টের পাচ্ছি।

'একটু দাঁড়ান মশাই,' পুলিশম্যানটা চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথার টুপিটা ফেলেই চলে যাচ্ছেন, গাণ্ডু কোথাকার! হ্যাঁ ঠিক আছে, যান কেটে পড়ুন।'

'ঠিকই, কিছু একটা ভুল করে ফেলে চলে যাচ্ছিলাম,' আমি অন্যমনস্কভাবে তোতলাচ্ছি, 'ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।' আমি টলতে টলতে ওখান থেকে চলে এলাম।

যদি খাবার মতো একটা রুটি পাওয়া যেত; ওই ছোট ছোট বাদামি রং-এর সুস্বাদু রুটিগুলো, যেগুলো পথ চলতে চলতে খেতে খেতে যাওয়া যায়। যেতে যেতে খালি এই কথাই ভাবছি, কোন্ বাদামি রুটিগুলো চিবোতে দারুণ ভালো লাগবে। এদিকে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মরে যেতে, কবরে যেতে ইচ্ছে করছে, এত ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছি, কাঁদছি।

আমার দুর্দশার শেষ নেই। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ফুটপাথে পা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করে অভিশাপ দিতে লাগলাম। আমাকে কী বলে ডাকল? একটা 'গাণ্ডু'? দাঁড়া, আমাকে 'গাণ্ডু' বলার মজা দেখাচ্ছি। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে দৌড় লাগালাম। রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দৌড়তে দৌড়তে আমি হোঁচট খেলাম, রাস্তায় পড়ে গেলাম, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু যতক্ষণে রেলস্টেশনে পৌঁছলাম, আমার শরীরে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, জেটি পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা যাবার সামর্থ্যই নেই। তাছাড়া ততক্ষণে, দৌড়ে দৌড়ে আমার রাগও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত থেমে পড়লাম আর হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগলাম। একটা পুলিশম্যান কি বলল, না বলল, সেটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার, তাই নয় কি? হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু সব কিছু তো সহ্য করা যায় না। আমি আবার নিজেকে নিজেই বাধা দিলাম, আরে ও ব্যাটা আর এর চেয়ে ভালো কী বলতে পারে। এই যুক্তিটা আমার বেশ পছন্দ হল। আমি বার দুয়েক নিজেকেই শোনালাম, 'ও ব্যাটা এর চেয়ে ভালো আর কী বলতে পারে,' তারপর আবার ফিরে চললাম।

'হা ঈশ্বর!' আমি রাগের চোটে বিড়বিড় করছি, 'কী বুদ্ধিই যে মাথায় চাপে! এই অন্ধকার রাত্রে জলে ভেজা রাস্তা ধরে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়ানো!'

আমার খিদে কিন্তু এখন আমাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়ে পীড়ন করছে, আমাকে বিশ্রামও করতে দিচ্ছে না। আমি বারবার নিজের থুতু গিলে পেটকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি, মনে হচ্ছে, কাজ হচ্ছে।

এই বারের আগেও অনেক সপ্তাহ ধরেই না খেতে পাওয়ার জ্বালা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, আর ইদানীং আমার গায়ের শক্তি ভীষণভাবে কমে গেছে। যখন কোনো কাজ করে বা লিখে ভাগ্যের জোরে পাঁচ শিলিং জোগাড় করতে পেরেছি, তখন সেটা অনেক কষ্ট করেও দুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। আমার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কোনো সুযোগই না দিয়ে আবার আমাকে নতুন করে উপোসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ফলে আবার আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। আমার পিঠ আর কাঁধ আমাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। বুকের ভেতর যে কামড়টা টের পাই, সেটা জোরে কাশলে বা হাঁটার সময় সামনে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে হাঁটলে কিছুটা থামাতে পারি, কিন্তু পিঠের আর কাঁধের ব্যথার কোনো উপশমই করতে

পারছি না। কী কারণে আমার অবস্থা ভালো হচ্ছে না? আর সকলের মতো আমারও কি বেঁচে থাকার অধিকার নেই? যেমন বই বিক্রেতা পাশা কিংবা স্টীম এজেন্ট হেলেকেন? আমার কি দৈত্যের মতো দুই কাঁধ এবং কাজ করার মতো দুই সবল হাত ছিল না? আর আমি কি সত্যি সত্যিই আমার রুজি রোজগারের জন্য মলেরগাডেন-এ কাঠ কাটার চাকরির জন্য দরখাস্ত করিনি? আমি কি একজন কৃপণের মতো দিন গুজরান করিনি, যখন হাতে প্রচুর পয়সা, তখন দুধ রুটি খেয়েছি, যখন কম পয়সা, তখন শুধু রুটি খেয়েছি, আর যখন হাতে কিছু নেই, তখন উপোস করেছি। আমি কি হোটেলে থেকেছি? আমি কি দোতলায় একগাদা ঘরে থেকেছি? আরে আমি তো এক কেটলি মিস্ত্রির কারখানার ওপর চিলেকোঠায় থাকি, এমনই সেই চিলেকোঠা, যেটা ঈশ্বর এবং মানুষ, উভয়েই গত শীতে পরিত্যাগ করেছে, কারণ ঘরের ভেতরে তুষার ঢুকে যেত। কাজেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, একটুও না।

আমি ঝুঁকে পড়ে জবুথবু হয়ে হেঁটে যাচ্ছি আর এইসব ভাবনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, আমার ভেতরে কোনো তিক্ততা, কোনো বিদ্বেষ, কোনো ঈর্ষার জ্বলুনি নেই।

একটা রঙের দোকানের সামনে থেমে, জানালা দিয়ে ভেতরে তাকালাম। দু'তিনটে কোটোর ওপরের লেবেলগুলো পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বড় বেশি অন্ধকার। আমার এই নতুন খেয়ালে, ওই টিনের কোটোগুলোর ওপর কী লেখা আছে পড়তে না পেরে আমার প্রচণ্ড উত্তেজনা ও রাগ হল, নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে আমি শেষ পর্যন্ত দোকানের জানালায় দুবার জোরে জোরে ধাক্কা মারলাম, তারপর চলতে লাগলাম।

রাস্তায় একজন পুলিশম্যানকে দেখতে পেলাম। আমি দ্রুত পা চালিয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আর কোনো রকম প্ররোচনা ছাড়াই বললাম, 'এখন রাত দশটা বাজে।'

'না, এখন রাত দুটো,' ও বিস্মিতভাবে জবাব দিল।

'না, এখন রাত দশটা,' আমি নাছোড়বান্দা, 'রাত দশটা!' আর রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে ওর দিকে আরো এক-দুপা এগিয়ে গিয়ে ওর নাকের ওপর মুঠো বাগিয়ে বললাম, 'শুনুন, আপনি জানেন না, এখন রাত দশটা।'

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, আমার চেহারাটা জরিপ করল, খানিকটা হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল, শেষ পর্যন্ত খুব ভদ্রভাবে বলল, 'যাই হোক না কেন, এখন কিন্তু আপনার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। আপনি কি চান, আমি আপনার সঙ্গে কিছুটা পথ হেঁটে যাই?'

লোকটির এরকম অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমি একদম অভিভূত হয়ে গেলাম। বুঝতে পারছি, আমার চোখে জল এসে গেছে, আর তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, ধন্যবাদ! কাফেতে বসেছিলাম, বেশ দেরি হয়ে গেছে উঠতে। যাই হোক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

আমি ঘুরে হাঁটতে শুরু করলাম, ও হেলমেটে হাত ছুঁইয়ে আমাকে সেলাম করল। ওর বন্ধুত্ব আমাকে বিচলিত করে তুলেছে, আমি একটু একটু কাঁদছি, কারণ ওকে দেবার মতো একটা ছোটখাটো মুদ্রাও আমার পকেটে নেই।

আমি থেমে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম, ও ধীরে ধীরে নিজের রাস্তায় হেঁটে চলেছে। ওকে যখন আর দেখা গেল না, আমি কপাল চাপড়ে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলাম।

আমার দারিদ্র্যের জন্য আমি নিজেকেই গাল দিতে লাগলাম, নিজেকে সব অশ্লীল নামে ডাকতে লাগলাম, খুব খারাপ খারাপ খিস্তি করতে লাগলাম নিজেকে। বাড়ির কাছাকাছি আসা পর্যন্ত আমি এই সব চালিয়ে গেলাম। দরজার কাছে এসে আমি আবিষ্কার করলাম যে, চাবির গোছাটা কোথাও হারিয়ে ফেলেছি।

'হ্যাঁ, এতো হতেই হবে,' আমি নিজেকেই বললাম, 'আমি কেন চাবি হারাব না? এইখানে, এই উঠোনে আমি থাকি, আমার নিচে আছে একটা আস্তাবল আর ওপরে আছে একটা কেটলি মিস্ত্রির কারখানা। রাত্রে দরজা তালা দেওয়া থাকে, আর কেউই এই দরজা খুলতে পারে না; কাজেই, আমি চাবি হারাবো না?

'একটা কুকুরের মতো ভিজে গেছি, একটু খিদে পেয়েছে, একটু বেশিই খিদে পেয়েছে, আর অল্প একটু, মানে, যথেষ্ট ক্লান্ত আমার দুটো হাঁটু; কাজেই আমি কেন চাবি হারাব না?' আমি আপন মনে হেসে উঠলাম, খিদেয় এবং ক্লান্তিতে আমার মন কঠিন হয়ে গেছে।

আস্তাবলে ঘোড়াগুলো পা ঠুকছে শুনতে পাচ্ছি আর ওপরে আমার ঘরের জানালাটাও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দরজাও খুলতে পারছি না, ভেতরেও ঢুকতে পারছি না।

আবার বৃষ্টি শুরু হল, আমার দুই কাঁধ ভিজে যাচ্ছে। টাউন হল পর্যন্ত এসে মাথায় একটা মতলব এল। পুলিশম্যানটাকে আমার বাড়ির দরজাটা খুলতে বলব। আমি একজন কনস্টেবলকে দেখতে পেয়েই ওকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলাম যেন আমার সঙ্গে আসে আর যদি পারে আমাকে যেন ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে।

হ্যাঁ, যদি পারে! কিন্তু ও পারবে না, কারণ ওর কাছে কোনো চাবি নেই। পুলিশের চাবিগুলো ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে রাখা থাকে।

তাহলে আমি এখন কী করব?

কেন, আমি একটা হেটেলে গিয়ে বিছানা পেতে পারি!

কিন্তু আমি তো সত্যিই কোনো হোটেলে গিয়ে বিছানা পেতে পারি না, কারণ আমার কাছে একদম টাকা পয়সা নেই। আমি একটা কাফেতে গিয়েছিলাম ... ও জানে...।

আমরা খানিকক্ষণ টাউন হলের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। ও আমার চেহারাটা ভালো করে নিরীক্ষণ করল। বাইরে অঝোরধারে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি তাহলে গার্ড হাউসে গিয়ে নিজেকে গৃহহীন বলে জানান,' ও বলল।

গৃহহীন? আমি তো এটা ভাবিনি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বটেই তো। দুর্দান্ত মতলব!

আমি ওকে ধন্যবাদ জানালাম। আমি কি সোজা গিয়ে নিজেকে গৃহহীন বলতে পারি?

'ঠিক তাই।'...

'আপনার নাম?' গার্ড জিজ্ঞেস করল।

'ট্যানজেন– আঁদ্রে ট্যানজেন!'

জানি না কেন মিথ্যা বললাম; আমার চিন্তাগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাকে নানা রকম উল্টোপাল্টা মতলব জোগাচ্ছে। এই অপ্রচলিত নামটা এই মুহূর্তেই মাথায় এল আর আমি কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম। কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আমি মিথ্যা কথা বললাম।

'পেশা?'

এই প্রশ্নটা আমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল। পেশা! আমার পেশা কী? প্রথমে ভাবলাম নিজেকে কেটলি মিস্ত্রি বানিয়ে দিই, কিন্তু সাহস হল না। কারণ প্রথমত আমি এমন একটা নাম বলেছি, যেটা কোনো কেটলি মিস্ত্রির প্রচলিত নাম নয়, হতেই পারে না! দ্বিতীয়ত আমি প্যাঁসনেই চশমা পরে আছি। হঠাৎ মাথায় মতলব এল, একটু হঠকারিতা করা যাক। আমি এক পা এগিয়ে এসে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে গম্ভীরভাবে বললাম, 'একজন সাংবাদিক।'

গার্ড একটু চমকে উঠল, তারপর লিখে নিল, আমি ততক্ষণ একটা বাধার সামনে দাঁড়ানো গৃহহীন কেবিনেট মন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছি। গার্ডের কোনো সন্দেহই হল না। ও বুঝতে পারল, উত্তরটা দেবার আগে কেন আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। রাতের গার্ড হাউসে মাথার ওপরে ছাদবিহীন একজন সাংবাদিককে দেখলে কেমন লাগে?'

'কোন কাগজে আছেন, হের ট্যানজেন?'

'মর্গেনব্লাডেট!' আমি বললাম। 'আজ রাত্রে একটু বেশিক্ষণই বাইরে ছিলাম, লজ্জার কথা।'

'ও! ওকথা আমরা লিখব না।' ও বলে উঠল, মুখে একটু হাসি, 'যখন অল্প বয়েসিরা বাইরে বেরোয়.... আমরা বুঝি!'

ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার করে একজন পুলিশকে ডেকে বলল, 'ভদ্রলোককে সংরক্ষিত এলাকায় নিয়ে যাও। শুভরাত্রি।'

নিজের এই বেপরোয়া দুঃসাহসে আমার পিঠ বেয়ে যেন বরফের স্রোত নেমে যাচ্ছে বলে মনে হল। নিজেকে একটু শক্ত রাখতে আমি দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করলাম। যদি এই মর্গেনব্লাডেট পত্রিকার নামটা না টেনে আনতাম। আমি জানি, সম্পাদক ফ্রিয়েল ইচ্ছে করলে আমাকে ওর দাঁত দেখাতে পারে আর তালাতে যখন চাবিটা ঘোরাল, তখন সেই শব্দে আমার ঠিক এই কথাটাই মনে পড়ল।

'গ্যাস কিন্তু আর মাত্র দশমিনিট জ্বলবে,' পুলিশটা দরজায় দাঁড়িয়ে মন্তব্য করল।

'তারপরে কি গ্যাস নিভে যাবে?'

'হ্যাঁ, তারপরে গ্যাস নিভে যাবে।'

বিছানায় বসে আমি তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনলাম। উজ্জ্বল ছোট ঘরটায় বেশ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া আছে। বেশ ভালো আশ্রয় পেয়ে আমার আরামবোধ হল। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে ভালো লাগছিল, এই রকম একটা আরামদায়ক ছোট্ট ঘরের চেয়ে ভালো কিছু কি আমি আশা করতে পারতাম? আমি এখন পরিপূর্ণ তৃপ্ত। টুপিটা হাতে নিয়ে বিছানায় বসে দেয়ালের গ্যাসের বাতির ওপর চোখ রেখে আমি ওই পুলিশম্যানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পুরো ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম। এই প্রথম বার, আর কীভাবে আমি ওকে বোকা বানালাম। 'সাংবাদিক! ট্যানজেন! আর তারপর মর্গেনব্লাডেট!' এই মর্গেনব্লাডেট শব্দটা ব্যবহার করে আমি কি সরাসরি ওর হৃদয়ের কাছে পৌঁছাইনি? 'ওকথা আমরা লিখব না। এ:? রাত দুটো পর্যন্ত স্টিফ্‌ট্ গার্ডেনে রাজকীয় সম্মানে বসেছিলেন; দরজার চাবিটা ভুলে গেছেন আর বাড়িতে পকেট বইটা রয়ে গেছে, তার মধ্যে এক হাজার ক্রোনার রয়েছে। ভদ্রলোককে সংরক্ষিত এলাকায় নিয়ে যাও!'

হঠাৎ করে গ্যাসটা নিভে গেল, একটু কমলও না বা দপদপ করল না।

আমি একেবারে ঘন অন্ধকারে বসে রইলাম; নিজের হাত দেখতে পাচ্ছি না, সাদা দেওয়ালটাও না, কিছু না। শুয়ে পড়া ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই, কাজেই আমি পোশাক খুলে ফেললাম।

কিন্তু ঘুম হয়নি বলে তো আমি ক্লান্ত হইনি, কাজেই ঘুম আর আসছে না। আমি অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে আছি, এই ঘন অন্ধকারের চাপটার কোনো তল নেই, আমার ভাবনা এই বিষণ্ন অন্ধকারের তল খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্ধকারটা যেন অস্বাভাবিক ঘন, এটা আমাকে পীড়ন করতে লাগল। আমি চোখ বুজে গান গাইতে লাগলাম আর নিজেকে অন্যমনস্ক করবার জন্য খালি এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম, কিন্তু কিছু হল না। অন্ধকারটা আমার চিন্তাভাবনাকেও গ্রাস করে নিয়েছে আর আমাকে এক মুহূর্তও শান্তি দিচ্ছে না। আচ্ছা আমি যদি এই অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাই, এক হয়ে যাই?

আমি বিছানায় উঠে বসে, দু হাত ছুঁড়লাম। আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, আমার স্নায়বিক দৌর্বল্য আমাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমি বসে আছি, উদ্ভট কল্পনারাজ্যে, নিজের গলার গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনছি আর নিজেকে চুপ করানোর চেষ্টার পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে একাকার হচ্ছি। আমি অন্ধকারের ভেতর উঁকি মারলাম, জীবনে কোনোদিন কখনো এ রকম অন্ধকার দেখিনি। কোনো সন্দেহ নেই, এখানে একটা অদ্ভুত রকমের অন্ধকারের সন্ধান পেলাম, যার প্রতি আগে কোনো লোক মনোযোগ দেয়নি। যত উদ্ভট, হাস্যকর চিন্তা আমায় ছেয়ে ফেলল আর আমি এই সব কিছুতে খুব ভয় পেলাম।

বিছানার মাথার দিকে দেওয়ালে একটা ছোট গর্ত, পেরেকের গর্ত, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গর্তটা দেখতে পেয়ে আমি ওটা হাত দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, গর্তটার ভেতর ফুঁ দিলাম, ওটার গভীরতা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। গর্তটা মোটেই একটা নির্দোষ গর্ত নয়। এটা একটা জটিল, রহস্যময় গর্ত, এটার বিরুদ্ধে সাবধান হতে হবে! গর্তটার কথা ভাবতে ভাবতে কৌতূহলে এবং ভয়ে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম আর আমার সেই অর্ধেক পেন্সিল-কাটা ছুরিটা হাতে নিয়ে গর্তটার গভীরতা মাপার চিন্তা করলাম, যাতে নিজেকে বোঝাতে পারি যে, গর্তটা দেওয়ালের অপর দিক পর্যন্ত যায়নি।

আরেকবার শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু আসলে অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই-এর চেষ্টা। বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, আর কোনো শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। আমি অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় কোনো পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম, আর যতক্ষণ না একজন পথচারীর পায়ের শব্দ পেলাম ততক্ষণ মনে শান্তি ছিল না। শব্দটা শুনে মনে হল, একজন কনস্টেবলের পায়ের শব্দ। হঠাৎ আমি বারবার আঙুল মটকে হাসতে লাগলাম, 'এই ঠিক হয়েছে, হাঃ হাঃ!' ভাবলাম, একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করেছি। বিছানায় উঠে বসে বললাম, 'আমাদের ভাষাতে এই শব্দটা নেই, আমিই এটা আবিষ্কার করলাম, 'কুবোয়া'। এতেও অক্ষর আছে, একটা শব্দে যেমন থাকে। সদাশয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ছোকরা তুমি একটা শব্দ আবিষ্কার করেছ... 'কুবোয়া'... কথাটা কী গভীর অর্থপূর্ণ।'

আমি দু'চোখ খুলে বসে আছি, নিজের আবিষ্কারে নিজেই অবাক, আনন্দে হাসছি। তারপর আমি ফিসফিস করে বলতে শুরু করলাম, কেউ গুপ্তচরগিরি করতে পারে, আমার এই আবিষ্কারকে গোপন রাখতে হবে। আমি একটা আনন্দময়, সাময়িক উন্মাদনাগ্রস্ত খিদের ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমার ভেতরটা একদম ফাঁকা, কোনো ব্যথা যন্ত্রণা নেই, আর আমার ভাবনার রাশ আলগা করে দিলাম।

খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা শুরু করলাম। আমার ভাবনা-শৃঙ্খলে টান মেরে মেরে আমি আমার তৈরি করা এই নতুন শব্দটার একটা অর্থবহ ব্যাখ্যা খুঁজলাম। এই কথাটার অর্থ ঈশ্বর বা টিভোলি* হতে পারে না। আর এটার অর্থ গো-প্রদর্শনী কে বলল? আমি মুঠো পাকিয়ে আবার বললাম, 'কে বলল এর মানে গো-প্রদর্শনী?' না; ভেবে দেখতে গেলে এর মানে তালা, অথবা সূর্যোদয়, এর কোনোটাই হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই রকম একটা শব্দের মানে খুঁজে পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। অপেক্ষা করে দেখাই যাক। ইতিমধ্যে এই শব্দটা মাথায় নিয়ে ঘুমোতে হবে।

আমি ওই রোগীর বিছানায় শুয়ে চতুরের মতো হাসতে লাগলাম, কিন্তু কিছু বললাম না, কোনো মতামতও দিলাম না। কয়েক মিনিট পার হল, আমি নার্ভাস হয়ে পড়লাম; এই নতুন শব্দটা আমাকে ক্রমাগত উৎপীড়ন করে চলেছে, বার বার ঘুরে ফিরে আসছে, আমার ভাবনায় ঢুকে যাচ্ছে আর আমাকে গম্ভীর করে তুলছে। এই

---

* বিভিন্ন ধরনের নাটমঞ্চ ইত্যাদি এবং ক্রিশ্চিয়ানার একটা উদ্যান।

শব্দটার অর্থ কী হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমি সুস্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছি, কিন্তু অর্থ কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।

'ওটা খুব বিশদে ভাবার বিষয়,' আমি স্বগতোক্তি করলাম, এবং নিজের হাত দুটো জড়াজড়ি করে আবার বললাম, 'খুবই বিশদে ভাবার বিষয়।' শব্দটা যে পাওয়া গেছে, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর এটাই হচ্ছে আসল জিনিস। কিন্তু মাথার ভেতর একটার পর একটা চিন্তা এসে আমাকে ঘুমোতেই দিল না। এই অত্যন্ত বিরল শব্দটির জন্য কোনো কিছুই যেন যথেষ্ট নয়। শেষকালে আমি বিছানায় উঠে বসে, দুই হাতে মাথা চেপে বলে উঠলাম, 'না! এটা ঠিক যে কথাটার অর্থ বিদেশগমন বা তামাক কারখানা হওয়া অসম্ভব। যদি এটার অর্থ এই রকম কিছু একটা হত, তাহলে আমি অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতাম, ফলাফলের চিন্তা না করেই।' না; আসলে শব্দটা মনে হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাপার, কোনো উপলব্ধি, কোনো মানসিক অবস্থা। এটা কেন ঠিক ধরতে পারছি না? এবং আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম, যাতে কোনো মনস্তত্ত্বের ব্যাপার বোঝানো যায়। এই সময় আমার মনে হল, কেউ যেন আমার যুক্তিতর্ককে বিঘ্নিত করছে, নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। আমি রেগে জবাব দিলাম, 'মাপ করবেন, আপনার মতো মূর্খ আর দ্বিতীয়টি নেই। না মশাই! বুন্‌বার সুতা? হাঃ, নরকে যান মশাই!' মানে, সত্যিই আমাকে হাসতে হল। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন এর অর্থ বুন্‌বার সুতা, এই কথাটা আমাকে মেনে নিতে হবে, যখন আমার এই বুনবার সুতা কথাটা দারুণ অপছন্দ? কথাটা আমিই আবিষ্কার করেছি, কাজেই কথাটার অর্থ আমার পছন্দমতো কিছু একটা হবে, এটা আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমার ধারণা, আমি এখনও এটার সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করিনি...

কিন্তু আমার মাথাটা ক্রমাগত গুলিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, জলের কলটা খুঁজতে লাগলাম। আমার তেষ্টা পায়নি। কিন্তু আমার মাথাটা মনে হয় জ্বরে গরম হয়ে গেছে আর আমার খুব জল খাবার ইচ্ছা হল। খানিকটা জল খাবার পর আবার বিছানায় এলাম আর এবারে ঠিক ঘুমিয়ে পড়ব বলে মনস্থির করলাম। আমি চোখ বন্ধ করে একদম চুপচাপ শুয়ে রইলাম। এইভাবে নড়াচড়া না করে কয়েক মিনিট কেটে গেল। আমার ঘাম হতে লাগল আর মনে হল শিরার মধ্যে দিয়ে রক্ত লাফিয়ে লাফিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। না, ও যে সেই কাগজের ঠোঙাটার মধ্যে টাকা পাওয়া যাবে ভেবেছিল, সেটা খুব মজার ব্যাপার ছিল! ও কেবল একবার কেশেছিল। এখনও কি রাস্তা ধরে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক হেঁটে চলেছে? আমার বেঞ্চিটাতে বসে আছে? মুক্তোর মতো নীল্‌চে সমুদ্র... জাহাজগুলো...

চোখ খুললাম; কি করে চোখ বন্ধ রাখব, যদি ঘুমই না আসে? সেই একই অন্ধকার আমার ওপর চেপে বসে আছে; সেই একই অতল কালো অসীম অন্ধকার, যার সঙ্গে আমার মানসিক লড়াই চলছে, কিন্তু যাকে আমি ভেদ করতে পারছি না। এই অন্ধকারকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় এমন একটা কালো শব্দ আমি প্রচণ্ড

চেষ্টা করে খুঁজতে চাইছি, শব্দটা এত ভয়ানক কালো হবে যে, ওটা উচ্চারণ করতে গেলে আমার ঠোঁট দুটোও কালো হয়ে যাবে। ভগবান, কি মিশমিশে কালো এই অন্ধকার। আবার আমার চিন্তা আমাকে বয়ে নিয়ে গেল সমুদ্রের কাছে, যেখানে কালো দৈত্যগুলো আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ওরা আমাকে ওদের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, আমাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরবে, তারপর আমাকে ডাঙা আর সমুদ্রের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে এমন অন্ধকার জগতের মধ্যে দিয়ে, যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। আমার মনে হল আমি জাহাজের ওপরে আছি, জলের ওপর দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারপাশে মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি ডুবছি, ডুবছি-।

আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, বিছানাটা জোরে চেপে ধরলাম, আমি এমন একটা বিপজ্জনক যাত্রা করেছিলাম, একটা বজ্রের মতো মহাশূন্য ভেদ করে তীব্রগতিতে ছুটে যাচ্ছিলাম। ওঃ, আমার হাতটা বিছানার কাঠের ফ্রেমে ঠেকতে আমার মনে হল, রক্ষা পেলাম। 'এইভাবেই মানুষের মৃত্যু হয়।' আমি নিজের মনে বললাম, 'এইবার তুমি মরবে।' আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম যে, আরেকটু হলে আমার মৃত্যু হত।

তারপর বিছানায় উঠে বসে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শব্দটা যদি আমি পেয়ে থাকি, তাহলে এটার অর্থ কী হবে, সেটা ঠিক করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে আমারই, নয় কি?' আমি শুনতে পাচ্ছি যে আমি উন্মত্তের মতো প্রলাপ বকছি। নিজেই কথা বলছি, নিজেই শুনছি। এই যে পাগলের মতো প্রলাপ বকছি, এটা আমার দুর্বলতা এবং শুয়ে থাকার ফলেই হয়েছে, কারণ আমার জ্ঞান তো আমি হারাইনি! হঠাৎ-ই আমার মাথায় এই চিন্তাটা এসে গেল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয়ের চোটে আমি বিছানা ছেড়ে আবার লাফিয়ে উঠলাম, টলতে টলতে দরজা পর্যন্ত এলাম, তারপরে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলাম। বার দুয়েক দরজাটার ওপর শরীর ফেলে ধাক্কা দিলাম, দেওয়ালে মাথা ঠুকলাম, জোরে জোরে কাঁদতে লাগলাম, আঙুল কামড়ালাম, অভিশাপ দিলাম...

সব চুপচাপ, নিঃশব্দ। কেবল আমার নিজেরই কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি ঘরের মেঝেয় পড়ে আছি, উঠবার, হাঁটবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

শুয়ে শুয়ে চোখ পড়ল, দেয়ালে, অনেক ওপরদিকে, আমার চোখের সোজাসুজি একটা ধূসর রঙ-এর চারকোণা জায়গা, একটু সাদা মতো, মনে হল এটা নিশ্চয়ই দিনের আলো। আমার মন বলল, আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে অনুভব করলাম, এটা দিনের আলো। ওঃ, কী আনন্দেই না মুক্তির শ্বাস নিলাম! আমি ঘরের মেঝেয় সটান উপুড় হয়ে শুয়ে এই অনির্বচনীয় আলোর ইশারা পেয়ে আনন্দে কাঁদতে লাগলাম, কৃতজ্ঞতায় ফোঁপাতে লাগলাম, জানালার দিকে একটি চুম্বন ছুড়ে দিলাম আর একদম পাগলের মতো আচরণ করতে লাগলাম। এবং এই যে আমি

এই সব করছি, সে ব্যাপারে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন। আমার সব বিষণ্ণতা উবে গেছে, সব হতাশা, সব যন্ত্রণা থেমে গেছে এবং এই মুহূর্তে আমার বিবেক বলছে যে, আমার কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ নেই। আমি মেঝেতে উঠে বসলাম, দু হাত জোড় করে ধৈর্য ধরে ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ওরা এত আওয়াজ কিছুই শুনতে পায়নি! অবশ্য আমি তো সংরক্ষিত এলাকায় রয়েছি, সাধারণ বন্দিদের অনেক ওপরে। বলতে হয়, একজন গৃহহীন ক্যাবিনেট মন্ত্রী।

দেওয়ালের ঐ ধীরে ধীরে স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে আসা চারকোনা জায়গাটার দিকে চোখ রেখে আমি বেশ রসিয়ে রসিয়ে কেবিনেট মন্ত্রীর অভিনয় করে মজা পাচ্ছিলাম। আমি ভন ট্যানজেন, বেশ সরকারি লাল-ফিতে-সুলভ বাচনভঙ্গিতে ভাষণ দিচ্ছিলাম। আমার অবাস্তব কল্পনা কিন্তু বন্ধ হয়নি, যদিও আমি এখন আর অত নার্ভাস নই। যদি বাড়িতে পকেট বইটা ফেলে আসার মতো বোকামিটা না করতাম। তাহলে আমি কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিছানায় শুতে নিয়ে যাবার সম্মান লাভ করতাম না? এই সব ভেবে, খুব গম্ভীরভাবে আদব-কায়দা সহকারে আমি আবার ওই রোগীর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ততক্ষণে এতটা আলো হয়ে গেছে যে, আমি এই ছোট্ট ঘরটার ভেতরটা কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। একটু একটু করে দরজার হাতলটাও দৃশ্যমান হল। এতে আমার মনটা ঘুরে গেল। যে অন্ধকারের একঘেয়েমি তার বিরক্তিকর অভেদ্যতা নিয়ে আমার নিজেকে পর্যন্ত দেখতে দিচ্ছিল না, সেটা ভেঙে গেল। আমার রক্ত প্রবাহ ধীর হয়ে এল, একটু পরেই আমার চোখ বুঁজে এল। দরজায় ধাক্কার শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। আমি তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে পোশাক পরে নিলাম। পোশাক গতকাল রাতে যে ভিজে গিয়েছিল, সেই রকমই ভিজে।

'আপনি নিচে এসে কর্তব্যরত অফিসারের কাছে হাজিরা দেবেন,' কনস্টেবলটা বলল।

তাহলে কি আরো নিয়ম-কানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে? আমি ভয়ে ভয়ে ভাবলাম।

নিচে নেমে এসে একটা বড় ঘরে ঢুকলাম, সেখানে আরো ত্রিশ-চল্লিশজন লোক বসে আছে, সব গৃহহীন। একজন কেরানি ওদের এক এক করে ডাকল, আর প্রত্যেককে একটা করে প্রাতরাশ-এর টিকিট দিল। কর্তব্যরত অফিসারটি তার পাশে দাঁড়ানো পুলিশকে বারবার জিজ্ঞেস করছে, 'টিকিট পেয়েছে তো? ওদের টিকিট দিতে যেন ভুল না হয়। ওদের দেখেই মনে হচ্ছে, ওদের খিদে পেয়েছে।'

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের টিকিট নেওয়া দেখলাম আর ইচ্ছা হল, আমিও যেন একটা টিকিট পাই।'

'আঁদ্রে ট্যানজেন, সাংবাদিক।'

আমি এগিয়ে এসে, ঝুঁকে নমস্কার করলাম।

'কিন্তু আপনি এখানে কি করে এলেন?'

আমি কাল রাতের মতোই পুরো ব্যাপারটা বললাম, একবারও চোখের পাতা না ফেলে মিথ্যা বলে গেলাম, একেবারে স্পষ্ট মিথ্যাকথা, বেশি রাত হয়ে গেছিল, কাফেতে, কপাল মন্দ, দরজার চাবিটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ও মুখে হাসি মাখিয়ে বলল, 'তাই বটে! তা রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আরে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মতোই ঘুমিয়েছি, বুঝলেন?'

'শুনে খুশি হলাম,' ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সুপ্রভাত।'

আমি বেরিয়ে এলাম।

একটা টিকিট! আমার জন্যও একটা টিকিট! গত তিনটে লম্বা দিন ও লম্বা রাত্রি আমি কিছুই খাইনি। একটা পাঁউরুটি। কিন্তু কেউ আমাকে একটা টিকিট দিল না, আমারও চাইবার সাহস হল না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওদের সন্দেহ হত। ওরা তখন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাত আর আবিষ্কার করে ফেলত আমার আসল পরিচয়। এবং তখন আমাকে মিথ্যা পরিচয় দেবার অপরাধে গ্রেফতার করত। অতএব মাথা উঁচু করে, একজন কোটিপতির মতো ভঙ্গিমায় কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি গার্ড হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম।

এত সকালেও সূর্যের আলো গরম ছড়াচ্ছে। দশটা বাজে, ইয়ংস মার্কেটে লোক চলাচলের ব্যস্ততা। কোন পথটা ধরব? পকেটে হাত দিয়ে পাণ্ডুলিপিটা দেখে নিলাম। এগারোটার সময় সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিছুক্ষণ সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে পথচারীদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করলাম। ইতিমধ্যে আমার কাপড়চোপড় থেকে বাষ্প বেরোতে শুরু করেছে। খিদেটা নতুন করে জানান দিল, বুকে পেটে কামড় বসাল, চেপে ধরল আর ছোট ছোট ধারালো তীক্ষ্ণ খোঁচা মারতে লাগল, আমি যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলাম।

আমার কোনো বন্ধু নেই, কোনো পরিচিত লোক, যার কাছে আবেদন করতে পারি? আমি আমার স্মৃতি হাতড়াতে লাগলাম, যদি এমন কোনো লোকের সন্ধান পাই, যার কাছ থেকে অন্তত এক পেনিও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তেমন কোনো লোকের খোঁজ পেলাম না।

যাই হোক, আজকের দিনটা বড় সুন্দর! ঝকঝকে সূর্যালোক আর উষ্ণতা আমাকে ঘিরে ধরল। আকাশটা লিয়ের পবর্তমালার ওপর একটা সুন্দর সমুদ্রের মতো বিছিয়ে আছে। বুঝতে পারিনি, আমি বাড়ির পথেই হাঁটা দিয়েছি। খিদের প্রচণ্ড জ্বালা অস্থির করে তুলছে। রাস্তায় একটুকরো কাঠ কুড়িয়ে পেলাম, ওটাই চিবুতে লাগলাম: একটু শান্তি হল। আগে কেন এটা ভাবিনি! বাড়ির দরজাটা খোলা, আস্তাবলের ছোকরাটা যথারীতি আমাকে সুপ্রভাত জানাল।

'সুন্দর আবহাওয়া' ও বলল।

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম। এর বেশি আর কিছু বলতে পারলাম না। আচ্ছা, ওর কাছে কি এক শিলিং ধার চাইব? ও যদি পারে তো নিশ্চয়ই দেবে। তাছাড়া একবার আমি ওর একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু একটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল, তারপর বলেই ফেলল, 'সুন্দর আবহাওয়া! হেঁ হেঁ, আমার বাড়িওয়ালিকে আজই টাকা দিতে হবে। আপনি কি দয়া করে আমাকে পাঁচ শিলিং ধার দেবেন? কয়েকদিনের জন্য, স্যার। এর আগেও আপনি একবার আমার উপকার করেছেন।'

'না হে, জেনস ওল্যাজ, আমি সত্যিই পারব না,' আমি বললাম, 'অন্তত এক্ষুনি নয়, পরে, হয়তো বিকেল বেলা।' আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আমার ঘরে উঠে এলাম।

বিছানায় শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে হাসতে লাগলাম। খুব ভাগ্য ভালো যে ও আগেই আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। আমার আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রয়ে গেল। পাঁচ শিলিং! ছোকরা, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তুমি আমার কাছে ড্যাম্পকোক্কেন কোম্পানির পাঁচখানা শেয়ার কিংবা আকের অঞ্চলে একটা জমিদারি চাইতে পারতে।

এই পাঁচ শিলিং-এর চিন্তাটা আমাকে খুব হাসাচ্ছে। আমি একটা শয়তান, তাই না? পাঁচ শিলিং! আমার স্ফূর্তি বেড়ে গেল, আর আমি জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। অ্যাঃ, কোথাও রান্না হচ্ছে, তার গন্ধ এখানে এসে আমাকে ধাক্কা মারছে। কেউ রাতের খাবারের জন্য চপ রান্না করছে, তার বিরক্তকর কড়া গন্ধ নাকে আসছে, ছ্যাঃ। আমি জানালা খুললাম, এই পাশব গন্ধটা বেরিয়ে যাক। 'ওয়েটার, এক প্লেট মাংস দাও!' আমি ঘরের টেবিলটার দিকে ঘুরলাম, এটা সেই ভাঙা টেবিল, যেটাকে দুই হাঁটু দিয়ে ধরে আমি লেখালেখি করি, আর কেতাদুরস্ত অভিবাদন করে বললাম,

'আপনি কি এক গ্লাস ওয়াইন নেবেন? না? আমি ট্যানজেন-ক্যাবিনেট মন্ত্রী। আমি– খুব দুঃখজনক ব্যাপার- আমি বেশ রাত করেই বাইরে ছিলাম- দরজার চাবি।' আমার চিন্তাগুলো সব লাগামছাড়া হয়ে জটিল আবর্তে ঘুরতে লাগল। আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, আমি অনবরত বকবক করে যাচ্ছি, কিন্তু না শুনে বা না বুঝে কোনো কথাই উচ্চারণ করছি না। আমি স্বগতোক্তি করলাম, 'আবার তুমি অবিরাম বকবক করে যাচ্ছ' কিন্তু তবু নিজেকে থামাতে পারছি না। ঠিক যেন, কেউ জেগে আছে, অথচ ঘুমের মধ্যে কথা বলছে।

মাথাটা হালকা লাগছে, কোনো ব্যথা বা চাপ নেই, মেজাজটাও শরীফ। আমাকে কল্পনার রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আমি থামতে কোনো চেষ্টাই করছি না।

'এসো! হ্যাঁ, সোজা ভেতরে চলে এসো! ইয়ালাজালি, চেয়ে দেখ, সব কিছু চুনি দিয়ে তৈরি! ওই যে, রক্তলাল ফোলা ফোলা সিল্কের ডিভান! ও: কি আবেগময় ওর শ্বাস-প্রশ্বাস!

হে প্রিয়তমা, আমাকে চুম্বন কর, আরো, আরো! তোমার হাত দুটি যেন পীতাভ স্ফটিক, তোমার মুখে লজ্জার অরুণিমা... 'ওয়েটার, আমি এক প্লেট মাংস চেয়েছিলাম!'

জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে, নিচে ঘোড়াগুলো যবের দানা চিবোচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। আমি বসে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলাম, একটা বাচ্চা ছেলের মতো বুক ভরা আনন্দ।

সারাক্ষণ পাণ্ডুলিপিটা ঘাঁটছি। এটা আমার ভাবনায় নেই, কিন্তু মন বলছে, ওটা আছে, আমার রক্তের মধ্যে আছে এবং ওটা আমি বার করলাম।

পাণ্ডুলিপিটা ভিজে গেছে। ওটা রোদে শুকোতে দিলাম। তারপরে ঘরটার মধ্যেই এদিক থেকে ওদিক, পায়চারি করতে লাগলাম। সবকিছুই কি রকম বিষাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে! মেঝেটায় ছোট ছোট টিনের পাত লাগানো। বসবার মতো একটা চেয়ারও নেই। ফাঁকা দেওয়ালগুলোয় একটা পেরেক পর্যন্ত পোঁতা নেই। সব চলে গেছে আমার 'আংকল'-এর গহ্বরে। আমার যাবৎ সম্পত্তি হ'ল টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ধূলিধূসরিত কয়েক গোছা কাগজ; বিছানায় পড়ে থাকা পুরনো সবুজ কম্বলটা, কয়েক মাস আগে হ্যান্স পওলি আমাকে ধার দিয়েছিল...

হ্যান্স পওলি! আমি আঙুল মটকালাম। হ্যান্স পওলি পিটারসেন আমাকে সাহায্য করবে! ওর কাছে সঙ্গে সঙ্গে কেন যাইনি, এ নিয়ে ও নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে। আমি তাড়াতাড়ি মাথায় টুপিটা পরে পাণ্ডুলিপিটা পকেটে ভরে নিচে চলে এলাম।

'শোন, জেনস ওল্যাজ!' আমি আস্তাবলের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলাম, 'মনে হচ্ছে, বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু দিতে পারব।'

টাউন হলে পৌঁছে দেখলাম, এগারোটা বেজে গেছে। তক্ষুনি সম্পাদক-এর কাছে যাবার কথা ভাবলাম। অফিস-এর দরজার বাইরে একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম, পাতাগুলো পর পর সাজানো আছে কিনা, তারপর ওগুলো সযত্নে মুছে ফের পকেটে রেখে দরজায় ধাক্কা দিলাম। যখন ভেতরে ঢুকছি, তখন বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে।

'কাঁচি' যথারীতি নিজের জায়গায়। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় ওকে সম্পাদকের কথা জিজ্ঞেস করলাম। কোনো উত্তর নেই। লোকটা প্রাদেশিক কাগজগুলো থেকে ছোটো ছোটো খবরগুলো খুঁটিয়ে দেখছে।

আমি দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করে আরেকটু এগোলাম।

'সম্পাদক এখনও আসেননি!' অনেকক্ষণ পরে মুখ না তুলেই 'কাঁচি' বলল।

কখন উনি আসবেন?

'বলতে পারব না, একদম বলতে পারব না!'

অফিস কতক্ষণ খোলা থাকবে?

কোনো উত্তর পেলাম না, কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল। 'কাঁচি' এতক্ষণের ভেতর একবারও মুখ তুলে তাকায়নি; আমার গলা শুনেছে, আমাকে চিনেছে, তবু!

'তোমার এখানে এমন দুর্নাম,' আমি ভাবলাম, 'যে ও তোমার কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।' আচ্ছা, এটা কি সম্পাদকের হুকুমে হচ্ছে? অবশ্য

এ-ও সত্যি যে, আমার সেই নামকরা গল্পটা দশ শিলিং-এ মনোনীত হবার পর থেকে প্রায় প্রত্যেকদিনই আমি সম্পাদকের দপ্তরে অনেক অনুপযুক্ত লেখা নিয়ে বিরক্ত করেছি, যেগুলো সম্পাদক দেখে, পড়ে, আমাকে ফেরত দিয়েছেন। হয়তো উনি এই ব্যাপারগুলো কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করতে চান... আমি চুপচাপ হোমাণ্ডস্‌বিয়েন-এর রাস্তা ধরলাম।

হ্যান্স পওলি পিটারসেন এক খামার চাষির ছেলে, একজন ছাত্র, একটা পাঁচতলা বাড়ির ছাদের ঘরে থাকে; কাজেই হ্যান্স পওলি পিটারসেন একজন গরিব মানুষ। কিন্তু ওর কাছে যদি এক শিলিং থাকে, ও সেটা দিতে কার্পণ্য করবে না। একেবারে নিশ্চিতভাবে আমি সেটা পেয়ে যাব। মানে, ইতিমধ্যেই যেন সেটা আমার হাতে এসে গেছে। আর আমি এই শিলিং-এর কথা সারাক্ষণ ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলাম এবং মনে আনন্দ এসে গেল যে আমি নিশ্চয়ই ওটা পাব।

যখন আমি ওই বাড়ির দরজায় পৌঁছলাম, তখন দরজাটা বন্ধ এবং আমি ঘণ্টি বাজালাম।

'আমি ছাত্র পিটারসেন-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আমি বললাম এবং ভেতরে ঢোকবার মুখে বললাম, 'আমি ওর ঘর চিনি।'

'ছাত্র পিটারসেন, যে ছাদের ওপরের ঘরে থাকত?' মেয়েটা বলল, 'ও তো চলে গেছে এখান থেকে।'

মেয়েটা ওর বর্তমান ঠিকানাও জানে না, তবে ও নাকি বলে গেছে ওর নামে চিঠিপত্র এলে, সেগুলো টোল্‌বড্‌গাডেন-এ হারমেনসেন-এর কাছে পাঠিয়ে দিতে, আর মেয়েটা তার নম্বরটাও আমায় দিল।

আমি অনেক বিশ্বাস আর আশা নিয়ে টোল্‌বড্‌গাডেন পর্যন্ত পুরো রাস্তা হেঁটে গেলাম। যাতে হ্যান্স পওলির ঠিকানাটা পেতে পারি। এটাই আমার শেষ সুযোগ আর এটাকে কাজে লাগাতেই হবে। পথে একটা নতুন তৈরি বাড়ি চোখে পড়ল, দুজন ছুতোর মিস্ত্রি র‍্যাঁদা চালাচ্ছে। পাশের কাঠের কুচির গাদা থেকে কয়েকটা সাটিনের মতো মসৃণ কাঠের কুচি তুলে নিলাম, একটা মুখে পুরলাম আর কয়েকটা ভবিষ্যতের জন্য পকেটে রেখে দিয়ে চলতে লাগলাম।

খিদের চোটে কাতরাচ্ছি। একটা রুটির দোকানে অবিশ্বাস্য রকমের বড় একটা এক পেনির রুটি দেখলাম, ঐ দামে বৃহত্তম রুটিটা পেতে পারতাম।

'ছাত্র পিটারসেনের ঠিকানাটা নেবার জন্য এসেছি।'

'বার্নট একার্‌স স্ট্রিট, ১০ নম্বর, ছাদের ঘর।' আমি কি ওখানে যাব? যদি যাই, তাহলে অনুগ্রহ করে ওর নামে আসা গোটা দুয়েক চিঠি নিয়ে যাব কি?

আবার শহরের ভেতর ঢুকলাম, একই রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি উল্টো দিকে, সেই ছুতোর মিস্ত্রি দুজনকে পার হয়ে যাচ্ছি, ওরা এখন দুই হাঁটুর মাঝখানে টিফিন কৌটো ধরে ড্যাম্পকোক্কেন থেকে আনা গরম ডিনার খাচ্ছে– রুটির দোকানটা পার হচ্ছি, সেই বড় রুটিটা এখনও নিজের জায়গায় আছে এবং শেষকালে বার্নট

একার্‌স স্ট্রিটে পৌঁছলাম, পরিশ্রমে, অবসাদে অর্ধমৃত। দরজা খোলা, ছাদের ঘর পর্যন্ত সমস্ত ক্লান্ত সিঁড়িগুলো ভাঙলাম। ঢোকবার মুহূর্তে হ্যান্স পওলিকে খোশ মেজাজে রাখবার জন্য পকেট থেকে ওর নামের চিঠিগুলো বের করে রাখলাম।

কী অবস্থায় আছি, সেটা বুঝিয়ে বললে ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করবে না; না, নিশ্চয়ই না; হ্যান্স পওলির হৃদয়টা অনেক বড়– আমি ওর সম্বন্ধে সব সময়ই এই কথাটা বলি... দরজায় ওর কার্ডটা সাঁটা আছে দেখলাম, লেখা আছে, 'এইচ পি পিটারসেন, ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্র, বাড়ি গেছে।'

আমি বসে পড়লাম, ব্যস্ততাহীন, খালি মেঝের ওপর, পরিশ্রমে, অবসাদে নিস্তেজ, হেরে নিঃশেষ। যান্ত্রিকভাবে বার কয়েক উচ্চারণ করলাম, 'বাড়ি গেছে, বাড়ি গেছে!' তারপর একদম চুপ হয়ে গেলাম। চোখে এক ফোঁটা জল নেই, কোনো চিন্তা নেই, কোনোরকম অনুভূতিহীন। বসে বসে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলাম চিঠিগুলোর দিকে, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। দশ মিনিট গেল, বোধহয় কুড়ি মিনিট, বা আরো বেশি। একই জায়গায় জড় বস্তুর মতো বসে রইলাম, একটা আঙুলও নড়ছে না। এই ঘুম ঘুম ভোঁতা অনুভূতিটা প্রায় একটা ঘুমের মতোই। তারপরই কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে শুনতে পেলাম।

'ছাত্র পিটারসেনকে চাই, ওর জন্যে দুটো চিঠি আছে।'

'ও বাড়ি গেছে,' মহিলাটি বলল, 'ছুটির পর আসবে। আপনি চাইলে চিঠিগুলো আমাকে দিতে পারেন।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' আমি বললাম 'ও ফিরে এলে এগুলো দেবেন। হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকতে পারে। সুপ্রভাত।'

বাইরে বেরিয়ে এসে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম আর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলাম, 'হে মহান ঈশ্বর, আপনাকে আমি একটি কথা বলতে চাই, আপনি বড় গোলমেলে লোক!' জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, দাঁতে দাঁত ঘষে আকাশের মেঘের উদ্দেশে চিৎকার করলাম, 'আমার ফাঁসি হয় হোক, কিন্তু আপনি বড়ই গোলমেলে লোক!'

কয়েক পা এগোলাম, আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎ একদম ভোল পালটে হাত জোড় করে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে, পবিত্র, মন্ত্রোচ্চারণের মতো স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাছা, তুমিও কি তার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছ?' নাঃ, বলাটা ঠিকমতো হল না!

'তার' হবে না, 'তাঁর' হবে; একটা গির্জার মতো বিশাল চন্দ্রবিন্দু লাগাতে হবে! আবার বললাম, 'বাছা, তুমিও কি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছ?' আমি মাথাটা অন্য পাশে হেলিয়ে, কাতর স্বরে বললাম, 'না।'

এটাও ঠিক মতো বলা হল না।

বোকারাম! ভণ্ডামি করোনা। হ্যাঁ, তোমার বলা উচিত যে আমি পরমপিতা ঈশ্বরকে মিনতি করছি। এবং তোমার কথাগুলোকে এমনভাবে সাজাও, যাতে

দারুণভাবে করুণা উদ্রেক করার মতো হয়ে ওঠে, যা তুমি জন্মেও শোনোনি। অতএব আরো একবার! ঠিক আছে, এবারেরটা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু তোমাকে পেটে শূলবেদনায় কাতর ঘোড়ার মতো শ্বাস ফেলতে হবে। সু-উ-উ! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এইভাবে ভণ্ডামি করতে করতে আমি চলতে লাগলাম। যখন ঠিকমতো করতে পারছি না, তখন অধৈর্য হয়ে রাস্তায় পা ঠুকছি; এই রকম মাথামোটা হওয়ার জন্য নিজেকেই গালিগালাজ করছি, আর এদিকে অবাক পথচারীরা ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে আর বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখছে।

আমি অবিরত কাঠের কুচি চিবিয়ে চলেছি আর রাস্তা ধরে যতদূর সম্ভব অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছি। খেয়াল করিনি, কখন রেলওয়ে স্কোয়ারে পৌঁছে গেছি। আমাদের ত্রাণকর্তার গির্জার ঘড়িতে দেড়টা বাজে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম। একটা হাল্কা ঘামের ধারা কপাল বেয়ে আমার চোখের পাতায় নামল। 'আমার সঙ্গে পুল পর্যন্ত চল,' আমি নিজেকেই বললাম, 'মানে, যদি তোমার হাতে সময় থাকে।' আমি ঝুঁকে নিজেকেই নমস্কার করলাম, তারপর জাহাজঘাটার কাছে রেলওয়ের পুল-এর দিকে চললাম।

ওখানে জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে আর রোদের মধ্যে সমুদ্র দুলছে। চারধারেই চলাফেরা আর কর্মব্যস্ততা, জাহাজের তীক্ষ্ণ ভোঁ বেজে চলেছে, জেটির খালাসীরা কাঁধে করে মোট বয়ে নিয়ে চলেছে। একটা বয়স্কা মেয়েলোক, কেক বিক্রেতা, কাছেই বসে আছে, আর নিজের জিনিসগুলোর ওপর ওর বাদামি নাকটা ঝুঁকিয়ে রয়েছে। ওর সামনের ছোট টেবিলটার ওপর ভালো ভালো জিনিস মহা পাপের মতো সাজানো রয়েছে। আমি ওদিক থেকে বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মেয়েলোকটা পুরো জাহাজঘাটায় ওর কেকের গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে– ছ্যাঃ জানালাগুলো বন্ধ করে দাও!

আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোককে ধরলাম আর ওর কাছে জাহাজঘাটায় এদিকে ওদিকে কেক-বিক্রেতাদের ন্যক্কারজনক উপস্থিতির বিরুদ্ধে জোর গলায় বলতে লাগলাম। কিন্তু লোকটা বিপদ বুঝে আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ওখান থেকে উঠে পালিয়ে গেল। আমিও উঠলাম এবং ওকে অনুসরণ করলাম, কেননা ওর ভুলটা ওকে বোঝাতেই হবে।

আমি ওর কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় মেরে বললাম, 'এটা যদি কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবিধান-এর ব্যাপারে বিবেচনা করার বিষয় হত...'

'মাপ করবেন, আমি এখানে নবাগত আর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই।' ও উত্তর দিল আর আমার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ওঃ, তাহলে তো মামলা অন্য রকম হয়ে গেল। ও যদি নবাগতই হয়... আমি কি তার কোনো কাজে আসতে পারি? তাকে আশপাশে ঘুরিয়ে দেখাতে পারি? তাহলে আমি খুশি হতাম আর ওর কোনো খরচাও হত না...

কিন্তু লোকটা আমার হাত থেকে পালাতে পারলে বাঁচে আর তাই ও তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে পালিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে। আমি বাস্তবে ফিরে এলাম। 'কাঁচি'কে চিনতে পারলাম, বোতামগুলো সযত্নে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। ও আমার নমস্কার অগ্রাহ্য করে আমাকে পার হয়ে যেতে চাইল, ওর নিজের নখের দিকে অখণ্ড মনোযোগ। আমি ওকে দাঁড় করিয়ে সম্পাদকের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

'উনি এখনও আসেননি, শুনতে পাচ্ছেন?'

'মিথ্যা কথা বলছ,' আমি অধৈর্য স্বরে বললাম, নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, 'ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার। একটা প্রয়োজনীয় খবর দিতে হবে, স্টিফ্‌ট্‌সগার্ডেন* থেকে জরুরি বার্তা।

'কেন, আমাকে সেটা বলা যায় না?'

'তোমাকে বলব?' কাঁচির মাথা থেকে পা পর্যন্ত জরিপ করলাম। এতে আশাপ্রদ ফল হল। ও আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমার হৃৎপিণ্ড মুখে উঠে এসেছে। সাহস আনবার জন্য দাঁতে দাঁত চাপলাম। তারপর দরজা ঠেলে সম্পাদকের ব্যক্তিগত অফিসে ঢুকলাম।

'গুড ডে, একি, আপনি?' উনি দয়ালু স্বরে বললেন, 'বসুন, বসুন,।' উনি যদি আমাকে দরজা দেখাতেন, সেটাও আমি মেনে নিতাম। আমার মনে হল, এক্ষুনি কান্না পেয়ে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি বললাম,

'আমাকে মাপ করবেন, আমি...'

'দয়া করে বসুন।' উনি আবার বললেন। আমি বসলাম এবং বুঝিয়ে বললাম যে, আর একটা লেখা এনেছি আর ওটা ওর কাগজে দিতে খুব উৎসুক। এটা লিখতে আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছে।

'আমাকে দিন, আমি পড়ে দেখব,' উনি লেখাটা নিয়ে বললেন, 'আপনি যা কিছুই লিখবেন, আপনাকে পরিশ্রম তো করতেই হবে, কিন্তু আপনি অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়; যদি আপনি আর একটু ধীর স্থির হতেন। আপনার লেখায় বড় বেশি জ্বরের উত্তাপ। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে আমি এটা পড়ে নেব।' এই বলে উনি টেবিলে ঘুরে বসলেন।

আমি ওখানেই বসে রইলাম। এক শিলিং চাইব? ওঁকে কি বোঝাবো, কেন আমার লেখায় এত জ্বরের উত্তাপ? উনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। এটাই তো প্রথম নয়।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। হুম। কিন্তু শেষবার আমি যখন এসেছিলাম, তখন উনি পয়সাকড়ি না থাকার কথা বলেছিলেন এবং লোক পাঠিয়ে আমার জন্য কিছু জোগাড় করেছিলেন। এবারও হয়তো সেই রকমই হবে। না, এটা হতে দেওয়া যায় না। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না যে, উনি কাজ করছেন?

আর কোনো কাজ আছে কিনা উনি জানতে চাইলেন।

---

* একটি স্টিফ্‌ট বা বিশপের এলাকার সিভিল গর্ভনর।

'না,' আমি বললাম আর গলার স্বর যতদূর সম্ভব শক্ত করলাম, 'আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব?'

'ওঃ, যাতায়াতের পথে যখন খুশি, দিন দুয়েক পরেই আসুন না হয়।'

আমার মুখ দিয়ে আর টাকার জন্য অনুরোধটা বের করতে পারলাম না। ভদ্রলোকের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারটা সীমাহীন এবং আমার জানা উচিত কীভাবে এর কদর করতে হয়। বরং অভাবের তাড়নায় মরে যাওয়াও ভালো! আমি চলে এলাম। দরজার বাইরে এসে আবার খিদের কামড় সহ্য করেও আমার কিন্তু একটুও অনুশোচনা হল না যে, কেন আমি এক শিলিং-এর জন্য অনুরোধ না করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। পকেট থেকে আর এক টুকরো কাঠের কুচি বার করে মুখে পুরলাম। একটু কাজ হল। আগে কেন এটা করিনি? 'তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত,' আমি জোরে জোরে বললাম, 'তোমার মাথায় কি সত্যিই ওঁর কাছে এক শিলিং চাওয়ার এবং ওঁকে অসুবিধায় ফেলার মতলবটা এসেছিল?' এবং আমি নিজের ওপরই খুব রেগে গেলাম এই রকম একটা বাজে কাজ করতে যাওয়ার দোষে দোষী হতে যাচ্ছিলাম বলে। 'ঈশ্বরের দিব্যি! এটা সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছিল,' আমি বললাম, 'একটা লোকের দিকে দৌড়ে গিয়ে প্রায় তার চোখ দুটো খুবলে তোলা, কেননা তোমার এক শিলিং দরকার, একটা ঘৃণ্য কুকুর কোথাকার! শু:, চল। দৌড়ও! জলদি! জলদি! ধেড়ে দামড়া কোথাকার, দেখাচ্ছি মজা!' নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য আমি দৌড়তে শুরু করলাম, এক দৌড়ে একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছি, চাপা চিৎকার করে নিজেকে ঠেলছি, আর যখনই প্রায় থেমে যাচ্ছি, তখনই নিজেকে দারুণভাবে চিৎকার করে ধমকাচ্ছি। এই করতে করতে শেষকালে পাইল স্ট্রিট ধরে অনেকখানি এসে একদম দাঁড়িয়ে গেলাম, আর দৌড়তে পারছি না দেখে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে প্রায় কাঁদতে শুরু করলাম। সারা শরীর কাঁপছে আর আমি একটা সিঁড়ির ধাপে নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম। 'না; দাঁড়াও!' আমি বললাম এবং নিজেকে সঠিক শাস্তি দেবার জন্য আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম এবং জোর করে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। আমি নিজেকে ব্যঙ্গ করলাম আর নিজের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দেখে আনন্দে নিজেকেই জড়িয়ে ধরলাম। শেষে, কয়েক মুহূর্ত পরে, মাথা নেড়ে নিজেকে বসবার অনুমতি দিলাম, যদিও তখনও আমি সিঁড়ির সবচেয়ে বাজে জায়গাটাই বসবার জন্যে বেছে নিলাম।

ঈশ্বর! বিশ্রাম করাটা কী সুখপ্রদ! মুখের ঘাম শুকিয়ে নিলাম আর বুকভরা তাজা শ্বাস নিলাম। কী দৌড়নোই না দৌড়লাম! কিন্তু তার জন্য মোটেই দুঃখিত নই; এটা আমার পাওনা ছিল। ওই শিলিং চাওয়ার ইচ্ছেটা কেন হয়েছিল? এখন আমি ফলাফলটা বুঝতে পারছি, এবং একজন মা যেমনভাবে ধমকায়, তেমনি মৃদু স্বরে নিজেকে ধমকাতে লাগলাম। আমার খুব বেশি বেশি মন খারাপ হতে লাগল আর এত দুর্বল আর ক্লান্ত আমি, কাঁদতে শুরু করলাম। কান্নাটা চুপি চুপি, হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা কান্না, এক ফোঁটা চোখের জল নেই।

আমি একই জায়গায় মিনিট পনেরো বা একটু বেশি বসে রইলাম। লোকজন যাতায়াত করছে, কেউ আমাকে কিচ্ছু বলেনি। বাচ্চাগুলো আমার চার পাশে খেলা করছে, রাস্তার ওপারে গাছে একটা ছোট্ট পাখি গান গাইছে।

একজন পুলিশ আমার দিকে এল। 'এখানে কেন বসে আছেন?' ও জিজ্ঞেস করল। 'এখানে কেন বসে আছি?' আমি জবাব দিলাম, 'ভালো লাগছে বলে।'

'আমি গত আধ ঘণ্টা ধরে দেখে যাচ্ছি আপনাকে। আপনি এখানে আধঘণ্টা ধরে বসে আছেন।'

'প্রায় তাই,' আমি জবাব দিলাম, 'আর কিছু?'

রাগের চোটে আমি উঠে দাঁড়ালাম আর হাঁটতে লাগলাম। বাজারে এসে আমি থামলাম আর পেছনে তাকিয়ে দেখলাম। আরে, এই উত্তরটা কি ঠিক হল? তোমার বলা উচিত ছিল, পরিশ্রান্ত বলে, আর গলাটা কাঁদুনে করা উচিত ছিল। তুমি একটা হাঁদা; তুমি কখনও মনোভাব গোপন করা শিখতে পারবে না। নিদারুণ শ্রান্তিতে তোমার একটা ঘোড়ার মতো হাঁপানো উচিত ছিল।

যখন আমি দমকলের কাছাকাছি এলাম, আমি আবার থামলাম আর একটা নতুন মতলব মাথায় এল। আমি আঙুল মটকে, পথচারীদের হতবুদ্ধি করে দিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলাম আর বললাম, 'তুমি এখন অবশ্যই যাজক লেভিয়নের কাছে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, আরে চেষ্টা করে দেখ না কেন? এটা করলে কি তোমার কোনো লোকসান হবে? আর এখন এতো ভালো আবহাওয়া!'

আমি পাশার বই-এর দোকানে ঢুকে যাজক লেভিয়নের ঠিকানাটা ডাইরেক্টরি ঘেঁটে বার করলাম, তারপর রওনা হলাম।

'এইবার!' আমি বললাম, 'কোনো ছলচাতুরী নয়। বিবেক, কি বল? কিছু মনে করো না, কোনো দুষ্টুমি নয়। বিবেকের আশ্রয় নেওয়ার পক্ষে তুমি বড্ড গরিব। তুমি ক্ষুধার্ত; তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছ- প্রথম দরকারি কাজ। কিন্তু তুমি মাথাটা একপাশে হেলিয়ে গানের মতো সুরে কথাটা বলবে। বলবে না? কি? তাহলে আমি আর এক পা-ও যাব না। শুনছ? সত্যিই, তুমি অত্যন্ত প্রলুব্ধ অবস্থায় আছ, অন্ধকারের এবং রাত্রের বোবা দৈত্যগুলোর শক্তির সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছ, যা ভাবতেও আতঙ্ক হয়; তুমি মদ ও দুধের জন্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, অথচ তুমি ওসব পাচ্ছ না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আর পকেটে একটা আধা পেনিও নেই। কিন্তু তুমি ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস কর, এখনও তুমি তোমার বিশ্বাস হারাওনি; এবং তারপরে তুমি দুই হাত জোড় করে শয়তানের মতো দেখতে হও, অথচ তুমি ঈশ্বরের মহিমাকে বিশ্বাস কর; ধনদৌলতের দেবতা ম্যামন তার সমস্ত জাঁকজমক নিয়ে যে কোনো রূপে এলেও, তুমি তাকে ঘৃণা কর। অবশ্য প্রার্থনা সঙ্গীতের বইটার ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা-কয়েক শিলিং-এর একটা স্মারক গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু নয়...'

আমি যাজকের বাড়ির দরজায় থামলাম, লেখা আছে, 'অফিসের সময়, '১২টা থেকে ৪টে।'

'মনে রেখ, একটাও বাজে কথা নয়,' আমি বললাম, 'এইবারে আমরা কিন্তু পুরো কাজটা সম্পূর্ণভাবে করব! কাজেই, মাথাটা আর একটু ঝোঁকাও...' আমি বাড়িতে ঢুকবার দরজার ঘণ্টি বাজালাম।

'আমি যাজকের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' আমি কাজের মহিলাকে বললাম; কিন্তু এখনও ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমার পক্ষে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব ছিল না।

'উনি বাইরে গেছেন।'

বাইরে গেছেন, বাইরে গেছেন! আমার পুরো মতলবটা বানচাল হয়ে গেল। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, সব ভেস্তে গেল, তাহলে এতখানি লম্বা রাস্তা হেঁটে এসে কী লাভ হল? আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কোনো বিশেষ দরকার আছে কি?' কাজের মহিলা জিজ্ঞেস করল।

'না, না, মোটেই না,' আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না।' ঈশ্বরের দেওয়া আজকের এই আবহাওয়াটা এত চমৎকার যে আমি ভাবলাম একবার এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, দাসীটিও দাঁড়িয়ে রইল। আমি ইচ্ছা করে বুকটা সামনে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যাতে আমার কোটের আটকে রাখা পিনটা ওর চোখে পড়ে। আমি ওকে আমার চোখ দিয়ে অনুনয় করলাম, যাতে ও জানতে চায় আমি কেন এসেছি, কিন্তু বোকা মেয়েটা কিছুই বুঝল না।

ঈশ্বরের আবহাওয়াটা কী সুন্দর! ওঁর স্ত্রীও কি বাড়িতে নেই?

আছেন; কিন্তু ওঁর পায়ে বাত আর উনি সোফাতে শুয়ে আছেন, হাঁটতে পারেন না... একটা বার্তা বা আর কিছু রেখে যাব কি?

না, না, মোটেই না; আমি মাঝে মাঝেই এ রকম হেঁটে থাকি, ব্যায়াম করার জন্য; রাত্রের খাওয়ার পর এটা বেশ স্বাস্থ্যকর... আমি আবার ফিরে চললাম, আর বেশিক্ষণ গল্প করে কী লাভ? তাছাড়া আমার মাথা ঝিমঝিম করা শুরু হয়ে গেছে। কোনো ভুল নেই, এবার সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়তে যাচ্ছি। অফিসের সময় ১২টা থেকে ৪টে। আমি এক ঘণ্টা দেরি করে দরজায় ধাক্কা দিয়েছি। অনুগ্রহ করার সময় পেরিয়ে গেছে। গির্জার কাছে বাজারে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। ঈশ্বর! এই মুহূর্তে আমার জন্য সবকিছুই কালো, অন্ধকার। আমি কাঁদতে পারলাম না; আমি অসম্ভব ক্লান্ত, শরীরের শেষ জলবিন্দুও শুকিয়ে গেছে। আমি ওইখানেই বসে রইলাম, কোনো সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করলাম না, মনমরা, নড়াচড়াহীন এবং ক্ষুধার্ত। বুকের ভেতর অসহনীয় জ্বালা, কাঠের কুচি চিবিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। ওই বন্ধ্যা কাজটি করে আমার চোয়ালই কেবল ক্লান্ত হয়েছে, তাই তাদের বিশ্রাম দিলাম। একদম হাল ছেড়ে দিয়েছি। একটা বাদামি হয়ে যাওয়া কমলা লেবুর খোসা, যেটা আমি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চিবোতেও শুরু করে দিয়েছিলাম, সেটা আমায় বমির ভাব এনে দিয়েছে। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, আমার কব্জির শিরাগুলো নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। আচ্ছা, আমি সত্যি সত্যি কী চাইছিলাম? সারাটি দিন দৌড়ে বেড়ানো কেবল

একটি শিলিং-এর জন্য, যা আমায় আরো কয়েক ঘণ্টা বেশি বাঁচিয়ে রাখবে? সব দিক ভেবে দেখলে, যা অবশ্যম্ভাবী, তা একদিন আগে ঘটুক, কি একদিন পরেই ঘটুক, পুরো ব্যাপারটায় কিছু যায় আসে কি? যদি আমি একজন সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করতাম, তাহলে আমার অনেক আগেই বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া এবং বিশ্রাম করা উচিত ছিল। এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনটা পরিষ্কার, স্বচ্ছ হয়ে গেল। তাহলে এখন আমি মারা যাব। এখন পাতা ঝরার দিন, সব কিছুই চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে। আমি সব রকম চেষ্টাই করেছি, আমার জানা সব উৎস-মুখ সন্ধান করেছি। এই চিন্তাটা আমি সযত্নে মনের মধ্যে লালন করতে লাগলাম, আর যখনই কোনো সম্ভাব্য উদ্ধারের কথা মাথায় এল, আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম, 'দূর বোকা, তুমি তো মরতে শুরু করেছ।'

গোটা দুয়েক চিঠি লিখে রেখে যাওয়া দরকার, সবকিছু ঠিক করে, নিজেকে প্রস্তুত রাখা দরকার। সযত্নে গা ধুয়ে নিতে হবে, বিছানাটা পরিপাটি করে রাখতে হবে। আমি আমার মাথা রাখব সাদা কাগজের পাতাগুলোর ওপরে, ওগুলোই আমার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জিনিস, আর সবুজ কম্বলটা। আমি... সবুজ কম্বল! বন্দুকের গুলির মতো পূর্ণ সজাগ হয়ে ছিটকে উঠলাম। মাথায় রক্ত উঠে গেল আর হৃৎপিণ্ডটা ভয়ানক জোরে লাফাতে লাগল। আমি বেঞ্চিটা ছেড়ে উঠে, হাঁটতে শুরু করলাম। শরীরের সমস্ত অণুতে অনুতে প্রাণ স্পন্দিত হতে থাকল এবং কিছুক্ষণ পর পরই আমি খাপছাড়াভাবে বলতে লাগলাম, 'সবুজ কম্বলটা– সবুজ কম্বলটা।' আমি দ্রুত, আরো দ্রুত চলতে লাগলাম, যেন এক্ষুনি কিছু আনতে হবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি কেটলি মিস্ত্রির কারখানায় এসে গেলাম। এক মুহূর্তও না থেমে অথবা আমার সিদ্ধান্ত থেকে না সরে, আমি সোজা বিছানায় চলে গেলাম আর হান্স পওলির কম্বলটা গুটিয়ে ফেললাম। আমার এই খাসা মতলবটাও যদি আমাকে বাঁচাতে না পারে, তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আমার মধ্যে যে বোকাবোকা নীতিবোধগুলো উঠছিল, আমার সম্মানে দাগ লাগবে ভেবে যে ভেতর থেকে চাপা আর্তির কান্না উঠে আসছিল, সেগুলোর অনেক ঊর্ধ্বে আমি উঠে গেলাম এবং এসব ব্যাপারকে ঝেড়ে ফেললাম। আমি হিরো নই, কোনো পুন্যাত্মা মূর্খও নই। আমার বুদ্ধি এখনও লুপ্ত হয়নি।

কাজে কাজেই, আমি কম্বলটা বগলের তলায় গুঁজে ৫ নং স্টেনারস স্ট্রিটে চলে গেলাম। আমি দরজায় ধাক্কা দিয়ে এই প্রথম সেই বড় আশ্চর্য ঘরটায় ঢুকলাম। আমার মাথার ওপর দরজার ঘণ্টিটা কয়েকটা বেশ জোর ঝাঁকুনি দিল। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন, চিবোচ্ছেন, মুখ ভর্তি খাবার, তারপর কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'ইয়ে, আমার এই চশমার বদলে ছ পেন্স দেবেন কি?' আমি বললাম, 'দুদিন বাদেই আমি এটা ফেরত নিয়ে নেব, নিশ্চয়ই, ঠিক আছে?'

'না! এটা তো স্টীলের তৈরি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'না, তাহলে এটা নিতে পারব না।'

'ও, আচ্ছা। মানে, আপনি নিতে পারবেন না। ঠিক আছে, আসলে আপনার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করলাম আর কি। শুনুন, আমার কাছে একটা কম্বল আছে, যেটা ঠিকমতো বলতে গেলে আমার আর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, আর তাই ভাবলাম, আপনি হয়তো এটা নিলেও নিতে পারেন।'

'আমার কাছে, দুঃখের কথা, পুরো স্টোর রয়েছে বিছানার সরঞ্জামে ভর্তি,' উনি বললেন, এবং যখন আমি কম্বলের রোলটা খুললাম, উনি একবার চোখ ফেলেই বললেন, 'না, মাপ করবেন, এটা আমার কোনো কাজেই আসবে না।'

'আমি আপনাকে কম্বলের খারাপ দিকটা প্রথমে দেখালাম,' আমি বললাম, 'অন্যদিকটা অনেক ভালো আছে।'

'ও, ও, এটা মোটেই ভালো নয়। আমি তো এটা নেবই না, আর আপনি অন্য কোথাও এটার জন্য এক পেনিও পাবেন না।'

'ঠিক বলেছেন। এটা পরিষ্কার যে, এটার কোনো মূল্য নেই,' আমি বললাম, 'কিন্তু আমার মনে হয়, অন্য আর একটা কম্বলের সঙ্গে এটাকে নিলামে চড়ানো যেতে পারে।'

'আজ্ঞে না; এটার কোনো মূল্য নেই।'

'তিন পেন্স?' আমি বললাম।

'না মশাই, আমি এটা কোনো মতেই নেব না! এটা এ দোকানের জন্য নেবই না।'

আমি কম্বলটা ফের বগলে চেপে বাড়ি চলে এলাম।

আমি এমন ভান করলাম, যেন কিছুই হয়নি, ওটা বিছানার ওপর বিছিয়ে হাত দিয়ে সমান করলাম, যেমন আমার অভ্যাস, আর ওটার সব কোঁচকানো সমান করলাম। এই বদমায়েসি করবার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই আমার মাথার ঠিক ছিল না। যতই এটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম, ততই এই ব্যাপারটা অকারণ বলে মনে হল। এটা নিশ্চয়ই দুর্বলতার আক্রমণ; আমার অন্তরাত্মার কিছু ঢিলেমি, যেটা অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে এসে আমাকে অবাক করেছে। আমি সোজা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছিলাম। আমার একটু একটু মনে হচ্ছিল, যেন আমি ভুল রাস্তায় যাচ্ছি যখন আমি প্রথমে আমার চশমাটা দিতে চাইলাম। এখন আমার মনে খুব আনন্দ হল যে, এই অসাধুতা আমি করতে ব্যর্থ হয়েছি, যা কিনা আমার বেঁচে থাকার শেষ ক'ঘণ্টাকে কলুষিত করত।

আমি আবার শহরে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ত্রাতার গির্জার পাশে একটা সীটে বসে বুকের ওপর মাথা গুঁজে ঝিমোলাম। শেষ উত্তেজক ঘটনাগুলোর পরে আমি এখন দুর্বল, অসুস্থ আর খিদেয় একদম অবসন্ন। সময় কেটে যায়।

আরো এক ঘণ্টা এখানে কাটাতে হবে। ঘরের ভেতরের চাইতে এখানে আলো একটু বেশি আর আমার মনে হল খোলা হাওয়ায় আমার বুকটা আর অত বেশি ব্যথা

করছে না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতেই হবে- আমি ঝিমিয়েই চললাম, আর খুব কষ্ট পেতে লাগলাম।

একটা ছোট্ট নুড়িপাথর দেখতে পেলাম। ওটা আমার কোটের হাতায় পরিষ্কার করে মুছে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম যাতে মুখের মধ্যে কিছু একটা থাকে। এছাড়া একদম নড়াচড়া করছি না, চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ছে না। লোকেরা যাচ্ছে, আসছে; গাড়ির শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ আর লোকজনের কথার আওয়াজ বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বোতামগুলো নিয়ে আরেকবার চেষ্টা করব নাকি? চেষ্টা করে কোনো ফল হবে না জানি, তবু বাড়ি ফিরবার পথে 'আঙ্কল'-এর দোকানটাতো পড়বে। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগলাম। ভুরুর ওপরে কপালে জ্বলুনি শুরু হয়েছে, জ্বর আসছে, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি, পথ চলছি। আরেকবার সেই রুটির দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, যেখানে সেই ছোট্ট রুটিটা রয়েছে। 'এখানে দাঁড়াতেই হবে,' আমি মনস্থির করে ফেলেছি। যদি ভেতরে গিয়ে এক টুকরো রুটি চাই? না না, এটা ক্ষণিকের চিন্তা, হঠাৎ করে মাথায় এসেছে, আন্তরিকভাবে একথা আমি ভাবতেই পারি না। 'ছিঃ,' আমি নিজেকেই ফিসফিস করে বললাম আর মাথা নেড়ে নিজের রাস্তাতে চলতে লাগলাম। রেবস্ট্যাজার-এ একজোড়া প্রেমিক একটা দরজায় দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে কথা বলছে; আরেকটু এগিয়ে একটা মেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করল। আমি এত ধীরে চিন্তান্বিত হয়ে পথ চলছি যে, মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমি গভীর চিন্তামগ্ন। মেয়েটা রাস্তায় বেরিয়ে এল। 'বাবু! কেমন আছেন? অ্যাঁ! আপনি কি অসুস্থ? হে ভগবান! রক্ষা কর, কী চেহারা!'

আর ও ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার চেহারায় কী হয়েছে? আমার মুখে কি মৃত্যুর ছায়া পড়েছে? আমি আমার গালে হাত বোলালাম; রোগা, পাতলা– স্বাভাবিক; আমি নিজেই তো রোগা, গাল দুটো তো এখন চুপসে গর্ত হয়ে গেছে, যেন দুটো বাটি। কিন্তু ঈশ্বর... আমি আবার পা টেনে টেনে চলতে লাগলাম, আবার থেমে গেলাম; আমি নিশ্চয়ই অকল্পনীয় রোগা হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো কি আমার মাথার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কে জানে? আসলে আমার চেহারাটা এখন কী রকম দেখতে? শুধুমাত্র খিদের চোটে কেউ কি বিকলাঙ্গ হয়ে যেতে পারে? আবার আমার খুব রাগ হল, শেষ রাগ, অন্তিম কাঁপুনি। 'আমাকে বাঁচাও, কী মুখের চেহারা, অ্যাঁ?' এইখানে আমি এখন রয়েছি, আমার এমন একটা মগজ, যার তুলনা এ দেশে কোথাও পাওয়া যাবে না; আমার এমন দুখানা মুষ্টি, ঈশ্বর জানেন, যা দিয়ে আমি লোহা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিতে পারতাম, অথচ তবু আমি কেবলমাত্র খেতে না পেয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছি, এই ক্রিশ্চিয়ানা শহরে! এর পেছনে কোন যুক্তি বা কারণ আছে? আমি ঘোড়ার পিঠে বসে একটা সামান্য বাহকের মতো দিন রাত্রি পরিশ্রম করেছি!

আমি পড়াশুনা করে করে চোখ দুটোকে কোটরের বাইরে এনে ফেলেছি, মাথার ভেতরের মগজকে না খাইয়ে শুকিয়ে ফেলেছি, আর তার বদলে কী পেয়েছি? একটা

রাস্তার বেশ্যা মেয়েও আমার চেহারা দেখে বাঁচার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। নাঃ, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। বুঝতে পারছ? এটা বন্ধ কর, নইলে শয়তান আমাকে পুরোপুরি দখল করে নিক।

ক্রমাগত বর্ধিত রাগে, নিজের অক্ষমতার বিবেকের চাপে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে চোখে জল আর মুখে শপথ নিয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে হেঁটে চলেছি, আশপাশ দিয়ে লোকজন যাচ্ছে, কারো দিকে তাকাচ্ছি না। নিজেকে শহীদ করার চেষ্টা করছি, ইচ্ছা করে ল্যাম্পপোস্টে মাথা ঠুকছি, হাতের তালুতে নখ বিঁধিয়ে দিচ্ছি, ঠিকমতো কথা বলতে পারছি না বলে রাগের চোটে জিভ কামড়াচ্ছি এবং যখনই খুব ব্যথা পাচ্ছি, পাগলের মতো হেসে উঠছি।

'হ্যাঁ, কিন্তু কী করব?' শেষ পর্যন্ত নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম আর ফুটপাথে বারবার পা ঠুকে পুনরাবৃত্তি করলাম, 'এখন কী করব?' এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হেসে মন্তব্য করলেন, 'আপনি গিয়ে বলুন আপনাকে গারদে তালা দিয়ে আটকে রাখতে।' আমি তার দিকে তাকালাম। আরে, এতো একজন ডাক্তার, নাম-করা স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ, ওকে সবাই 'দি ডিউক' বলে ডাকে। এই পরিচিত লোকও আমার সত্যিকার অবস্থাটা বুঝতে পারল না, যার সঙ্গে আমি কতবার হাত মিলিয়েছি। আমি চুপ হয়ে গেলাম। হাজতে আটক? হ্যাঁ, আমি পাগলই বটে। উনি ঠিক বলেছেন। আমি আমার রক্তের মধ্যে পাগলামো টের পাচ্ছি; আমার মাথার মধ্যে পাগলামোর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছি। তাহলে এই আমার পরিণতি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার আমি ক্লান্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক হাঁটা শুরু করলাম। একটা বাড়ি আছে, যেখানে বিশ্রাম পাওয়া যাবে।

হঠাৎ আমি আবার থেমে গেলাম। না, আটক থাকব না। বলছি, আমি আটক থাকব না। ভয়ে আমি সিঁটিয়ে গেলাম। ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করলাম; আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালাম, আমাকে যেন আটক না থাকতে হয়। আমাকে আবার সেই গার্ডহাউসে নিয়ে যাবে, একটা অন্ধকার সেলে বন্দী করে রাখবে, যেখানে এক বিন্দু আলো নেই, না, না! নিশ্চয়ই অন্য রাস্তা আছে, যেটা আমি চেষ্টাও করিনি। এখন চেষ্টা করতে হবে। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব, অক্লান্তভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরব দীর্ঘ সময় নিয়ে। যেমন সংগীত বিক্রেতা সিসলার আছে; ওর কাছে তো একবারও যাইনি। কিছু উপায় বের হবেই। এইভাবে হোঁচট খেতে খেতে আর বকবক করতে করতে হাঁটতে লাগলাম, যতক্ষণ না আবেগে কান্না এসে গেল। সিসলার? এটা কি ওপর থেকে আসা কোনো ইঙ্গিত? ওর নামটা হঠাৎ মাথায় এসে যাওয়ার পেছনে কোনো কারণ নেই, আর তাছাড়াও অনেক দূরে থাকে... কিন্তু আমি ওর সঙ্গে দেখা করবই, আস্তে আস্তে হাঁটব, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেব। ওর জায়গাটা আমি জানি; যখন অবস্থা ভালো ছিল, তখন প্রায়ই ওর ওখানে গিয়ে ওর কাছ থেকে অনেক গান কিনেছি। আচ্ছা, ওর কাছে কি ছ' পেন্স চাওয়া যাবে? ও হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে। আমি এক শিলিং চাইব। আমি ওর

দোকানে পৌঁছে মালিকের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওরা আমায় ওর অফিস ঘরটা দেখিয়ে দিল। ঘরে ও বসে আছে, সুন্দর মার্জিত চেহারা, একেবারে হাল-ফ্যাশনের পোশাক পরা, কিছু জমা খরচের হিসাবনিকাশ করছিল। আমি একটা অজুহাত দেখিয়ে নিজের বক্তব্যটা বললাম। প্রয়োজন পড়েছে বলেই আসতে হল, ফেরত দিতে বেশি দেরি হবে না, আমার পত্রিকার লেখাটার জন্য টাকাটা পেলেই দিয়ে দেব... আমার খুব উপকার হবে...। আমি যতক্ষণ বলে যাচ্ছি, ও ততক্ষণে চেয়ার ঘুরিয়ে নিজের কাজ ফের শুরু করেছে। আমি যখন কথা শেষ করলাম, ও পাশ ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে ওর সুন্দর মাথাটা নাড়িয়ে একদম সোজা বলে দিল, 'না'– কোনো কারণ নয়– আর অন্য কোনো কথা নয়।

আমার হাঁটু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল আর আমি দোকানের পালিশ করা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সোজা রাখলাম। আরেকবার চেষ্টা করতেই হবে। নইলে অতদূরে ওই ভেটারল্যান্ডে দাঁড়িয়ে ওর নামটাই বা মনে পড়বে কেন? শরীরের বাঁ দিকে কিছু একটা অঙ্গ বার দুয়েক ঝাঁকুনি দিল আর আমার সারা শরীর দিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল। আমি বললাম যে, আমার অবস্থা খুব শোচনীয় আর তাছাড়া আমি খুব অসুস্থ, কপাল মন্দ। কয়েকদিনের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই শোধ করে দেব। যদি ও দয়া করে?

'প্রিয় মহাশয়, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন?' ও জানতে চাইল, 'আপনি আমার কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত রাস্তার লোক। আপনাকে যারা চেনে, সেই কাগজের অফিসে যান।'

'কেবল আজ সন্ধ্যার জন্য,' আমি বললাম, 'অফিস তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, আর আমি খুব ক্ষুধার্ত।'

ও বারবার মাথা নাড়তে লাগল। আমি যখন দরজার হাতল ধরেছি, তখনও ও মাথা নেড়ে যাচ্ছে। 'শুভ সন্ধ্যা' আমি বললাম। এটা তাহলে ওপরের কোনো ইঙ্গিত নয়, আমি ভাবলাম আর তিক্ত হাসি হাসলাম। আমি নিজেই তো এ রকম ইঙ্গিত দিতে পারি। পা টেনে টেনে একটার পর একটা ব্লক পার হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কোনো বাড়ির দরজায় ধাপের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। যদি কোনো রকমে হাজতে ঢোকা থেকে নিজেকে বাঁচানো যেত। ওই সেলের আতঙ্ক আমাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে, শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। যখনই রাস্তায় দূর থেকে কোনো পুলিশকে দেখতে পাচ্ছি, অমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশের কোনো গলিতে ঢুকে পড়ছি, যাতে ওকে এড়াতে পারি। আচ্ছা, এবারে আমি গুনে গুনে একশ' পা যাবো, দেখি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় কিনা। কিছু একটা উপায় বার করতেই হবে।

একটা ছোট মতো সুতার দোকান, আগে কোনোদিন ঢুকিনি। একজন লোক কেবল কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, (ওর পেছনে দরজায় চিনা প্লেট লাগানো একটা অফিস ঘর রয়েছে) তাকের ওপর জিনিসপত্র সাজাচ্ছে। শেষ খদ্দের চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম, গালে টোল পড়া একটা অল্পবয়েসি মেয়ে। ওকে দেখে মনে হল ও কী

সুখী! আমার কোটটা পিন দিয়ে আটকানো, আর তা সত্ত্বেও আমি ওর মুখোমুখি হতে মোটেও পিছপা হইনি। আমি এরপর ঘুরে দাঁড়ালাম, বুক চিতিয়ে।

'আপনার কিছু দরকার?' দোকানদার জানতে চাইল।

'মালিক আছেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'উনি জোটুনহেইমেন-এ পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন' ও বলল। কোনো বিশেষ দরকার আছে কি?

'কিছু খাবার কেনার জন্য দু পেনি দরকার,' আমি বললাম, আর হাসতে চেষ্টা করলাম, 'আমি ক্ষুধার্ত, আর একটাও পয়সা নেই।'

'তাহলে আপনি আমার মতোই ধনী,' ও মন্তব্য করল আর কয়েকটা উলের প্যাকেট সাজাতে লাগল।

'ওঃ, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না– এখনি না।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম। আমার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 'না খেয়ে খেয়ে আমার মরার অবস্থা; অনেক দিন হয়ে গেল, আমি কিছুই খাইনি।'

গম্ভীরভাবে, একটাও কথা না বলে ও নিজের পকেটগুলো একটা একটা করে উল্টে দেখাল। ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি, তাই না?

'মাত্র একটা আধা পেনি,' আমি বললাম, 'আর দিন দুয়েকের ভেতরই আমি তার বদলে এক পেনি দিয়ে যাব।' 'দাদা ভাই, আপনি কি চান আমি ক্যাশবাক্স থেকে চুরি করি?' ও অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ক্যাশবাক্স থেকে একটা আধা পেনি বার করে নিন।'

'আমার দ্বারা এ কাজ হবে না,' ও বলল, 'আর একটা কথা শুনুন, খুব হয়েছে, আর একটাও কথা নয়।'

আমি নিজেকে প্রায় ছিঁড়ে বার করে নিয়ে এলাম, খিদেয় অসুস্থ, মৃতপ্রায়, আবার লজ্জায় মরে যাচ্ছি। একটুকরো হাড়ের জন্য আমি নিজেকে কুকুরে পরিণত করেছি, অথচ হাড়টাও পেলাম না। না, এর শেষ করতেই হবে! বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এত বছর ধরে নিজেকে সোজা রেখেছিলাম, কত কঠিন সময় পার করেছি, আর এখন হঠাৎই আমি ভিক্ষাবৃত্তির মতো নিম্নতম স্তরে নেমে গেছি। আজকের এই দিনটি, এই একটি দিন আমার স্বভাবকে কলুষিত করল, আমার আত্মাকে নির্লজ্জ বেহায়া করে তুলল। একটা ইতর ফেরিওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়ে প্যান প্যান করে কাঁদতে আমার লজ্জা হল না, অথচ তার বদলে আমি কী পেলাম?

কিন্তু তখন কি আমার এক কণামাত্র রুটি মুখে দেবার মতো অবস্থা ছিল? আমি নিজেকে নিজের কাছে ঘৃণ্য করে তুলতে সফল হলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ; কিন্তু এর শেষ করতেই হবে। এখন তো বাড়ির বাইরের দরজাতে তালা লাগিয়ে দেবে। কাজেই তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে হয়তো সেই গার্ড হাউসেই রাত কাটাতে হবে।

এই কথা ভেবে গায়ে জোর এল। ওই সেলে রাত কাটানো কক্ষনো নয়। শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, হাত দুটো শক্ত করে বাঁ দিকের পাঁজরায় চেপে ধরে, যাতে যন্ত্রণাবোধটা

কমাতে পারি, আমি হাঁটার লড়াই চালিয়ে গেলাম, দুচোখ নিচু করে পাথর বসানো ফুটপাথের ওপর দৃষ্টি রেখে, যাতে কোনো পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নমস্কার না করতে হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দমকলের দিকে এগিয়ে চললাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ; আমাদের 'ত্রাতা'র ঘড়িতে এখন মোটে সাতটা বাজে। দরজায় তালা পড়তে এখনও তিনঘণ্টা বাকি আছে। কি ভয়ই না পেয়েছিলাম।

তাহলে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখিনি। যা সম্ভব, সব করেছি। ভাবতে অবাক লাগছে যে, সারাদিনে আমার একটা চেষ্টাও ফলবতী হল না! এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, লিখে রাখলে বলবে আমি এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি। একটা জায়গাতেও সফল হলাম না। যাক গে, কিচ্ছু করার নেই। আবার কোনো জায়গায় গিয়ে যেন করুণ অবস্থা না হয়। বাঃ, কী বিরক্তকর অবস্থা। আমি তোমাকে বলছি, তোমাকে আমার ঘেন্না করছে। যদি সব আশাই ফুরিয়ে যায়, তো সব শেষ। আরে, আস্তাবল থেকে এক মুঠো যবের দানা চুরি করতে পারি না? একটু আলো দেখা যাচ্ছে কি? না, আমি জানি, আস্তাবল বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি সময় নিয়ে একটা শামুকের মতো অতি ধীরে চুপিসারে বাড়ির দিকে এগোলাম। খুব তেষ্টা পাচ্ছিল, ভাগ্য ভালো, সারাদিনে এই প্রথম তেষ্টা পেল। জল পাওয়া যাবে এমন একটা জায়গার খোঁজে বেরোলাম। বাজার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, আর, কোনো বাড়িতে আমি জল চাইব না। বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করব নাকি? আরো মিনিট পনেরো লাগবে। অবশ্য আমি খুব নিশ্চিত নই যে, একঢোক জলও পেটে রাখতে পারব। পাকস্থলীতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। অথচ একটু থুতু গিললেই বমি বমি পাচ্ছে। কিন্তু বোতামগুলো! বোতামগুলো নিয়ে এখনও তো কোনো চেষ্টাই করিনি। ওই খানে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসতে শুরু করলাম। সবকিছুর পরেও একটা উপায় হয়তো আছে। এখনও পুরোপুরি সর্বনাশ হয়নি। ওগুলোর জন্য নিশ্চয়ই এক পেনি পাওয়া যাবে। আগামীকাল আবার এক পেনির জন্য অন্য কোথাও চেষ্টা করা যাবে, আর বৃহস্পতিবারে তো আমি খবরের কাগজের লেখাটার জন্য কিছু পাবই। এখন দেখতে হবে যাতে সঠিকভাবে কাজটা হয়। সত্যি, ভাবা যায়, আমি বোতামগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম?

আমি ওগুলো পকেট থেকে বার করলাম আর হাঁটতে হাঁটতে ওগুলো ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। আমার চোখ আনন্দে ঝাপসা হয়ে এল। রাস্তাটা খেয়াল করলাম না, হেঁটেই চললাম। বড় বন্ধকী দোকানটা কি আমি জানি না, যেখানে অন্ধকার সন্ধ্যাবেলায় আমি আশ্রয় নিতাম, আমার রক্ত-চোষা বন্ধুর কাছে? আমার সমস্ত সম্পত্তি, একটার পর একটা ওখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আমার বাড়ি থেকে আসা ছোটখাটো সব জিনিস, আমার শেষ বই। আমি ওখানে নীলাম ডাকার দিনগুলোয় যেতাম, আর তাকিয়ে দেখতাম, আমার বইগুলো কোনো ভালো লোকের হাতে পড়লে খুশি হতাম। অভিনেতা ম্যাগেলসেন আমার ঘড়িটা কিনেছিল; আমি সেটাতে খুব গর্ববোধ করেছিলাম। একটা ডায়েরি, যেটাতে আমার প্রথম কবিতা লেখার প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়েছিল, কিনেছিল

আমারই এক পরিচিত ব্যক্তি আর আমার টপকোটটা আশ্রয় পেয়েছিল এক ফোটোগ্রাফার-এর কাছে, ও সেটা স্টুডিওতে ব্যবহার করবে। কাজেই এই সব জিনিস নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি বোতামগুলো হাতে নিয়ে প্রস্তুত হলাম। 'আঙ্কল' নিজের টেবিলে বসে কিছু লিখছিল। 'তাড়া নেই,' আমি বললাম, ও বিরক্ত হতে পারে এবং আমার আবেদন শুনে অধৈর্য হয়ে উঠতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছি। আমার গলার স্বর এত ফাঁপা যে আমি নিজেই নিজের গলার স্বর চিনতে পারছি না আর আমার হৃৎপিণ্ড হাতুড়ির মতো উঠছে পড়ছে।

ও যেমন করে থাকে, তেমনি হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এল, কাউন্টারের ওপর দুই হাত রেখে কোনো কথা না বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, আমি কিছু জিনিস এনেছি, যেটা ওর কোনো কাজে লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করব। এমন জিনিস, যেগুলো বিরক্তিকর, কোনো কাজে লাগে না, কয়েকটা বোতাম। ও আমার হাতের দিকে তাকাল। এগুলোর জন্য দুটো আধা-পেনি দিতে পারবে কি? 'এই বোতামগুলোর জন্য?' আঙ্কল আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল, 'এই বোতামগুলোর জন্য?' আরে ওর নিজের জন্য একটা সিগার, বা যা পছন্দ হয়, তার জন্যে; আমি এইদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম আর ভাবলাম একটু ভেতরে ঘুরে যাই।

বুড়ো বন্ধকীওয়ালা আমার কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ল, আর কোনো কথা না বলে নিজের টেবিলে ফিরে গেল। আমি ঐখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; বেশি কিছুতো আশা করিনি, একটু সাহায্য পাবার সম্ভাবনার কথাই কেবল ভেবেছিলাম। ওর এই হাসিটা আমার মৃত্যুর পরোয়ানা। মনে হয়, আমার চশমাটা নিয়ে চেষ্টা করলে কোনো কাজ হবে না? নিশ্চয়ই, বোতামের সঙ্গে চশমাটাও দেব। আমি চশমাটা খুললাম। কেবল এক পেনি; বা ও যদি চায়, আধা পেনি।

'তুমি খুব ভালো করেই জান যে, তোমার চশমার জন্য আমি কিচ্ছু ধার দিতে পারব না' আঙ্কল বলল, 'আমি তোমাকে আগেও একথা বলেছি।'

আমি বিমর্ষ মুখে বললাম, 'কিন্তু আমার যে একটা স্ট্যাম্প কিনতে হবে। যে চিঠিগুলো লিখেছি, ওগুলো ডাকে পাঠাতে পারছি না। এক পেনি বা আধা পেনির স্ট্যাম্প, যা মনে করেন।'

'ওঃ! ঈশ্বরের দোহাই, নিজের রাস্তা দেখ!' ও উত্তর দিল আর হাত নেড়ে আমাকে চলে যেতে বলল।

হ্যাঁ, এই রকমই তো হতে হবে, আমি নিজেকে বললাম। যন্ত্রের মতো চশমাটা ফের চোখে পড়লাম, বোতামগুলো হাতে নিলাম আর ঘুরে, ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাইরে এসে যথারীতি দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিলাম। বেশ, আর তাহলে কিচ্ছু করার নেই!' 'ভাবা যায়, ও কোনো মূল্যেই ওগুলো নিল না!' 'আমি বিড়বিড় করলাম, 'ওগুলো একদম নতুন বোতাম, আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।'

আমি দাঁড়িয়ে নিজের চিন্তায় বিভোর, একটা লোক আমার পাশ দিয়ে অফিসে ঢুকল। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে আমাকে একটু ধাক্কাও দিয়েছে।

আমরা পরস্পরকে দুঃখ প্রকাশ করলাম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম।

'আরে, তুমি নাকি?' ও হঠাৎ বলে উঠল, ততক্ষণে আধা সিঁড়ি উঠে গেছে। ও নিচে নেমে এল আর আমিও ওকে চিনতে পারলাম। 'ভগবানের দোহাই! এ কি চেহারা তোমার? এখানে কী করছ?' 'ও:, একটা কাজ ছিল। তুমিও তো দেখছি ভেতরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ; তুমি কী বন্ধক দিয়ে টাকা তুলতে এসেছ?'

আমার হাঁটু কাঁপছে; কোনো রকমে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম বোতাম সমেত।

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার!' ও চেঁচিয়ে উঠল, 'না না, সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার।'

'শুভ রাত্রি!' আমি চলে যাবার উপক্রম করলাম; বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'না; এক মিনিট অপেক্ষা কর,' ও বলল।

কীসের জন্য অপেক্ষা করব? ও নিজেও তো 'আঙ্কল'-এর কাছে এসেছে, হয়তো ওর বিয়ের আশীর্বাদি আংটিটা নিয়ে বন্ধক দিতে, হয়তো অভুক্ত, ক্ষুধার্ত, বেশ কিছুদিন ধরেই- হয়তো বাড়িওয়ালিকে দিতে হবে।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'যদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস...' 'নিশ্চয়ই,' ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার কথা আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। তুমি একটা আহাম্মক, আমার সঙ্গে আসাই তোমার পক্ষে এখন ভালো।'

বুঝলাম ও কী বলতে চায়। হঠাৎ আমার অহংবোধ জাগ্রত হল, আমি বললাম, 'সম্ভব নয়; বার্নট একার্স স্ট্রিটে সাড়ে সাতটার সময় থাকব বলে কথা দিয়েছি, আর...'

'সাড়ে সাতটা, তাই বটে; কিন্তু এখন তো আটটা বাজে। আমি এখানে এসেছি, হাতে এই ঘড়িটা, বন্ধক দেব বলে। অতএব চল আমার সঙ্গে ক্ষুধার্ত পাপী! যে করেই হোক তোমাকে আমি পাঁচ শিলিং দেব,' আর ও আমাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

৩.

মহানন্দে কেটে গেল এক সপ্তাহ।

এবারেও আমি খারাপ সময়টা পার হয়ে এলাম। প্রত্যেকদিন খেয়েছি আর আমার সাহসও বেড়ে গেছে। আগুনে একটার পর একটা লোহা ছুঁড়ে দিয়েছি।

এক সঙ্গে তিন চারটে লেখা শুরু করেছি। মাথায় যাবতীয় যা চিন্তা ভাবনা, যা আলোর ইশারা উঠছে, সব কিছু এই লেখাগুলো নিংড়ে নিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে লেখাগুলো আগের লেখার চাইতেও ভালো হচ্ছে।

শেষ যে লেখাটা লিখেছিলাম, যেটা নিয়ে খুব দৌড়ঝাঁপ করেছি আর যেটার ওপর অনেক আশা ছিল, সেটা সম্পাদক ফেরত দিয়ে দিয়েছেন আর আমি রাগের চোটে ওটা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলেছি, দ্বিতীয়বার পড়িইনি। ভবিষ্যতে অন্য খবরের কাগজ খুঁজে নিতে হবে, যাতে আমার লেখা প্রকাশ করার আরো রাস্তা খোলা যায়।

ধরলাম, লেখাগুলো সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আর অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছে, তাহলে তখনও আমার হাতে আছে জাহাজে চেপে সমুদ্র যাত্রা। জেটিতে 'নান' জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত, আর আমি হয়তো জাহাজে কোনো কাজ জোগাড় করে 'আর্কানজেল,' বা অন্য যে জায়গায় জাহাজ যাক না কেন, যেতে পারব। চারিদিকে কাজের অনেক জায়গা খোলা আছে। শেষ বিপর্যয়টা আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে গেছে। আমার মাথার চুল গোছা গোছা উঠে যাচ্ছে, মাথা ধরার যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছি, বিশেষ করে সকালের দিকে, আর আমার স্নায়ুচাপ তো মরেই গেছে। আমি সারাদিন বসে বসে যখন লিখি, তখন হাত দুটো ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখি, কারণ আমার নিজের শ্বাস চামড়ার ওপর পড়লেও সহ্য

করতে পারি না। জেন্‌স ওলাজ নিচে আস্তাবলের দরজাটা জোরে বন্ধ করলে বা উঠোনে কোনো কুকুর ঢুকে ঘেউ ঘেউ করলে, সেই আওয়াজ আমার হাড় মজ্জার ভেতরে চতুর্দিক থেকে ঠাণ্ডা বরফের মতো খোঁচা মারে। শরীরটা বেশ ভালোই ভেঙে গেছে।

দিনের পর দিন আমি ক্রমাগত লিখে গেছি, খাওয়ার জন্য যে সামান্য সময়টুকু ব্যয় করেছি, সেটাও আমার না-পছন্দ, খেয়ে নিয়েই আবার লিখতে বসে গেছি। এই মুহূর্তে আমার বিছানায়, নড়বড়ে টেবিলের ওপর নোটস, লেখা কাগজ চতুর্দিকে ছড়ানো, যেগুলোয়, মাথায় যেমন যেমন চিন্তা আসছে, তেমন তেমন পালা করে লিখে যাচ্ছি, মুছছি, শব্দ বা বাক্য পরিবর্তন করছি, ফ্যাকাশে শব্দগুলো রঙিন করে তুলছি, প্রচণ্ড পরিশ্রম করছি। একদিন বিকেলে একটা লেখা শেষপর্যন্ত শেষ করে, তৃপ্ত এবং খুশি মনে লেখাটা পকেটে ঢুকিয়ে, 'কমোডর'-এর কাছে গেলাম। কিছু টাকা জোগাড় করতেই হবে, হাতে মাত্র কয়েক পেনি পড়ে আছে।

'কমোডর' আমাকে একটুক্ষণ বসতে বললেন। উনি একটু বাদেই খালি হবেন, এখন তাড়াতাড়ি কিছু লিখছেন।

আমি ছোট অফিস ঘরটা তাকিয়ে দেখলাম, ফোটো, ছবি, ছাপা কাগজ, কাটিং আর একটা মস্ত বড় কাগজ ফেলার ঝুড়ি, দেখে মনে হল, একটা গোটা মানুষ, হাড় মাংস সমেত গিলে খেতে পারে। এই দৈত্যের মতো হাঁ করা, ড্রাগনের মতো মুখ, সব সময় হাঁ করেই আছে, বাতিল করা লেখাগুলো, কত জনের চূর্ণ আশা, সব খাবার জন্য প্রস্তুত, ঝুড়িটা দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

'আজকে মাসের কত তারিখ?' কমোডর টেবিল থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'২৮ তারিখ,' আমি বললাম। খুশি হলাম কোনো কাজে লাগতে পেরেছি বলে।

'২৮ তারিখ,' উনি লিখে চললেন। শেষ পর্যন্ত লেখা শেষ করে দুটো চিঠি খামে ভরে, কিছু বাতিল কাগজ ঝুড়িতে ফেলে কলম রেখে দিলেন। তারপর চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি দরজার কাছে তখনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে, উনি হাত নেড়ে আমাকে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

আমি একপাশে ফিরে যাতে উনি দেখতে না পান যে আমার ওয়েস্ট কোটটা নেই, কোট খুলে জামার পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বার করলাম।

'এটা একটা ছোট চরিত্র চিত্রণ, করেগ্‌গিও-র,' আমি বললাম, 'কিন্তু হয়তো সঠিকভাবে লেখা হয়নি...'

উনি আমার হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে পড়তে শুরু করলেন, মুখটা আমার দিকে ঘোরানো।

তাহলে কাছ থেকে দেখলে উনি এই রকম দেখতে। আমার প্রথম যৌবন থেকে ওঁর নাম শুনে আসছি আর ওঁর কাগজ যত দিন যাচ্ছে, আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। কোঁকড়া চুল, সুন্দর বাদামি চোখ দুটো ছটফটে। মাঝেমাঝে নিজের নাকটা

মোচড়ানোর স্বভাব আছে। কোনো স্কট্ মন্ত্রীই এই লেখকের চেয়ে মৃদু স্বভাবের বলে মনে হবে না, অথচ এঁর কলম যখন আক্রমণ করে, তখন রক্তের দাগ রেখে যায়। এই লোকের সান্নিধ্যে আমার মধ্যে একটা ভয় ও শ্রদ্ধার ভাব এল। চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছে আর আমি একপা এগিয়ে ওঁকে বলতে চাইলাম, ওঁর কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে তার কদর করি এবং উনি আমাকে যেন আঘাত না দেন; আমি একটা হতভাগা, কোনো কাজই সঠিকভাবে করতে পারি না, সময় খুব খারাপ যাচ্ছে...

উনি আমার পাণ্ডুলিপিটা আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে তাকালেন। ওর অস্বীকৃতির কাজটা সোজা করে দেবার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, 'ও হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এটা আপনার কাজে আসবে না,' আমি একটু হাসলাম, ওঁকে বোঝাতে যে আমি এটা সহজভাবেই নিয়েছি।

'আমাদের কাজে আসতে গেলে সবকিছুকেই জনপ্রিয় হতে হবে,' উনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের জনগণ কেমন, আপনি তো জানেন। কিন্তু আপনি কি চেষ্টা করে একটু সাধারণের বোধগম্য কিছু লিখতে পারেন না?'

ওঁর সহনশীলতা আমাকে অবাক করল। বুঝলাম যে আমার লেখাটা বাতিল হল। কিন্তু তবু এত সম্মান দিয়ে অস্বীকৃতি আমি অন্য কোথাও পেতাম না। ওঁর সময় আর নষ্ট করব না ভেবে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারি।'

আমি দরজার দিকে এগোলাম। হুম– ওঁর খানিকটা সময় নষ্ট করলাম বলে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন... আমি নমস্কার করে দরজার হাতল ঘোরালাম।

'যদি প্রয়োজন বোধ করেন,' উনি বললেন 'আপনি কিছু অগ্রিম নিতে পারেন। ওটা কাজ দিয়ে শোধ করে দেবেন, জানেন তো!'

যেহেতু উনি এইমাত্র দেখলেন যে আমি লিখতে পারি না, অতএব ওঁর এই প্রস্তাবে আমি অপমানিত বোধ করলাম এবং বললাম, 'না, ধন্যবাদ; আরো কিছুদিন চালিয়ে নিতে পারব। যাই হোক, ধন্যবাদ, শুভদিন।'

'শুভদিন!' 'কমোডর' উত্তর দিলেন আর ডেস্কের দিকে ঘুরে কাজে মন দিলেন।

যাই হোক না কেন, উনি কিন্তু আমাকে অভাবনীয় দয়া দেখিয়েছেন এবং তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমি জানি কিভাবে এটার মর্যাদা দিতে হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, এমন একটা লেখা লিখে তাঁর কাছে নিয়ে যাব, যেটাতে 'কমোডর'কে অবাক করে দেব, যার ফলে উনি একটুও ইতস্তত না করে আমাকে এক গিনি পারিশ্রমিক দেবেন। আমি বাড়ি ফিরে এসে লেখা নিয়ে বসে গেলাম।

এর পরের সন্ধ্যাগুলিতে যখন আটটা প্রায় বাজে আর গ্যাসের আলো জ্বলে গেছে, একটা ব্যাপার নিয়মিতভাবে ঘটতে লাগল।

সারাদিনের খাটনির শেষে যখন আমি একটু হাঁটতে রাস্তায় বেরোতাম, রোজ দেখতাম একটি মহিলা, কালো পোশাক পরা, আমার দরজার ঠিক উল্টোদিকে ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

যখন আমি তার পাশ দিয়ে যেতাম, সে মুখ তুলে আমার যাওয়ার পথে চেয়ে থাকত। আমি দেখতাম যে রোজ সে একই পোশাক পরে থাকত, মুখের ওপর ওড়না ঢাকা থাকত, মুখ ঢেকে বুক পর্যন্ত আর তার হাতে থাকত একটা ছাতা, হাতলে একটা হাতির দাঁতের রিং পরানো। আজ তিনদিন হল রোজ সন্ধ্যায় ওকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। ওকে পার হয়ে চলে গেলে, ও-ও আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে চলে যেত। আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হত আর মনে হত ও বোধহয় আমার জন্যই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে এমন হল যে, আমি ওকে প্রায় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে, ও কারও জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কিনা, আমার সাহায্য দরকার কিনা, অথবা আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পোশাকপরিচ্ছদ খারাপ হলেও ওকে হয়তো আমি অন্ধকার রাস্তায় রক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে একটা অহেতুক ভয় ঢুকল যে, হয়তো এর জন্য আমার কিছু খরচ হতে পারে, এক গ্লাস মদ অথবা গাড়ি ভাড়া, অথচ আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই। পকেটে পয়সা না থাকার দরুণ, আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম, আর তাই ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় ওকে ভাল করে দেখারও সাহস হল না। পেটের মধ্যে আবার খিদে চাগাড় দিয়ে উঠল, গতকাল সন্ধের পর থেকে কিচ্ছু খাওয়া জোটেনি। এটা ঠিক যে, এটা লম্বা সময় নয়। আগে একনাগাড়ে দুতিনদিনও না খেয়ে কাটাতে পেরেছি, কিন্তু ইদানীং অল্পতেই শরীর প্রচণ্ডভাবে খারাপ হয়ে পড়ছে। আগে যে রকম খিদে সহ্য করতে পারতাম, এখন তার চার ভাগের একভাগও সহ্য করতে পারছি না। একদিন না খেয়ে থাকলেই ঝিমিয়ে পড়ছি, আর তার পরে জল খেলেই সমানে বমি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, রাতে শুয়ে সারারাত কাঁপুনি হচ্ছে, দিনে যেমন পড়ে থাকি, হাঁটি, তেমনি পুরো পোশাক পরে শুলেও এ রকম হচ্ছে, ঠাণ্ডায় কাঁপছি আর ঘুমের মধ্যে শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরনো কম্বলটা আর হাওয়া, ঠাণ্ডা আটকাতে পারে না। আর সকালে যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন বাইরের তুষার-বাতাসে নাক বন্ধ হয়ে গেছে, ভাঙা ঘরে বরফ-বাতাস ঢুকে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে ভাবতে থাকি, আমার আগামী লেখাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। যদি একটা মোমবাতিও থাকত, তাহলে সারারাত পরিশ্রম করতে পারতাম। যদি একনাগাড়ে দু'ঘণ্টা লিখে যেতে পারি, তাহলে কালকেই 'কমোডরের' কাছে যেতে পারি।

আর কিছু না ভেবে, সোজা অপল্যান্ড কাফেতে চলে গেলাম আর সেই ব্যাংকের পরিচিত ছেলেটির খোঁজ করলাম, ওর কাছ থেকে মোমবাতি কেনার জন্য এক পেনি ধার করতে। সব কটা ঘরের ভেতর বিনাবাধায় ঘুরলাম, গোটা বারো টেবিল খুঁজলাম, যেখানে লোকেরা বসে গল্প করছে, খাচ্ছে, মদ গিলছে; কাফের পেছন দিকে গেলাম, এমন কি লাল বাতি জ্বলা কোণটাও দেখলাম, কিন্তু আমি যাকে খুঁজছি, তাকে দেখতে পেলাম না।

মনটা ভেঙে গেল, বিরক্তও হলাম। নিজেকে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম, তারপর প্রাসাদের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

এটা কি একটা নারকীয় শয়তানি চক্রান্ত যে, আমার দুঃখ দুর্দশার দিন কখনোই শেষ হবে না? ক্রোধোন্মত্ত লম্বা লম্বা পা ফেলে, কোটের কলার তুলে কান পর্যন্ত ঢেকে, ব্রিচেসের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে আমি চলতে লাগলাম, নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে দিতে। গত সাত আট মাসে কোনোদিন দুঃখ দুর্দশাহীন একটিও ঘন্টা কাটেনি, একটা ছোট্ট সপ্তাহও প্রয়োজনীয় সামান্য খাবারও পাইনি, যাতে শরীর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারি, তার আগেই অভাব আর অনটন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অথচ তার বদলে আমি কী করেছি? আমার সমস্ত দুর্দশার মধ্যেও সৎ পথে, সম্মানের সঙ্গে চলেছি– হাঃ হাঃ, হাঃ, হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্যন্ত সৎ ও সম্মানজনক। ঈশ্বর রক্ষা করুন, আমি কী বোকামিই না করেছি! আর আমি নিজেকে বলতে লাগলাম, একবার হ্যানস পওলির কম্বলটা বন্ধকী দোকানে নিয়ে গিয়ে কী রকম বিবেকের চাবুক খেয়েছিলাম। আমার এই সব সূক্ষ্ম শুভবুদ্ধিগুলির জন্য ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে, রাস্তায় ঘৃণাভরে থুতু ছিটিয়ে, নিজের বোকামির জন্য নিজেকে উপহাস করবার মতো শক্ত ভাষাই খুঁজে পেলাম না। এখন এসব আবার ঘটুক তো। এই মুহূর্তে যদি একটা স্কুলের ছাত্রীর জমানো পয়সা বা এক গরিব বিধবার একমাত্র পেনিটাও পাই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরব। ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করব আর তারপরে সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমোব। এই অবর্ণনীয় কষ্ট যে আমি বিনা কারণে পেয়েছি তার ফলে আমার ধৈর্য শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এখন আমি যে কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত।

প্রাসাদের চারপাশে তিনবার চারবার ঘুরলাম, তারপরে ঠিক করলাম, এইবার বাড়ি যাব; পার্কে আরও একবার ঘুরপাক খেয়ে কার্ল যোহান রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। এখন প্রায় এগারোটা বাজে। রাস্তাগুলো মোটামুটি অন্ধকার, চারিদিকে লোকেরা যাতায়াত করছে, নিঃশব্দে জোড়ায় জোড়ায় অথবা দলে দলে হৈ হৈ করতে করতে। সেই মহাক্ষণ উপস্থিত, যখন রহস্যময় লোক চলাচল পুরো দমে এবং স্ফূর্তি ও অ্যাডভেঞ্চারের ঘন্টা এসে গেছে। ঘাঘরার খসখস, একটা দুটো ছোট্ট, শরীরী হাসি, বুকের ওঠাপড়া, আবেগময়, ঘন শ্বাস এবং অনেক দূরে গ্র্যান্ড হোটেলের কাছ থেকে কারো ডাক 'এমা!' সমস্ত রাস্তাটাই যেন একটা জলাভূমি, যেখান থেকে উষ্ণ বাষ্প উঠে আসছে।

আনমনে পকেটে হাত দিয়ে শিলিং-টিলিং খুঁজলাম। প্রত্যেকটি পথচারীর নড়াচড়ার মধ্যে যে আবেগের আনন্দ-ঘন প্রকাশ, গ্যাস ল্যাম্পগুলোর মৃদু আলো, নিঃশব্দ অন্তঃসত্ত্বা রাত্রি, এই সবই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল, এই বাতাস যার মধ্যে ভরা রয়েছে ফিসফিস কথা, আলিঙ্গন, কাঁপা গলার স্বীকারোক্তি, কিছু দেওয়া, কিছু নেওয়া, অর্ধস্ফুট কথা, চাপা শীৎকার। ব্লমকুইস্টের বাড়ির দরজায় কতকগুলো বিড়াল তারস্বরে প্রেম নিবেদন করছে। আর আমার পকেটে

একটা ফ্লোরিনও নেই! এই যে দুর্দশা, একটা হা ঘরের মতো অসহায়, দারিদ্র্য-কাতর অবস্থা, এই রকম ভিখিরির মতো জীবনের কোনো জবাব নেই। কী অপমান; কী লাঞ্ছনা! আমি আবার ভাবতে লাগলাম, একটা গরিব বিধবার শেষ কপর্দক, একটা স্কুলের ছাত্রের টুপি বা রুমাল, বা একটা ভিখিরির টাকার থলে যেগুলো চুরি করে একটা পুরনো জিনিসের দোকানে নিয়ে গিয়ে বিনা দ্বিধায় বিক্রি করে দিতাম আর টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যেতাম।

নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যে সব পথচারীরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের খুঁত খুঁজে বার করতে লাগলাম। তাদের দিকে ঘৃণাভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অপমানকরভাবে তাকাতে লাগলাম। এই অল্পে সন্তুষ্ট, চকোলেট খাওয়া ছাত্রগুলো, যারা কোনো দর্জি মেয়ের পাঁজরে খোঁচা মেরে ভাবে যে, ওরা সত্যিকারের শহুরে স্টাইলে নারী-সঙ্গ করছে! এই অল্পবয়েসি ছোকরাগুলো, ব্যাংক কেরানি, ব্যবসায়ী.... যারা কোনো নাবিকের বৌকেও বাগে পেলে ছেড়ে দেবে না। ভরা-বুকের মেয়েগুলো, যেগুলো এক গ্লাস বিয়ারের জন্য প্রথম দরজাতেই শুয়ে পড়বে। কী পাজি মেয়েগুলো! কোনো রাত প্রহরী বা আস্তাবলের সহিসের সাথে কাল রাতে জড়াজড়ি করে যাদের বুকের পাশটা এখনো গরম! সিংহাসন খালি পড়ে আছে, নতুনদের জন্য সব সময়েই উন্মুক্ত। এস, চড়ে বস!

আমি ফুটপাথের ওপর দিয়ে বহুদূরে থুতু ছুঁড়লাম, কারো গায়ে পড়ল কিনা, বয়েই গেল। আমার প্রচণ্ড ক্রোধ হল। এইসব লোকগুলোর ওপর ঘৃণা হল, যারা একজন অপরজনের সঙ্গে দুচারটে কথা বলেই আমার চোখের সামনে জোড়ায় জোড়ায় চলে যাচ্ছে। আমি মাথা উঁচু করে নিজের খোঁয়াড় পরিষ্কার রাখার জন্য আশীর্বাদ-ধন্য বলে অনুভব করলাম। পার্লামেন্ট প্লেস-এ একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, যে আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'শুভরাত্রি!'

'শুভরাত্রি!' ও জবাব দিল।

হুম! ও এত রাত করে বাইরে রয়েছে কেন? কার্ল যোহানে রাতের এই সময়ে একটা যুবতী মেয়ের থাকাটা একটু ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে না? সত্যিই না? হ্যাঁ; কিন্তু কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসেনি? ওর সাথে অশালীন ব্যবহার করেনি? মানে, বলতে চাইছি, কেউ সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়নি?

মেয়েটা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল, আমার মুখটা ভাল করে দেখল, বুঝতে চাইছে আমি কী বলতে চাইছি। তারপর ঝট করে আমার বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এবং আমরা গেলাম!'

আমি ওর সঙ্গে হেঁটে চললাম। কিন্তু গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা পার হয়ে কয়েক পা এসে আমি থেমে গেলাম, তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'শোন, প্রিয়ে, আমার কাছে একটা ফার্দিংও নেই!' এই বলে আমি ফের হাঁটা শুরু করলাম। প্রথমে তো আমাকে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপর যখন আমার সবকটা পকেট ঘেঁটে কিছুই পেল না, তখন বিরক্ত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে গালাগালি দিল।

'শুভরাত্রি!' আমি বললাম।

'এক মিনিট দাঁড়াও,' ও ডাকল, 'তুমি যে চশমাটা পরে আছ, ওটা সোনার না?'

'না।'

'তাহলে যমের বাড়ি যাও!' আমি আবার হাঁটা দিলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরে ও দৌড়তে দৌড়তে আমার পেছনে এল আর আমাকে ডেকে বলল, 'তুমি কিন্তু এমনিই আমার সঙ্গে আসতে পার!'

একটা হতভাগ্য রাস্তার বেশ্যার কাছ থেকে এই ডাক পেয়ে আমার অত্যন্ত অপমানবোধ হল, আমি বললাম, 'না।' তাছাড়া রাত্রি বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমার আবার একটা মিটিং আছে। আর ওর পক্ষে এই ধরনের স্বার্থত্যাগ করা সম্ভবপর নয়।

'হ্যাঁ; কিন্তু তবু আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে এস।'

'কিন্তু আমি এই রকম ভাবে তোমার সঙ্গে যেতে পারি না।'

'ওঃ নিশ্চয়ই; তুমি তো অন্য কারো সঙ্গে যেতে চাইছিলে।'

'না।' আমি বললাম।

কিন্তু এই অনন্যা রাস্তার মেয়েটার সামনে আমার যে শোচনীয় অবস্থা, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন আর তাই নিজের মুখরক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম।

'কী নাম তোমার?' আমি জানতে চাইলাম। 'মেরী? ঠিক আছে মেরী, এবার শোন!' এবং আমি কেন ওর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলাম, সেটা বোঝাতে লাগলাম। আমি যতই বলতে থাকি, মেয়েটা ততই অবাক হয়ে যায়। ও কি ভেবেছিল যে আমি তাদেরই মতো একজন, যারা রাত্তিরবেলা রাস্তায় অল্পবয়েসী মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়? ও কি আমার সম্বন্ধে এত খারাপ কথা ভেবেছিল? আমি কি প্রথম থেকেই ওকে বাজে বাজে কথা বলেছি? যদি কারোর কোনো বদ্ মতলব থাকে, তারা কি আমার মতো ব্যবহার করবে? অল্প কথায় বলতে গেলে, আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক পা হেঁটেছি শুধু দেখতে যে, ও কতদূর যেতে পারে। আর আমার নাম হল, অমুক, যাজক অমুক।

'শুভরাত্রি; চলে যাও এবং আর পাপ করো না।' এই বলে আমি ওর কাছ থেকে চলে এলাম।

খুশি খুশি মেজাজে আনন্দে হাত ঘষতে ঘষতে স্বগতোক্তি করলাম, 'ভালো কাজ করে বেড়ালে কী আনন্দই না হয়!' হয়তো এই অধঃপতিত মেয়েটিকে ওর সারা জীবনের জন্য একটা ওপরে উঠবার ধাক্কা দিলাম; ওকে একটা ধ্বংসের হাত থেকে বরাবরের জন্য বাঁচালাম, আর ও পরে যখন এসব কথা ভাববার অবকাশ পাবে, তখন ব্যাপারটা উপলব্ধি করবে; ওর মৃত্যুর সময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমাকে স্মরণ করবে। আঃ, সত্যি কথা বলতে গেলে, সৎ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সঠিক কাজ করলে তার ফল পাওয়া যায়।

আমার মানসিক শক্তি যেন বুদবুদের মতো ফুটছে। নিজেকে খুব তেজোময়, সাহসী মনে হচ্ছে, যেন যাই কিছু আসুক না কেন, তার মোকাবেলা করতে পারব। যদি একটা মোমবাতি থাকত, হয়তো আমার লেখাটা সম্পূর্ণ করতে পারতাম। আমি

হাতে দরজার চাবির গোছা ঝনঝন করতে করতে হেঁটে চললাম, গুনগুন করতে লাগলাম, শিস দিতে লাগলাম আর কীভাবে একটা মোমবাতি জোগাড় করা যায়, তাই চিন্তা করতে লাগলাম। অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমার লেখার সরঞ্জাম নিয়ে রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় বসতে হবে। দরজা খুলে ওপরে উঠলাম কাগজপত্র আনতে। নিচে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তার আলোর তলায় বসলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। খালি নিচে টারগেডের দিক থেকে কোনো পুলিশের সিপাই-র বুটের ভারী আওয়াজ শুনতে পেলাম আর অনেক দূরে সেন্ট হ্যানস-এর পাহাড়ের দিকটায় একটা কুকুরের ডাক। আমাকে বিরক্ত করবার কেউ নেই। আমি কোটের কলার তুলে কান ঢেকে সর্বশক্তি দিয়ে চিন্তাকে সংহত করলাম।

এই ছোট্ট রচনাটির একটা মনোমতো সমাপ্তি ঘটাতে পারলে খুব ভালো হয়। একটা কঠিন জায়গায় এসে আটকে গেছি, যেখান থেকে ধীরে ধীরে একটা কোনো টাটকা, তাজা মোড় ঘুরে, হাল্কা, মৃদু গড়ানে উপসংহার আসবে, একটা লম্বা গুঞ্জরণ, শেষ হবে একটা সাহসী, বন্দুকের গুলির চমকে দেওয়া শব্দের মতো অথবা পাহাড় থেকে তুষার ধসের শব্দের মতো, ব্যস। কিন্তু বাক্যগুলো মাথায় আসছেই না। শুরু থেকে লেখাটা আবার পড়লাম; প্রত্যেকটা বাক্য জোরে জোরে পড়লাম, তবু, নিজের চিন্তাকে কিছুতেই সংহত করতে পারছি না, এই চমকে দেওয়া উপসংহার কিছুতেই মাথায় আসছে না। মাঝখান থেকে এই হল যে, আমি যতক্ষণ এই চিন্তায় ব্যস্ত, ততক্ষণে পুলিশ সিপাইজী এসে আমার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেল আর আমার মেজাজটাই খিঁচড়ে গেল। আচ্ছা, 'কমোডর'-এর জন্য একটা রচনার উপযুক্ত উপসংহার খোঁজার জন্য যদি আমি এখানে দাঁড়িয়েই থাকি, তাতে ওর কী যায় আসে? ঈশ্বর! যতই চেষ্টা করি না কেন, জলের ওপর মাথাটা তুলে রাখা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি ওখানে এক ঘণ্টা রইলাম। সিপাই চলে গেল। ঠাণ্ডাটা জোর পড়েছে, ঠায় একভাবে থাকা যাচ্ছে না। এই অসফল প্রচেষ্টায় হতোদ্যম এবং নিরুৎসাহ হয়ে দরজা খুলে নিজের ঘরে উঠে এলাম।

ওপরেও ঠাণ্ডা বেশ, আর ঘুটঘুটে অন্ধকারে জানালাটা প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না। হাত বাড়িয়ে ঘষটে ঘষটে বিছানার দিকে এগোলাম, জুতা খুললাম আর হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পা গরম করতে লাগলাম। তারপরে অনেক দিন ধরে যা করে আসছি, তেমনি পুরো পোশাক পরেই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আলো ফুটতেই বিছানায় উঠে লেখাটা নিয়ে বসে পড়লাম। এইভাবে দুপুর অবধি বসে রইলাম। ততক্ষণে দশ লাইন, বড়ো জোর কুড়ি লাইন লিখতে পেরেছি, কিন্তু সমাপ্তি তখনও খুঁজে পাইনি।

উঠে জুতা পরে মেঝেতে এদিক থেকে ওদিক হাঁটতে লাগলাম শরীর গরম রাখতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, বরফ পড়ছে। উঠোনে পাথরের মেঝের ওপর মোটা হয়ে বরফ জমেছে, পাম্পের ওপর পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে। আমি ঘরের মধ্যে হাঁটতে থাকলাম, উদ্দেশ্যহীন, কখনও নখ দিয়ে দেওয়ালে আঁচড়াচ্ছি, কখনও

দরজায় মাথা রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছি, মেঝেতে আঙুল ঠুকছি, বিনা কারণে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছি, ভাবখানা এমন যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে ব্যস্ত আছি; আর সারাক্ষণ জোরে জোরে আপন মনে বকবক করে চলেছি, যাতে নিজের গলার আওয়াজ শুনতে পারি।

কিন্তু হে মহান ঈশ্বর, এটা নিশ্চয়ই পাগলামো! এবং তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি আগের মতোই করে যেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ, প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে নিজেকে শক্ত করলাম, ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সুস্থ মানুষের মতো করে তোলার চেষ্টা করলাম। এর শেষ করতেই হবে। একটা কাঠের কুচি চিবোতে চিবোতে ঠিক করলাম, লেখাটা আবার শুরু করতে হবে।

অনেক কষ্টে দুটো বাক্য মনের মধ্যে তৈরি হল, গোটা কুড়ি দুর্বল শব্দ মাথার ভেতর ঘোরাঘুরি করল। আমি থেমে গেলাম, মাথাটা একদম খালি; আর পরিশ্রম করার মতো অবস্থায় আমি নেই। আর যেহেতু আমার আর লিখবার কোনো ক্ষমতাই নেই, আমি আমার অসমাপ্ত লেখাটার শেষ কথাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আর ওই অদ্ভুত, ভঙ্গুর অক্ষরগুলো যেন শুঁয়োওয়ালা গুটিগুটি-হাঁটা পোকার মতো কাগজ থেকে উঠে আসতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত আমি মাথামুণ্ড কিচ্ছু খুঁজে পেলাম না লেখাটার মধ্যে। আমার আর কিছু চিন্তা করবার ক্ষমতাই নেই।

সময় বয়ে যাচ্ছে। রাস্তার গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। জেন্‌স ওলাজ ঘোড়াগুলোকে পরিচর্যা করছে, কথা বলছে, নিচের আস্তাবল থেকে সেই আওয়াজ ওপরে উঠে আসছে। আমি সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছি, এছাড়া আর কিছু করার কোনো চেষ্টাই করছি না। বুকের ভেতর দারুণ কষ্ট। করুণ অবস্থা। সন্ধ্যা নামছে, আমি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছি, বিমর্ষ হয়ে পড়ছি; আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আঙুলগুলো গরম করার জন্য চুলের ভেতর দিকে আঙুল চালাচ্ছি। সামনে, পেছনে, আড়াআড়ি, আর গোছা গোছা চুল উঠে আসছে, বালিশে পড়ছে। তখন এ ব্যাপারে কিছু ভাবিনি, যেন এটা আমার কোনো ব্যাপার নয়। আমার মাথায় এখনও প্রচুর চুল আছে। আমি আরেকবার চেষ্টা করলাম নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে এই অদ্ভুত ঝিমুনি ভাবটা থেকে মুক্তি পেতে, যেটা আমাকে ঘন কুয়াশার মতো জড়িয়ে রয়েছে। আমি উঠে বসে দুই হাত দিয়ে নিজের হাঁটু দুটো চাপড়ালাম, আমার কষ্টকর বুকের ব্যথা সত্ত্বেও যতটা পারা যায়, জোরে জোরে হাসলাম, কিন্তু পারলাম না, একেবারে জড়িয়েমড়িয়ে পড়ে গেলাম। অর্থহীন। আমি মারা যাচ্ছি, কেউ সাহায্য করার নেই, চোখ দুটো খোলা, সোজা ছাদের দিকে দৃষ্টি। অনেকক্ষণ পরে আমি মুখে আঙুল ঢুকিয়ে চুষতে চেষ্টা করলাম। আমার মাথায় কিছু নড়ে উঠল, একটা চিন্তা, যেটা একেবারে মগজ ফুঁড়ে ঢুকে গেছে, একটা বদ্ধ পাগলের খেয়াল।

যদি আমি আঙুলটা কামড়ে খাই? এক মুহূর্ত না ভেবে আমি চোখ বন্ধ করে আঙুলে দাঁত বসালাম।

স্প্রিং-এর মতো ছিটকে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ জাগ্রত হলাম। আঙুল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, চেটে নিলাম। বেশি ব্যথা করছে না, ক্ষতটাও বেশি বড় নয়। কিন্তু এই এক ধাক্কায় আমার হুঁশ ফিরে এসেছে। মাথা নেড়ে জানালার কাছে গেলাম। এক টুকরো ন্যাকড়া খুঁজে নিয়ে কাটা জায়গাটায় জড়িয়ে নিলাম। দাঁড়িয়ে এই সব করতে করতে চোখে জল এসে গেল। আস্তে আস্তে কাঁদতে লাগলাম। এই হতভাগ্য রোগা আঙুলটা দেখলেও করুণা হয়। হে স্বর্গবাসী ঈশ্বর! আমাকে কী দুরবস্থায় ফেলেছ! বিষণ্ণতা বেড়ে চলেছে। যদি একটা মোমবাতি থাকত, হয়তো লেখাটার পরিণতিটা এই সন্ধেতেই ঠিক মতো বানাতে পারতাম। মাথাটা আর একবার পরিষ্কার হয়ে গেল। মাথায় ভাবনা চিন্তা যথারীতি আসছে যাচ্ছে, বিশেষ কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা আগেও যেমন প্রচণ্ড খিদের কষ্ট ছিল, এখন যেন ততটা টের পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আগামীকাল পর্যন্ত ঠিকমতো থাকতে পারব। মুদি দোকানে গিয়ে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে হয়তো একটা মোমবাতি ধারে পাওয়া যাবে, আমাকে তো ওরা ভালো করেই চেনে; আগে যখন অবস্থা ভালো ছিল, হাতে কিছু থাকলে অনেক পাউরুটি ওই দোকান থেকে কিনেছি। আমার সততার জন্য ওখান থেকে একটা মোমবাতি জোগাড় করতে পারব, কোনো সন্দেহ নেই। আর তাই কতদিন বাদে এই প্রথম পোশাকটা ব্রাশ দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে, অন্ধকারে যতটা সম্ভব, কোটের কলার থেকে ঝরেপড়া চুলগুলো পরিষ্কার করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

বাইরে রাস্তায় এসে মনে হল, একটা রুটি চাওয়াটাই বোধ হয় জরুরি। আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। (কোনো কারণেই নয়) শেষ পর্যন্ত নিজেকে বললাম; দুর্ভাগ্যবশত এখন আমার খাবার পেটে ধরে রাখার মতো শারীরিক অবস্থা নয়। সেই পুরনো গল্পই আবার হবে, ভুলভাল দেখা, আর উন্মাদের খেয়াল। আমার লেখাটাও শেষ হবে না আর 'কমোডর' আমাকে ভুলে যাবার আগেই ওঁর কাছে যেতে হবে। কোনো কারণেই নয়! আমি মোমবাতি কেনারই সিদ্ধান্ত নিলাম। তারপর দোকানে ঢুকলাম।

কাউন্টারে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করছেন। ওঁর সামনে নানা রকম কাগজে মোড়া কতকগুলো ছোট ছোট পার্সেল পড়ে রয়েছে। দোকানদার ছেলেটা আমাকে চেনে এবং আমি সাধারণত কী কিনি, তা জানে, আর তাই মহিলাকে ছেড়ে বিনাবাক্যে একটা পাউরুটি কাগজে মুড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'না না, ধন্যবাদ, আসলে আজ সন্ধেতে আমার একটা মোমবাতির দরকার ছিল;' আমি বললাম, আমি খুব আস্তে নম্রভাবে কথাটা বললাম, যাতে ও বিরক্ত না হয় আর আমার কাজটাও নষ্ট না হয়।

আমার কথা শুনে ও একটু ধন্দে পড়ল। আমার এই অপ্রত্যাশিত কথায় ও রেগে গেল। এই প্রথম আমি ওর কাছে পাউরুটি ছাড়া অন্য জিনিস চাইলাম।

'আচ্ছা, তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে,' ও শেষ পর্যন্ত বলল আর মহিলার পার্সেলগুলোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মহিলা তার কেনা জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে ওকে একটা ফ্লোরিন দিলেন, তারপর খুচরা ফেরত নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। এখন দোকানদার ছেলেটা আর আমি একা। ও বলল, 'তাহলে আপনি মোমবাতি চাইলেন, তাই না?' ও একটা প্যাকেট ছিঁড়ে একটা মোমবাতি আমায় দিল। ও আমার দিকে তাকিয়ে, আমি ওর দিকে। আমি তো মুখ দিয়ে আমার অনুরোধটা বার করতেই পারছি না।

'ও হ্যাঁ, সত্যিই তো; আপনি তো দামটা দিলেন,' ও হঠাৎ বলে উঠল। ও জোর করে বলল যে, আমি পয়সা দিয়েছি। আমি ওর সব কথা শুনতে পাচ্ছি আর ও ক্যাশবাক্স থেকে পয়সা গুনতে শুরু করল, সব চকচকে রূপার মুদ্রা, একটার পর একটা। ও আমাকে এক গিনির বদ্‌লি খুচরা ফেরত দিল।

'ঠিক আছে, আসুন,' ও বলল।

আমি এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে মুদ্রাগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। পুরো বুঝতে পারছি, কোথাও কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। আমি ভাবছি না, কিছুই ভাবছি না, খালি চোখের সামনে পড়ে থাকা এই চকচকে ধনদৌলতের দিকে তাকিয়ে দমবন্ধ হয়ে গেছি– কিছুক্ষণ বাদে যন্ত্রের মতো টাকাগুলো তুলে নিলাম।

কাউন্টারের এ পাশে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, বিস্ময়াবিষ্ট, বোবা, অসাড়। দরজার দিকে এক পা বাড়িয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম। দেওয়ালে একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে রইলাম, যেখানে একটা চামড়ার কলারের সঙ্গে একটা ছোট্ট ঘণ্টি আটকানো রয়েছে, আর তলায় রয়েছে এক বাণ্ডিল সুতা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐগুলোর দিকে চেয়ে আছি।

দোকানের ছেলেটা আমাকে অলসভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবল, আমি বুঝি একটু গল্প-সল্প করতে চাই, তাই কাউন্টারে ছড়ানো কাগজের টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'মনে হচ্ছে, এবার শীত এসেই পড়ল!'

'হুম! হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিলাম; 'মনে হচ্ছে, সত্যিই শীত এসে গেল,' একটু পরে আবার বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, খুব বেশি দেরি হয়নি।'

আমি কী বললাম শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে প্রতিটি কথাই অন্য কেউ বলছে। আমি একদম না ভেবে, আপনা থেকে, নিজের সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই কথাগুলো বললাম।

'ও! আপনি তাই মনে করেন?' ছেলেটি বলল।

আমি টাকা পয়সাসমেত হাতের মুঠো পকেটে ভরে, দরজার হাতল ঘুরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম যে, আমি শুভরাত্রি বলেছি এবং দোকানের ছেলেটাও বলেছে।

দোকান থেকে কয়েক পা এগিয়েছি, দোকানের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল আর ছেলেটা বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকল। আমি একদম অবাক হলাম না, ঘুরে দাঁড়ালাম, মনে কোনো ভয় নেই; আমি কেবলমাত্র টাকাটা হাতে নিয়েছি, ফেরত দেবার জন্য প্রস্তুত।

'মাপ করবেন, আপনি আপনার মোমবাতিটা নিতে ভুলে গেছেন,' ছেলেটা বলল।

'অ! ধন্যবাদ,' আমি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ,' এবং আমি মোমবাতিটা হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম।

আমার প্রথম সজ্ঞান চিন্তা হল টাকাটা সম্বন্ধে। একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে টাকটা গুনলাম। হাতে নিয়ে ওজনটা দেখলাম, আর হাসলাম। তাহলে এত কিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটা সাহায্য এল, একটা অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য, বিশাল সাহায্য, যা অনেক দিন ধরে চলবে। আবার টাকা সমেত হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে চলতে লাগলাম।

গ্রান্ড স্ট্রিটে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায়, চুপচাপ চিন্তা করতে লাগলাম, এত তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া উচিত হবে কিনা। ভেতর থেকে ছুরি-কাঁটা, প্লেটের শব্দ ভেসে আসছে, তার সাথে মাংস কাটার শব্দ। লোভ সম্বরণ করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল, আমি ভেতরে ঢুকলাম।

'এক প্লেট মাংস,' আমি বললাম।

'একটা মাংস!' ওয়েটার মেয়েটা লিফ্‌টের দরজায় মুখ বাড়িয়ে নিচে খবর পাঠাল।

আমি দরজার পাশেই একটা ছোট টেবিলে বসে পড়লাম, একটু অপেক্ষা করতেই হবে। যেখানে বসেছিলাম, জায়গাটা একটু অন্ধকার মতো এবং মোটামুটি লুকিয়ে থাকার মতো। খুব গুরুতর চিন্তার প্রয়োজন। মাঝে মাঝেই ওয়েটার মেয়েটা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আমার প্রথম অসৎ কাজটা প্রমাণ হয়ে গেল, আমার প্রথম চুরি। এর সঙ্গে তুলনায়, আমার আগেকার অন্যান্য ঘটনাগুলো কিছুই না, এটাই আমার প্রথম অধঃপতন। কিছু করার নেই। পরে সুবিধা মতো দোকানদার ছেলেটার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যাবে। এটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া আমি তো আর অন্যান্য লোকদের চেয়ে বেশি সম্মানজনকভাবে জীবন কাটাতে যাচ্ছি না!

'মাংসটা তাড়াতাড়ি আসবে কি?'

'হ্যাঁ; এক্ষুনি,' ওয়েটার মেয়েটা দরজাটা খুলে নিচে রান্নাঘরের দিকে তাকাল।

কিন্তু যদি ঘটনাটা কোনোদিন প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ে? যদি দোকানদার ছেলেটার সন্দেহ হয় আর ও যদি ওই রুটি দেওয়ার ব্যাপারটা আর মহিলার ফ্লোরিন দিয়ে খুচরা নেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে? অসম্ভব নয় যে ও কোনোদিন এটা আবিষ্কার করবেই, হয়তো পরে যেদিন আমি দোকানে যাব, তখনই। হায় ঈশ্বর! ... আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

'এই যে,' ওয়েটার মেয়েটা মাংসের প্লেটটা টেবিলের ওপর রেখে নরম করে বলল,

'এখানটায় বড় অন্ধকার, অন্য একটা ঘরে যাবেন কি?'

'না, ধন্যবাদ; এখানেই বেশ আছি,' আমি জবাব দিলাম; ওর নম্রতা আমাকে স্পর্শ করল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই মাংসের দামটা দিয়ে দিলাম, বাদবাকি খুচরাটা ওর

হাতে দিয়ে আঙুলগুলো ভাঁজ করে দিলাম। ও হাসল, আর আমি চোখে জল নিয়ে মজা করে বললাম, 'এই যে, বাকি পয়সাটা দিয়ে একটা খামার কিনে নিও, স্বাগত।'

আমি খেতে শুরু করলাম, খেতে খেতে ক্রমাগত লোভ বাড়তে লাগল, গোটা গোটা টুকরো না চিবিয়েই গিলে ফেললাম, প্রত্যেক গ্রাস জন্তুর মতো খেতে লাগলাম, একটা নরমাংসভুকের মতো দাঁত দিয়ে টেনে মাংস ছিঁড়তে লাগলাম।

ওয়েটার মেয়েটা আবার এল। 'আপনি কি কিছু পানীয় নেবেন?' ও জিজ্ঞেস করল, আমার দিকে একটু ঝুঁকে। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও খুব নিচু গলায়, লজ্জা লজ্জা ভাবে, চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মানে, এক গ্লাস মদ বা যা আপনার ইচ্ছা... আমার তরফ থেকে.... মানে, পয়সা লাগবে না... যদি আপনি চান...'

'না, না; অনেক ধন্যবাদ' আমি বললাম, 'এখন নয়; আমি পরে আবার আসব।' ও পিছিয়ে গিয়ে একটা ডেস্কে বসে পড়ল। ওর মাথাটা কেবল চোখে পড়ছে। একটা অনবদ্য প্রাণী।

খাওয়া শেষ করেই দরজায় এসে গেছি। ইতিমধ্যেই বমি পাচ্ছে। ওয়েটার মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। আলোর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছি, অল্পবয়েসি মেয়েটা যাতে আমাকে স্পষ্ট করে না দেখে ফেলে, ও এখনও পর্যন্ত আমার দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখেনি। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে এলাম।

পেটের ভেতর খাবারটা অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে, বেশিক্ষণ পেটে ধরে রাখতে পারব না মনে হচ্ছে। হাঁটার পথে প্রতিটি অন্ধকার কোণে একটু একটু পেট খালি করতে হবে। এই বমি বমি ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, এটা মনে হচ্ছে আমাকে ফোঁপরা করে দেবে, হাত মুঠিয়ে এটাকে চাপবার চেষ্টা করছি। রাস্তায় পা ঠুকছি, যখনই পেট থেকে মুখে এসে যাচ্ছে, অমনি আবার গিলে নিচ্ছি। সব বৃথা। শেষ পর্যন্ত একটা দরজার কোণ ঘেঁষে, দাঁড়িয়ে দুমড়ে মুচড়ে, মাথা নিচু করে হড় হড় করে বমি করলাম, দুচোখ থেকে অবিরত জল বেরিয়ে আসছে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। মনটা তেতো হয়ে গেল, কাঁদতে কাঁদতে পথ হাঁটতে লাগলাম... সেই নিষ্ঠুর শক্তি, যে আমাকে এত অত্যাচার করছে, সে যেই হোক না কেন, তাকে আমি অভিসম্পাত করতে লাগলাম, আমার ওপর এই কদর্য অত্যাচারের জন্য তাকে আমি নরকের আগুনে চিরকাল পুড়বার জন্য শাপ দিলাম।

একটা লোক একটা দোকানের জানালা দিয়ে কিছু দেখছিল, আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোনো লোক অনেকদিন অভুক্ত উপোসী থাকে, তাহলে তাকে কী খেতে দেওয়া উচিত। এটা জীবন মরণের প্রশ্ন, আমি বললাম, সে তো পেটে মাংস অব্দি রাখতে পারছে না।

'শুনেছি, এসব ক্ষেত্রে দুধ দেওয়া ভাল– গরম দুধ,' লোকটা অবাক হয়ে জবাব দিল, 'আপনি কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ' আমি বললাম, 'গরম দুধের মতলবটা খুব খারাপ হবে না,' আর চলে এলাম।

যেতে যেতে প্রথম যে কাফেটা পড়ল, তাতে ঢুকে গরম দুধ চাইলাম। দুধটা নিয়ে গরম গরম খেয়ে ফেললাম। লোভীর মতো গিলে ফেললাম, শেষ ফোঁটা পর্যন্ত, তারপর পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমার বাড়ির দরজার বাইরে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে একদম আলোর ঠিক নিচে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে অনেক দূর থেকেই দেখতে পেলাম- সেই কালো পোশাক পরা মহিলাটি। অন্যান্য সন্ধ্যায় যে কালো পোশাক পরা মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে, সেই মহিলা। কোনো ভুল নেই, আজ নিয়ে চতুর্থবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, একদম চুপচাপ, নড়নচড়ন নেই। আমার এমন অদ্ভুত লাগল যে, আমার হাঁটার গতি ধীর হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো ঠিক মতোই কাজ করছে, কিন্তু আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছি; আর এই শেষ খাবারটা খেয়ে আমার স্নায়ুও টনটনে হয়ে আছে। যথারীতি ওর পাশ দিয়ে চলে এলাম, প্রায় দরজায় পৌঁছে ঢোকার মুখেই থেমে গেলাম। হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল মাথায়। ঘুরে, সোজা মহিলার কাছে পৌঁছে গেলাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে বললাম, 'শুভসন্ধ্যা।' 'শুভ সন্ধ্যা'। সেও বলল।

মাপ করবেন, আপনি কি কিছু খুঁজছেন? আগেও আপনাকে দেখেছি। কোনো সাহায্য করতে পারি কি? মাপ করবেন, আপনার কাছে এসব কথা জানতে চাইছি।

হ্যাঁ, সত্যিই ঠিক মতো জানে না...

এই দরজার ওপাশে কেবল তিন চারটে ঘোড়া আর আমি থাকি; আসলে এটা একটা আস্তাবল আর কেটলি মিস্ত্রির কারখানা... যদি এখানে কাউকে খুঁজতে আসেন তো, মনে হয় আপনার ভুল হচ্ছে।

এত কথা শোনার পর সে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'আমি কাউকে খুঁজছি না। আমি এখানে শুধু দাঁড়িয়ে আছি; একটা খেয়াল। আমি...' সে থেমে গেল।

তাই! তার মানে ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, একটা খেয়ালের জন্য?

এটা একটু বেখাপ্পা। আমি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এবং আরো বেশি বেশি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, একটু সাহসী হওয়া যাক। পকেটের মধ্যে পয়সাগুলো ঝনঝন করিয়ে সোজা বললাম, চল, কোথাও বসে এক গ্লাস মদ খাওয়া যাক, শীত এসে গেছে, হাঃ হাঃ। ... বেশি সময় লাগবে না... কি, রাজি...

ও, না, ধন্যবাদ; ওর পক্ষে সম্ভব নয়। না! তাহলে আমি কি ওর সঙ্গে একটু হাঁটতে পারি? অন্ধকার হয়ে গেছে, বাড়ি যেতে হবে, এত দেরি হয়ে গেছে, কার্ল যোহান রাস্তা ধরে হাঁটতে ভয় ভয় করবে।

আমরা হেঁটে চললাম। ও আমার ডান পাশে। একটা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি আমায় গ্রাস করল। একটা অল্পবয়েসি মেয়ের পাশে রয়েছি। সমস্ত পথ আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি। ওর চুলের সুঘ্রাণ; ওর শরীর থেকে যে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে; মেয়েদের শরীর থেকে যে সুগন্ধ বেরোয়; যতবার ও আমার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে, ততবারই ওর সুমিষ্ট নিঃশ্বাস,– এই সমস্ত কিছু কোনো বাধা না মেনে আমার সমগ্র অস্তিত্বে ঢুকে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওর ওড়নার আড়ালে একটা পুরন্ত, একটু ফ্যাকাশে মুখের আভাস পেয়েছি আর ওর উন্নত বক্ষদেশ, যা ওর কোটের ওপর দিয়ে বঙ্কিম ভঙ্গিমায় উদ্ধত হয়ে আছে। ওর কোটের আর ওড়নার তলায় লুকোনো সৌন্দর্য যেটা আমি ভাবছি, সেটার ভাবনা আমাকে কোনো কারণ ছাড়াই বোকার মতো সুখী করে তুলছে। আমি আর থাকতে পারলাম না, ওকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। ওর কাঁধে আঙুল বুলিয়ে বোকার মতো হাসলাম।

'তুমি কি অদ্ভুত!' আমি বললাম।

'আমি? কী রকম?'

মানে প্রথমত, ওর এই যে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, কোনো কারণ ছাড়াই, কেবল খেয়ালের বশে একটা আস্তাবলের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যেস...

ও, ঠিক আছে, এ রকম করার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে; তাছাড়া ও তো বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা পছন্দ করে; ওর এটা বরাবরই ভাল লাগে। আমি কি রাত বারোটার আগে বিছানায় শোয়া পছন্দ করি?

আমি? যদি আমি পৃথিবীতে কোনো জিনিস ঘৃণা করি, তাহল রাত বারোটার আগে বিছানায় যাওয়া।

আ! দেখেছ? ও-ও তাহলে একই রকম; সন্ধ্যাবেলায় এইটুকু বেড়ানোয় তো কোনো ক্ষতি নেই। ও তো সেন্ট ওলাভস প্লেস-এ থাকে।

'ইয়ালাজালি,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'মাপ করবেন?'

'আমি শুধু বললাম, ইয়ালাজালি... ঠিক আছে, বলে যাও...'

ও সেন্ট ওলাভস প্লেস-এ থাকে, মায়ের সঙ্গে একা; মায়ের সঙ্গে কথা বলা যায় না, কারণ মা কানে কালা। কাজেই একটু যদি ঘুরতে বেরোয়, তো দোষের কি আছে?

'না, বিন্দু মাত্র না,' আমি বললাম।

'না? তাহলে এত কথা কেন?' ওর গলা শুনে বুঝলাম ও হাসছে।

ওর কোনো বোন নেই?

হ্যাঁ আছে, বড় বোন। কিন্তু আমি জানলাম কি করে? বড় বোন তো হামবুর্গে গেছে।

'হালে?'

'হ্যাঁ, পাঁচ সপ্তাহ আগে।' কার কাছ থেকে শুনেছি যে ওর একটা বোন আছে?

আমি শুনিনি, খালি জানতে চেয়েছি।

আমরা আবার চুপচাপ। একটা লোক পাশ দিয়ে গেল, বগলে এক জোড়া জুতা; এছাড়া যতদূর চোখ যায় রাস্তা একেবারে ফাঁকা। দূরে টিভোলিতে, এক সারি রঙিন আলো জ্বলছে। বরফ পড়ছে না। আকাশ পরিষ্কার।

'হা ঈশ্বর! আপনি ওভার কোট পরেননি, শীতে জমে যাচ্ছেন না?' হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জানতে চাইল।

ওকে বলব, আমার ওভার কোট নেই কেন? আমার এই দুর্দশার কথা বলে ওকে ভয় পাইয়ে দেব? শেষে বলা, আর আগেই বলে দেয়া, একই ব্যাপার! তবু আরো কিছুক্ষণ ওকে না জানিয়ে পাশাপাশি হাঁটার এই আনন্দ উপভোগ করি না কেন? তাই আমি মিথ্যা বললাম, 'না, মোটেই না;' এবং বিষয়টা ঘোরানোর জন্য বললাম, 'টিভোলিতে চিড়িয়াখানাটা দেখেছ?'

'না,' ও বলল, 'ওখানে কী দেখার আছে?'

সত্যিই যদি ও ওখানে যেতে চায়? ওই উজ্জ্বল আলো, অত লোকের মধ্যে। ওখানে গেলে তো ও আমার রোগা মুখখানা আর এই ময়লা পোশাক দেখে লজ্জা পেয়ে যাবে, হয়তো এটাও ওর চোখে পড়বে যে আমি ওয়েস্ট কোট পরিনি...।

'আরে না না,' আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'ওখানে দেখার মতো বিশেষ কিছু নেই।'

অনেক কথাই মাথায় ভীড় করে এল আর আমি বলতে শুরু করলাম। ওই ছোট্ট চিড়িয়াখানায় কী আশা করা যায়? খাঁচায় ভরা পশু দেখতে ভালো লাগে না। পশুগুলো জানে যে, লোকেরা, শয়ে শয়ে কৌতূহলী চোখ, ওদের দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। না, আমি সেই রকম পশু দেখতে চাই, যারা জানবেই না যে, কেউ তাদের দেখছে। যে পশুরা বনে নিজেদের গর্তে, গুহায়, বাসায় থাকে, আর অলস সবুজ চোখগুলো জ্বলজ্বল করে, থাবা চাটে, আর গর্জন করে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে সব জন্তু জানোয়ার তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য অবস্থায় থাকে, তাদের ভয়ংকর স্বভাব, তাদের হিংস্রতা, তারও মাধুর্য আছে। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের গভীরে তাদের নিঃশব্দ পদচারণ, জঙ্গলের সেই সব দৈত্যাকার পশু, কোনো উড়ে যাওয়া রাতচরা পাখির ডাক, হু হু বাতাস, রক্তের গন্ধ, জঙ্গলের হিংস্র পশুদের রাজ্যের হিংস্র, বন্য আত্মা... অজানার কবিতা! এত কথা বলবার পর মনে হল, ওর বোধহয় ভাল লাগছে না। আমার দারিদ্র্যের চেতনা আবার আমাকে গ্রাস করল, আর চেপে ধরল। যদি আমার ভাল পোশাক থাকত, ওকে টিভোলিতে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কী খুশিই হতাম! মেয়েটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না; আমার মতো একটা অর্ধ-নগ্ন ভিখিরির সঙ্গে পুরো কার্ল যোহান রাস্তাটা হেঁটে ও কী আনন্দ পাচ্ছে? ও কী ভাবছে? আমিই বা কেন বোকার হাসি মুখে ঝুলিয়ে নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওর সঙ্গে হাঁটছি? এই সুন্দর সিল্ক-এর পোশাক পরিহিতা মেয়েটির সঙ্গে হাঁটার ফাঁদে পড়ার কোনো কারণ

আছে কি? এতে আমার কষ্ট হচ্ছে না? একটু মৃদু বাতাস গায়ে লাগলেও আমার কি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যুর বরফ ঢুকে যাওয়ার অনুভূতি হচ্ছে না? একনাগাড়ে কয়েক মাস ধরে খাবার না পেয়ে আমার মাথার মধ্যে কি উন্মত্ততার তাণ্ডব শুরু হয়েছে? অথচ ও আমার শুষ্ক মুখে একটু দুধ ঢালার জন্য বাড়ি যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক চামচ মিষ্টি দুধ, যেটা হয়তো পেটে ধরে রাখতে পারব। ও কেন আমার দিকে পেছন ফিরছে না, আমাকে চলে যেতে দিচ্ছে না?

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম; আমার হতাশা আমাকে শেষ প্রান্তে নামিয়ে আনল। আমি বললাম, 'সব কিছু বিবেচনা করে তোমার আমার সাথে হাঁটা উচিত হয়নি। সকলের চোখেই আমি একটি লজ্জার কারণ, বিশেষ করে আমার পোশাকের জন্যে। হ্যাঁ, এটা সত্যি, আর আমি তা জানি।'

ও চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, একদম চুপ। তারপর হঠাৎ বলল, 'সত্যিই; তা হবে!' এর বেশি আর কিছু বলল না।

'তুমি কী বলতে চাইছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, কিছু না; আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন... আমরা এখনও বেশি দূরে আসিনি;' এবং তারপর জোরে হাঁটতে শুরু করল।

আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটে এলাম আর ইতিমধ্যেই সেন্ট ওলাভ'স প্লেস-এর আলোগুলো আমাদের চোখে পড়েছে। ও আবার আস্তে হাঁটা শুরু করল।

'আমি হঠকারী হতে চাই না,' আমি বলি, 'কিন্তু যাবার আগে তোমার নামটা বলবে না? আর, এক সেকেন্ডের জন্যে তোমার মুখ থেকে ওড়না তুলবে না, যাতে তোমার মুখটা দেখতে পারি? আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব।'

একটু বিরতি। আমি আশায় আশায় হেঁটে চলি।

'আপনি আমাকে আগে দেখেছেন,' ও জবাব দেয়।

'ইয়ালাজালি,' আমি আবার বলি।

'মাপ করবেন। আপনি একবার প্রায় আধবেলা আমাকে অনুসরণ করেছিলেন, প্রায় আমার বাড়ি পর্যন্ত। আপনি কি সে সময় অল্প মত্ত ছিলেন?'

ও হাসল আমি আবার শুনতে পেলাম।

'হ্যাঁ,' আমি বলি, 'হ্যাঁ, আমি সেই সময় একটু মাতাল ছিলাম।'

'কি জঘন্য!'

এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে স্বীকার করলাম যে, কাজটা জঘন্যই হয়েছে।

ফোয়ারার কাছে পৌঁছলাম। আমরা থেমে দাঁড়িয়ে দু'নম্বর বাড়ির আলোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকালাম।

'এখন আপনি আর আমার সঙ্গে আসবেন না,' ও বলল, 'এতদূর আসার জন্য ধন্যবাদ।'

আমি ঝুঁকে অভিবাদন করলাম, কিছু বলতে সাহস হল না। মাথার টুপিটা খুলে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবছি, ও হাতটা বাড়িয়ে দেবে কিনা।

'আপনাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে বলছেন না কেন?' ও নিজের জুতার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

'মহান ঈশ্বর!' আমি জবাব দিলাম, 'যদি আসো সঙ্গে, তো ভাল হয়!'

'হ্যাঁ, কিন্তু অল্প একটু।'

আমরা উল্টো পথে এগোলাম।

আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। বুঝতেই পারছি না আমি মাথার ওপর দাঁড়িয়ে, না পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে। এই মেয়েটি আমার সমস্ত যুক্তিবোধকে উল্টেপাল্টে দিয়েছে, তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। আমি সম্মোহিত হয়ে গেছি, প্রচণ্ড রকম সুখী। মনে হচ্ছে আমাকে জাদু দিয়ে বশ করে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ও নিজের থেকেই আবার পেছন দিকে আসতে চাইল, এটা আমার ইচ্ছায় নয়, ওর নিজের ইচ্ছায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে ওর দিকে তাকাচ্ছি আর ক্রমেই দুঃসাহসী হয়ে উঠছি। ও আমাকে উৎসাহিত করছে, প্রতিটি কথা দিয়ে আমাকে ওর দিকে টানছে। আমি আমার দারিদ্র্য, আমার দীনতা, আমার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম। আগে যখন আমি ডুবে যাইনি, সেই পুরনো দিনের মতো আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে পাগলের মতো রক্ত চলাচল আমি টের পাচ্ছি এবং তাই ভাবলাম একটু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এগোতে হবে।

'প্রসঙ্গতঃ, সেবার আমি কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করিনি,' আমি বললাম, 'তোমার বোনকে।'

'আমার বোনকে?' ও প্রশ্ন করল, দারুণ অবাক হয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

'হ্যাঁ,' আমি উত্তর দিলাম। 'হুম, মানে, আমার সামনে যে দুজন মহিলা যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে যে কমবয়েসি, তাকে।'

'যে কমবয়েসি, না? আ-হাঃ হাঃ।' ও একদম একটা বাচ্চার মতো জোরে জোরে আন্তরিকভাবে হেসে উঠল। 'ওঃ, আপনি কী ধূর্ত; একথা বললেন, যাতে আমি মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরাই, তাই না? ও, আমিও তাই ভেবেছি; কিন্তু আপনি ঠাণ্ডায় নীল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন... এটাই আপনার শাস্তি।'

আমরা হাসতে লাগলাম, মজা করতে লাগলাম। সারাক্ষণ বকবক করে যাচ্ছি। কী বলছি নিজেই জানি না, এত সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে। ও বলল ও আগেও একবার আমায় দেখেছে, অনেকদিন আগে, থিয়েটারে। আমার সঙ্গে সঙ্গীসাথী ছিল, আর আমি নাকি পাগলের মতো ব্যবহার করছিলাম। বোধহয় সেই সময়ও আমি একটু মাতাল ছিলাম, লজ্জার কথা।

ও এ রকম ভাবছে কেন? ওঃ, আমি নাকি খুব হাসছিলাম।

'তাই? ও, হ্যাঁ; সেই সময় আমি খুব হাসতাম।'

'কিন্তু এখন আর হাসেন না?'

'ও, নিশ্চয়ই; এখনো হাসি। কখনও কখনও বেঁচে থাকাটাই ভারী চমৎকার।'

আমরা কার্ল যোহান এ পৌঁছলাম। ও বলল, 'আর যাবো না।' তখন আমরা ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট ধরে ফিরে চললাম। আবার যখন ফোয়ারার কাছে এসে গেছি, আমি চলার গতি একটু শ্লথ করলাম। আমি জানি, ওর সঙ্গে আর যেতে পারব না।

'তাহলে এখান থেকেই ফিরে যান,' ও দাঁড়িয়ে বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাবো।'

আবার এক সেকেন্ড পরেই ও ভাবল, ওর বাড়ির দরজা পর্যন্ত আমি যেতে পারি। এর ভেতরে নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু নেই!

'না,' আমি জবাব দিলাম।

কিন্তু যখন ওর বাড়ির দরজায় দাঁড়ালাম, আমার সমস্ত দুর্দশা আমায় ঘিরে ধরল। কোনো মানুষ যদি এ রকম ভেঙে-পড়া অবস্থায় পৌঁছে যায়, তাইলে সে তার সাহস ধরে রাখবে কি করে? এই যে আমি একটা অল্পবয়েসি যুবতী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, নোংরা, ছেঁড়া জামা-কাপড়, বিপর্যস্ত, খিদেয় শরীর চেহারা ভেঙে-চুরে গেছে, আধোয়া শরীর, পোশাক, অর্ধনগ্ন; মাটিতে ঢুকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি কুঁকড়ে গেলাম, আপনা থেকেই মাথা নিচু হয়ে গেল, বললাম,

'তাহলে তোমার সাথে আর দেখা হবে না?'

ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার কোনো আশা নেই। ও না করে দেবে এই রকম আশা করছিলাম, যাতে আমি নিজেকে একটু টেনে তুলতে পারি আর...

'হ্যাঁ, হবে,' ও প্রায় শুনতে না পাওয়ার মতো ফিসফিসিয়ে বলল।

'কবে?'

'জানি না।' একটু বিরতি...

'দয়া করে এক মিনিটের জন্য হলেও, তোমার ওড়নাটা তুলবে কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আমি দেখতে পারব, কার সঙ্গে আমি কথা বলছি। এক মিনিট, আমি সত্যিই দেখতে চাই।'

আর একটু বিরতি...

'মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় এখানে বাইরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন,' ও বলল, 'করবেন তো?'

'হ্যাঁ প্রিয়তমা, যদি অনুমতি দাও।'

'রাত আটটায়।'

'ঠিক আছে।'

ওর কোটের ওপর দিয়ে হাত বুলোলাম, কেবলমাত্র ওকে একটু ছোঁয়ার জন্য। ওর এত কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকাটা সত্যিই আনন্দের।

'এবং আপনি কিন্তু আমার সম্বন্ধে খারাপ ভাববেন না,' ও বলল; ও আবার হাসছে।

'না।'

হঠাৎ ও ওর ওড়নাটা কপালের ওপর উঠিয়ে দিল; আমরা পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইলাম।

'ইয়ালাজালি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার ঠোঁটে চুম্বন করল, একবার, খুব তাড়াতাড়ি, একদম আমার ঠোঁটে। আমি টের পাচ্ছি, ওর বুক কেমন ওঠাপড়া করছে; ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কী রকম দ্রুত হয়ে উঠেছে। তারপরেই আমার আলিঙ্গন থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শুভরাত্রি জানিয়ে আর একটাও কথা না বলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

হলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিনও খুব বরফ পড়ল। বৃষ্টির সঙ্গে তুষারপাত; বড় বড় তুষারের কণা মাটিতে পড়ে কাদা করে তুলছে। বাতাস একেবারে কনকনে, বরফ-ঠাণ্ডা। আমি একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠলাম, মাথাটা অদ্ভুত জবুথবু, আর বুকের মধ্যে গত সন্ধ্যার আনন্দঘন দেখা-সাক্ষাতের একটা নেশা নেশা ভাব। আমি দু'হাত বাড়িয়ে নিজেকেই জড়িয়ে ধরছিলাম আর বাতাসে চুমু খাচ্ছিলাম। শেষকালে নিজেকে জোর করে বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে বাইরে গেলাম আর এক কাপ টাটকা দুধ আর এক প্লেট মাংস জোগাড় করলাম। আমার তখন আর খিদে নেই, কিন্তু স্নায়ুগুলো টানটান হয়ে আছে।

বাজারে কাপড়ের দোকানে গেলাম। ভাবলাম সস্তায় একটা পুরনো ওয়েস্ট কোট কিনি। আমার কোটের তলায় পরতে পারব।

সিঁড়ি দিয়ে বাজারে ওপরে উঠলাম আর একটা পুরনো ওয়েস্ট কোট দেখতে লাগলাম। যখন কোটটা দেখছি, একজন চেনা লোক এল; ও মাথা নেড়ে আমাকে ডাকল। আমি ওয়েস্ট কোটটা ঝুলিয়ে রেখে ওর কাছে গেলাম। ও একজন ডিজাইনার, অফিসে যাচ্ছিল।

'চল, এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া যাক,' ও বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, হাতে বেশি সময় নেই, কাল সন্ধেবেলা কোন্ মহিলার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলে, বল তো?'

'শোন,' আমি ওর এই খোলামেলা কথাবার্তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, 'মনে কর, সে যদি আমার প্রেমিকা হয়!'

'হা ঈশ্বর!' ও অবাক হয়।

'হ্যাঁ; গত সন্ধ্যাতেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

এই কথাতে ও একদম ঘাবড়ে গেল। আমার কথা ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে। আমি পাক্কা পেশাদারের মতো মিথ্যা বলে গেলাম, ওর হাত থেকে পার পাবার জন্য। আমরা বিয়ারের অর্ডার দিলাম, খেলাম এবং বেরিয়ে এলাম।

'আচ্ছা, বিদায়! ওঃ, শোন,' ও হঠাৎ বলল, 'আমি তোমার কাছে কয়েক শিলিং ধারি। লজ্জার কথা যে, এতদিন আমি ওটা তোমাকে শোধ দিইনি, কিন্তু আর দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি ওটা পেয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' আমি উত্তর দিলাম; কিন্তু আমি জানি যে ও আমাকে কোনোদিনই ওই কয়েকটা শিলিং ফেরত দেবে না। দুঃখের বিষয়, ততক্ষণে বিয়ারটা সোজা আমার মাথায় উঠে গেছে। গত সন্ধ্যার অভিযান আমাকে অভিভূত করে তুলেছে, আমি প্রলাপ বকতে শুরু করেছি। ধর, যদি ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা না করে? ধর, যদি ও সব ব্যাপারটা ভাবতে থাকে আর ওর সন্দেহ হয়... কিসের সন্দেহ হয়? আমার চিন্তাটা একটা ঝাঁকুনি খেল আর টাকা পয়সার দিকে ঘুরে গেল। আমি ভয় পেলাম, প্রচণ্ড ভয়। চুরিটা মাথার মধ্যে খেলে গেল। আমি দেখলাম ওই ছোট দোকানটা, কাউন্টারটা, আমার এই রোগা হাত দুটো, যখন আমি টাকাটা হাতে নিলাম আর ভাবলাম পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করতে এসে কী কী করবে। আমার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরাবে; না, শুধু হাতে হাতকড়া পরাবে. হয়তো একহাতে কড়া পরাবে। তারপর আদালত, কাঠগড়া, সাক্ষ্য প্রমাণ, হাকিমের কলমের লেখার আওয়াজ, হয়তো আমার বিচারের জন্য একটা নতুন কলম নিয়েছে, ওর শাসানি-ভরা চোখ-মুখ। এই যে, মি. ট্যানজেন, কারাবাস, চির অন্ধকার কারাকক্ষ...।

হুম! আমি হাত মুঠো করে, মনে সাহস এনে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত বাজারে এসে গেলাম আর এক জায়গায় বসে পড়লাম।

ছেলেখেলা নয়! কেমন করে প্রমাণ করবে যে, আমি চুরি করেছি? তাছাড়া এই দোকানদার ছেলেটার তো কিছু বলার সাহসই হবে না। ওরও তো চাকরি যাবার ভয় আছে। কোনো গোলমাল নয়, কোনো নাটক নয়!

কিন্তু তা সত্ত্বেও, টাকাটা আমার পকেটে পাপের মতো ভারী লাগছে, আমাকে শান্তি দিচ্ছে না। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করা শুরু করলাম, নিশ্চিত হলাম যে, আগে আমি যখন অসহ্য কষ্ট পেয়েছি, তখনও কিন্তু আমি সুখী ছিলাম। আর ইয়ালাজালি! আমি কি ওকে আমার পাপের হাত দিয়ে স্পর্শ করে দূষিত করিনি? হায় ঈশ্বর, ইয়ালাজালি! আমার নিজেকে একটা বাদুড়ের মতো মাতাল মনে হল, হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আর সোজা ওষুধের দোকানের সামনে বসে থাকা কেক বিক্রেতা মেয়েটির কাছে চলে গেলাম। এখনও হয়তো নিজেকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে পারি। এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি। সারা পৃথিবী দেখবে যে, আমি এখনও কী করতে পারি।

যেতে যেতে টাকাটা ঠিক করে রাখলাম, সমস্ত টাকা পয়সা হাতের মুঠোয়, মেয়েটার টেবিলে ঝুঁকলাম, যেন কিছু কিনব, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ওর হাতে সমস্ত টাকা পয়সা গুঁজে দিলাম। একটাও কথা না বলে, পেছন ফিরে, নিজের রাস্তায় হাঁটা দিলাম।

সততার কী অপূর্ব স্বাদ! আমার শূন্য পকেটগুলো আর আমাকে কষ্ট দিচ্ছে না, একেবারে কপর্দকহীন হওয়াটাও কী আনন্দের। যখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলাম, দেখলাম, এই টাকাটা আমাকে আসলে কত মনঃকষ্ট দিয়েছে, সব সময়

ভয়ে ভয়ে থেকেছি, ভয়ে কেঁপেছি। আমি তো কোনো পাকা লোক নই; এই রকম একটা ছোট কাজের বিরুদ্ধে আমার মর্যাদাবোধ বিদ্রোহ করেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজের কাছেই নিজেকে উঁচু করে তুলতে পেরেছি। 'আমি যা করি, তাই কর!' বাজারের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বললাম। একজন গরিব কেক-বিক্রেতার মনে এত আনন্দ সঞ্চার করতে পেরেছি যে, সে বিহ্বল হয়ে গেছে। আজ রাত্রে, ওর ছেলেমেয়েরা না খেয়ে বিছানায় শুতে যাবে না... এইসব ভেবে নিজেকে উৎসাহিত করে তুললাম আর ভাবলাম, আমি একটা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। টাকাটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

একটু মাতাল, একটু নার্ভাস হয়ে পথ হাঁটছি, প্রশান্তিতে ভরে উঠছে মন। ইয়ালাজালির সঙ্গে আবার স্বচ্ছন্দে, সম্মানের সঙ্গে দেখা করতে পারব, মাথা উঁচু করে ওর মুখের দিকে তাকাতে পারব, ভেবে আনন্দ হচ্ছে। কোনো ব্যথা, যন্ত্রণা টের পাচ্ছি না। মাথাটা হালকা আর পরিষ্কার। মনে হচ্ছে মাথাটা শুধু আলো দিয়ে তৈরি, আমার কাঁধের ওপর আলোময় হয়ে বসে আছে। ইচ্ছা হচ্ছে, খুব দুষ্টুমি করি, অবাক করা কোনো কিছু করি, পুরো শহরটাকে মাতিয়ে দিই। গ্র্যান্ডসেন পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা আমি পাগলের মতো হেঁটে গেলাম। কানের ভেতর বোঁ বোঁ করছে, মাথার ভেতরে নেশা হুটোপাটি লাগিয়েছে। পথচারীদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি হাসির ভঙ্গিমা আমি আলাদা আলাদা বুঝতে পারছি, রাস্তায় কটা ছোট ছোট পাখি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, ওগুলোকে নিরীক্ষণ করছি, রাস্তায় বসানো পাথরের টুকরোগুলোর ভেতরে নানা রকম চিহ্ন আবিষ্কার করছি। এইভাবে শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট স্ট্রিটে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম, আর ঘোড়াগাড়িগুলোর দিকে তাকালাম। কচোয়ানগুলো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্প করছে, হাসছে। ঘোড়াগুলো এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মাথা নিচু করে কুঁকড়ে রয়েছে। নিজের পাঁজরে কনুই এর খোঁচা মেরে বললাম, 'এগিয়ে যাও!' তাড়াতাড়ি প্রথম গাড়িটার কাছে গিয়েই উঠে বসলাম। 'উল্লেভোল্ডসডেন, ৩৭ নম্বর,' আমি বললাম। গাড়ি এগিয়ে চলল।

পথে কচোয়ান বার কয়েক মাথা ঘুরিয়ে নিচু হয়ে গাড়ির ভেতরে তাকাল, ওখানে আমি গাড়ির ছাদের তলায় বসে আছি। ওর কি সন্দেহ হয়েছে? তাই মনে হচ্ছে; আমার এই হতচ্ছাড়া পোশাক ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'একজন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে,' আমি আগ বাড়িয়ে ওকে ডেকে বললাম। ৩৭ নম্বর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই লাফ দিয়ে নেমে, সিঁড়ি ধরে সোজা তিনতলায় উঠে গিয়ে ঘণ্টি বাজালাম। ভেতরে ছ'সাতবার ঘণ্টিটা বাজল, শুনতে পেলাম।

একজন পরিচারিকা দরজা খুলল। লক্ষ্য করলাম, ওর দুই কানে গোল সোনার দুল আর ওর ধূসর জামায় কালো বোতাম। ও আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল।

আমি জানতে চাইলাম, কিয়েরুল্‌ফ, জোয়াকিম কিয়েরুল্‌ফ, কাঠের ব্যবসায়ী, বাড়িতে আছে কিনা।

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, 'এখানো কোনো কিয়েরুলফ থাকেন না।' আমি নিচে নেমে এলাম।

'উনি বাড়িতে নেই,' আমি কচোয়ানকে বললাম, 'টমটেগাডেন নম্বর ১১-তে চল।' আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত এবং কচোয়ানের মধ্যেও এই উত্তেজনা সঞ্চারিত করতে পারলাম। ও ভাবল, এটা মরা বাঁচার ব্যাপার এবং তাই কিছু না বলে জোরে গাড়ি ছোটাল। ঘোড়াটাকে জোর চাবুক কষাল।

'ভদ্রলোকের নাম কী?' ও ঘুরে জানতে চাইল।

'কিয়েরুল্ফ, কাঠের ব্যবসায়ী।'

কোচোয়ান বলল, 'উনি সাধারণত একটা হালকা মর্নিং কোট পরেন, তাই না?'

'কি?' আমি চেঁচালাম, 'হালকা মর্নিং কোট? পাগল নাকি? ভাবছ, আমি একটা চা এর কাপ-এর খোঁজ করছি?' এই হালকা মর্নিং কোট এর উল্লেখটা আমি লোকটার সম্বন্ধে যে ছবি মনের মধ্যে এঁকেছি সেটা নষ্ট করে দিল।

'আপনি নামটা কি বললেন, কিয়েরুল্ফ?'

'নিশ্চয়ই,' আমি জবাবে বললাম, 'তা এতে অবাক হবার কী আছে? এই নামে কি কারো অসম্মান হয়?'

'ওঁর মাথার চুল লাল, তাই না?'

হতে পারে ওর চুল লাল, আর কচোয়ান যখন এটা বলল, আমার হঠাৎ মনে হল, ও ঠিক বলেছে। ওই বেচারা কচোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম আর বললাম যে, ও একদম ঠিক বলেছে, ঠিক বর্ণনা দিয়েছে। এ রকম লোকের লালচুল না হওয়াটাই আশ্চর্য।

'ওঁকে আমি বার দুই আমার গাড়িতে ঘুরিয়েছি' কচোয়ান বলল, 'ওঁর হাতে একটা গিঁটওয়ালা ছড়ি ছিল।'

ওর এই কথা শুনে লোকটার চেহারা আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, 'হা! হা! আমার মনে হয় ওঁর হাতে ওই গিঁটওয়ালা ছড়িটা ছাড়া কেউ ওকে আজ পর্যন্ত দেখেনি, তুমি নিশ্চিত হতে পারো, একদম নিশ্চিত।'

হ্যাঁ, এটা এখন পরিষ্কার যে এই সেই লোক, যাকে ও গাড়িতে ঘুরিয়েছে। ও চিনতে পেরেছে আর তাই এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে যে, ঘোড়ার খুরের লোহার নালে রাস্তার পাথর থেকে স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠছে।

এত উত্তেজনার মধ্যেও আমি কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি। একজন পুলিশের পাশ দিয়ে গেলাম। ওর নম্বর দেখলাম ৬৯ নম্বরটা এত স্পষ্টভাবে আমার নজরে এল যে, গুলির মতো সোজা আমার মাথায় ঢুকে গেল– ৬৯– একদম সঠিক ৬৯। এ আমি আর ভুলব না।

আমি গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে বসে উদ্ভট সব কল্পনা করতে লাগলাম, এমন ভাবে গুঁড়ি মেরে বসে আছি যে, কেউ দেখতে পাবে না। অল্প অল্প ঠোঁট নড়ছে আর বোকার মতো বিড়বিড় করে নিজের মনেই কথা বলছি। মাথার মধ্যে পাগলামি

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এমন কিছু, যার ওপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ওই যে দু'গ্লাস মদ খেয়েছিলাম, তার নেশায় এখনও বুঁদ হয়ে আছি, আনন্দে আছি, বিনা কারণে নিঃশব্দে, আবেগে হাসতে শুরু করেছি। একটু একটু করে উত্তেজনা প্রশমিত হল, আবার মনে প্রশান্তি ফিরে এল। আহত আঙুলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি, কোটের কলারের তলায় আঙুলটা ঢুকিয়ে গরম করার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত টমটেগাডেন-এ পৌঁছলাম, কচোয়ান গাড়ি দাঁড় করাল।

মাথাটা ভার হয়ে আছে, ধীরেসুস্থে, অন্যমনস্ক, অস্থিরভাবে গাড়ি থেকে নামলাম। একটা গেট দিয়ে ঢুকে একটা উঠোন মতো জায়গা পার হয়ে এগিয়ে চললাম। সামনে একটা দরজা পড়ল, সেটা খুলে, ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গেলাম। একটা ছোট বৈঠকখানা মতো ঘর, দুটো জানালা রয়েছে, এক কোনায় দুটো বাক্স, একটার ওপর আরেকটা, আর দেয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো রং-করা সোফা-কাম-বিছানা রয়েছে। যার ওপর একটা কম্বল বিছানো। ডান দিকে পাশের ঘরে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, একটা শিশুর কান্না আর মাথার ওপরে দোতলায় একটা লোহার প্লেটের ওপর হাতুড়ি মারার শব্দ পেলাম। ঘরে ঢোকার মুহূর্তেই এই সব লক্ষ্য করলাম।

আমি তাড়াহুড়ো না করে পালানোর চিন্তা না করে শান্তভাবে উল্টো দিকের দরজার দিকে এগোলাম; দরজাটা খুলে ভনম্যানসগ্যাডেন-এ বেরিয়ে এলাম। যে বাড়িটার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এলাম, সেটার দিকে তাকিয়ে দেখি, লেখা রয়েছে, 'পর্যটকদের জন্য খাওয়া থাকার ব্যবস্থা আছে।'

কচোয়ান অপেক্ষা করছে, আমার কিন্তু চুপি চুপি পালানোর কোনো ইচ্ছা নেই। আমি ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভয়ে ভনম্যানসগাডেন ধরে হাঁটছি, মনে কোনো অন্যায়বোধ নেই।

কিয়েরুল্‌ফ-কাঠের ব্যাপারী, যে এতক্ষণ আমার মাথার মধ্যে বসেছিল, যার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করছিলাম এবং যার সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব জরুরি মনে করছিলাম, সে এখন আমার স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেছে, এ রকম আরো অনেক পাগলামো যা আমার মনের মধ্যে আসা যাওয়া করে, তাদের মতো মন থেকে মুছে গেছে। ওকে আর আমার মনে পড়বে না, হয়তো কখনো একটা ভুতুড়ে স্মৃতির ইশারা ছাড়া।

যত হাঁটছি, ততই শান্ত হয়ে যাচ্ছি। অলস, চিন্তামগ্ন, পা টেনে টেনে হাঁটছি। বড় বড় ভিজে পাতলা টুকরো হয়ে তুষার পাত হয়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রোনল্যান্ড-এ পৌঁছলাম। অনেক দূরে গির্জার কাছে একটা সীটে বিশ্রাম নিতে বসলাম। সব পথচারী অবাক হয়ে আমাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম।

হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, আমি এখন কী দুর্দশায় পড়েছি। আমি এত ক্লান্ত আর এই দুর্বিষহ জীবন টেনে টেনে এতই পরিশ্রান্ত যে, এই জীবনটা বাঁচিয়ে রাখার লড়াই

চালানোর কষ্টটা আর বইতে পারব না। আমি এত হা-ঘরে গরিব হয়ে গেছি আর এমন ভেঙে গেছি যে, এক সময় যা ছিলাম, এখন আমি তার ছায়ামাত্র; কাঁধ দুটো যেন বসে গিয়ে একপাশে হেলে গেছে আর আমার বুকের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে হাঁটার অভ্যাস এসে গেছে। কয়েকদিন আগে একদিন দুপুরে আমার ঘরে নিজের শরীরটা দেখছিলাম আর সারাক্ষণ কেঁদেছিলাম এই শরীরটার জন্য। কত সপ্তাহ ধরে একই শার্ট পরছি, ঘামে ধুলোয় শার্টটা শক্ত হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া ছড়ে ছড়ে যাচ্ছে। ক্ষত জায়গা থেকে রক্ত, জলীয় পদার্থ বেরিয়ে আসছে; বেশি কষ্ট দিচ্ছে না, তবু পেটের ওপরে এই নরম জায়গাটা বড় অস্বস্তিকর। এর কোনো প্রতিকারও নেই, আর নিজে থেকে সারবেও না। আমি জায়গাটা ভাল করে ধুয়ে, যত্ন করে শুকিয়ে নিয়ে ফের ওই একই শার্টটা পরলাম। কিন্তু কোনো উপকারই হল না, ওখানটা...।

সীটে বসে বসে এই সব ভাবছি, মনে খুব দুঃখ। নিজেকে ঘেন্না হচ্ছে। আমার হাত দুটো, ওদের ঢিলাঢালা, স্থূল চামড়া, দেখতে কুৎসিৎ, আমার নিজেরই ঘেন্না লাগছে। আমার রোগা রোগা আঙুলগুলো দেখে নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। আমার এই শুকনো, কুঁজো শরীরটা বইতে শিউরে উঠছি। ঘেন্না করছে। ঈশ্বর, যদি এই সমস্ত ব্যাপারটা এখুনি সমাপ্ত হয়, আমি স্বচ্ছন্দে, আনন্দের সঙ্গে মরতে রাজি!

সম্পূর্ণ নোংরা, কদর্য, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়ালাম এবং বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। পথে একটা দরজা পার হলাম, তার ওপর একটা বোর্ডে লেখা আছে, 'মিস অ্যান্ডারসেনের দোকানে শবাচ্ছাদন বস্ত্র পাওয়া যাবে, দরজা ডানদিকে।' 'পুরনো স্মৃতি।' আমি বিড়বিড় করলাম, আমার মনটা চলে গেল হ্যামার্সবর্গে আমার সেই পুরনো ঘরটায়। সেই ছোট্ট দোলনা চেয়ার, দরজার কাছে সাঁটা খবরের কাগজ, লাইটহাউস ডাইরেক্টরের ঘোষণা, আর রুটি প্রস্তুতকারী ফ্যাবিয়ান ওলসেন-এর তাজা সেঁকা রুটি। হ্যাঁ, এখনকার চাইতে তখন আমার সময়টা ভাল ছিল; এক রাত্তিরে একটা গল্প লিখেছিলাম, মূল্য দশ শিলিং, আর এখন কিচ্ছু লিখতে পারি না। যখনই কিছু লিখতে চেষ্টা করি, মাথাটা হালকা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবার এটাকে শেষ করতে হবে; আমি হাঁটতে লাগলাম।

যতই মুদি দোকানটার কাছাকাছি আসছি, ততই বুঝতে পারছি যে, আমি একটা বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু আমি সংকল্প ছাড়লাম না। আমি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দেব। আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। দরজায় এসে একটা ছোট মেয়েকে দেখলাম, হাতে একটা কাপ। ওকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুললাম। দোকানদার ছেলেটা আর আমি আর একবার মুখোমুখি।

'এই যে!' ও বলল, 'কি বাজে আবহাওয়া, তাই না?' আসল কথায় কেন আসছে না? কেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরল না? আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'আমি এখানে আবহাওয়া আলোচনা করতে আসিনি।'

এ রকম উগ্র ভূমিকা দেখে ও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ওর দোকানদারী বুদ্ধি ফেল মেরে গেল। ওর কখনো মনেই হয়নি যে, আমি ওকে পাঁচ শিলিং ঠকিয়েছি।

'তুমি কি জানো না যে, আমি তোমাকে ঠকিয়েছি?' আমি অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, উত্তেজনায় আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে; আমি কাঁপছি আর ও যদি পথে না আসে, তাহলে গায়ের জোর ফলাতে আমি প্রস্তুত।

কিন্তু ও বেচারা এসব চিন্তাই করেনি।

হা কপাল! এইসব বোকা-সোকা প্রাণীদের সঙ্গেই এই দুনিয়ায় থাকতে হয়!

ওকে আমি বকলাম, কীভাবে সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছিল, বুঝিয়ে বললাম; কোথায় টাকাটা রেখেছিল, আমি কেমন করে হাতে নিলাম, হাত মুঠো করলাম, সব। ও সব শুনল, কিন্তু কিচ্ছু করল না। একবার এ পায়ে দাঁড়াচ্ছে, আর একবার ও পায়ে, পাশের ঘরে পায়ের শব্দ শুনছে, আমাকে ইঙ্গিত করছে চুপ করতে, কিংবা নিচু স্বরে কথা বলতে; এবং শেষমেশ বলল, 'আপনি এটা খুব বাজে কাজ করেছেন।'

'না, শোন,' আমি ওকে তাতাবার জন্য ওর বিরোধিতা করলাম। ও যত বাজে ভাবছে ওর দোকানদারী বুদ্ধিতে, ততটা বাজে নয়। আমি তো টাকাটা নিজের জন্য রাখিনি, বা ওই টাকাটা ব্যবহার করিনি, বা ওর থেকে কোনো সুবিধা নিইনি, কারণ ওটা আমার সততার পরিপন্থী।

'তাহলে টাকাটা দিয়ে কি করেছেন?'

'টাকাটা আমি এক গরিব বৃদ্ধা মহিলাকে দিয়েছি। শেষ কপর্দক পর্যন্ত।' ওর জানা উচিত আমি কী রকম লোক। আমি কখনো গরিবদের ভুলি না...।

ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'আপনার কি টাকাটা ফেরত দেওয়া উচিত ছিল না?'

'শোন,' আমি জবাব দিই, 'আমি তোমাকে কোনো রকম বিপদে ফেলতে চাইনি; কিন্তু আমার এই মহানুভবতার তুমি ভালই প্রতিদান দিচ্ছ। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খোলসা করে ব্যাখ্যা করলাম, আর তুমি একটুও লজ্জিত না হয়ে ব্যাপারটা ফয়সালা করার কোনো চেষ্টাই করছ না। কাজেই এই আমি হাত ধুয়ে ফেললাম, আর শেষ কথা বলে যাই, 'শয়তান তোমাকে ধরুক! শুভ রাত্রি।'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে আমি চলে এলাম। কিন্তু যখন আমি বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকলাম, ওই বিষণ্ণ গর্তটায়, নরম তুষারে সারা শরীর ভিজে গেছে, সারাদিন হেঁটে হেঁটে দুই হাঁটু কাঁপছে, আমি যেন আমার ওই উঁচু সিংহাসন থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম, আর, আরও একবার, হতাশায় ডুবে গেলাম।

বেচারা গরিব দোকানদার ছেলেটার ওপর অনর্থক হামলা করেছি ভেবে খুব অনুশোচনা হল। আমি কাঁদতে লাগলাম, নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য নিজের গলা টিপে ধরলাম, আর পাগলের মতো করতে লাগলাম। ও নিজের চাকরির জন্য স্বভাবতই ভয় পেয়েছিল আর তাই ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়া ঐ পাঁচ শিলিং নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, আর আমি ওর ভীতির সুযোগ নিয়ে ওকে ধমকধামক

দিয়ে, রূঢ় কথা বলে, চেঁচিয়ে বলা প্রত্যেকটা কথার ছুরি ঢুকিয়ে ওর ওপর অত্যাচার করেছি। ওর মনিব হয়তো পাশের ঘরে বসে সব কথাই শুনেছে। না, আমার এই জঘন্য, নীচ কাজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

আমাকে কেন তালা দিয়ে রাখা হয়নি? তাহলে তো এগুলো হত না। আমি হাতকড়া পরবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিতাম। একটুও বাধা দিতাম না, বদলে, আমি ওদের সহযোগিতা করতাম। হে স্বর্গ ও মর্তের ঈশ্বর! আমার জীবনের পুরো একটা দিনের বদলে আমাকে একটা সুখী সেকেন্ড দাও! একবার আমার কথা শোন!...

ভিজে কাপড়চোপড় পরেই আমি শুয়ে পড়লাম, একটা অস্পষ্ট ধারণা হল যে, আজ রাত্রেই আমি মারা যাব। শেষ শক্তি দিয়ে বিছানাটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম, যাতে সকালবেলা আমার চারপাশটা একটু গোছানো মনে হয়। আমি বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে, শরীরের ভঙ্গীটা সঠিক করলাম।

হঠাৎ আমার ইয়ালাজালির কথা মনে হল। কী করে সারাটা সন্ধ্যা ওকে ভুলে ছিলাম? আমার শরীরের মধ্যে যেন খুব সূক্ষ্মভাবে একটা আলোর কণা জোর করে ঢুকে গেল- একফালি সূর্যরশ্মি আমাকে যেন আশীর্বাদধন্য করে উত্তপ্ত করে তুলল। ধীরে ধীরে ওই সূর্যরশ্মি বাড়তে লাগল, সিল্কের মতো, মলমের মতো একটা ক্বচিৎ আলো যেটা আমাকে ভালোবাসার প্রলেপ দিয়ে আদর করতে লাগল। আলো ক্রমেই সূর্যের মতো বড়, শক্তিশালী হতে শুরু করল, আমার রগ দুটো পুড়তে লাগল, আমার ক্ষীণ, রুগ্ণ মস্তিষ্কে তীব্র উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে লাগল। শেষকালে, আগুনের লেলিহান শিখা আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠল, স্বর্গমর্ত্য এক করে দেওয়া আগুন, আগুনের পাহাড়, আগুনের শয়তানি, একটা অতল খাদ, একটা অসীম বন্যতা, একটা প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা, নগ্ন আগুনে জ্বলন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, শুধু ধোঁয়া, শুধু আগুন, শেষের সেই দিন।

আর কিছু দেখতে বা শুনতে পাইনি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল, সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। প্রচণ্ড জ্বর আমাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না, কী হয়েছে আমার; অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, নিজেকে চিনতেই পারছি না। নিজের হাত পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছি, জানালাটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কেন উল্টোদিকের দেয়ালে নয়, আর নিচে থেকে আসা উঠোনের ঘোড়াগুলোর পায়ের শব্দ মনে হচ্ছে যেন মাথার ওপর থেকে আসছে। নিজেকে খুব অসুস্থ লাগছে...।

কপালে চুলগুলো ভিজে আর ঠাণ্ডা হয়ে লেপটে আছে। কনুই-এ ভর দিয়ে নিজেকে তুললাম আর বালিশের দিকে তাকালাম; ভিজে চুল বালিশের ওপর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। রাত্রে জুতার মধ্যে পা দুটো ফুলে উঠেছে। কিন্তু কোনো ব্যথা নেই। শুধু পায়ের পাতা নাড়াতে পারছি না, প্রচণ্ড আড়ষ্ট।

বিকেল হয়ে আসছে। একটু একটু গোধূলি নামছে। বিছানা ছেড়ে উঠে, ঘরের মধ্যেই একটু একটু হাঁটতে লাগলাম। ছোট ছোট সাবধানী পদক্ষেপ নিচ্ছি, যাতে

ভার রাখতে পারি আর যতদূর সম্ভব কম, পা দুটোকে বাঁচাতে পারি। বেশি কষ্ট হচ্ছে না, কাঁদছিও না; আর সবদিক বিবেচনা করলে, বিমর্ষও নই। পরিবর্তে আমি যেন স্বর্গীয় সন্তুষ্টি উপভোগ করছি। তখনও মনে হয়নি যে, অন্য রকম কিছু হতে পারে।

তারপরই আমি বেরিয়ে পড়লাম।

কেবল একটি মাত্র জিনিসই আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল; খাবারের কথা ভাবলেই ভেতর থেকে যে বমির ভাবটা উঠে আসছিল, তা সত্ত্বেও, সেই একমাত্র জিনিস হল, খিদে। এই নির্লজ্জ খিদের ব্যাপারে আমি সচেতন হতে শুরু করলাম; একটা রাক্ষসের মতো খাবারের জন্য লালসা, যেটা ক্রমাগত আরো খারাপ হতে চলেছে। আমার বুকের ভেতরে খিদে কামড়াতে লাগল; একটা নিরব, রহস্যময় কারবার ঘটে চলেছে বুকের মধ্যে, পেটের মধ্যে। মনে হচ্ছে যেন, গোটা কুড়ি ছোট ছোট বামনের মতো পোকা বুকের ভেতর প্রথমে একদিকের দেয়ালে মাথা রেখে কামড়াচ্ছে, তারপরে কিছুক্ষণ থেমে অন্যদিকের দেওয়ালে কুরে কুরে খাচ্ছে। আবার একদিকের দেওয়াল, কিছু বিরতি, তারপর অন্যদিকে, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে, তাড়াহুড়ো না করে, কুরে কুরে, কামড়ে কামড়ে ফুটো করে দিচ্ছে আর এগিয়ে চলেছে, পেছনে সর্বত্র শূন্য, খালি জায়গা পড়ে থাকছে, ওরা ফুটো করে চলেছে...

আমি অসুস্থ নই, কিন্তু মূর্ছাহত; ঘেমে নেয়ে উঠছি। ভাবছি বাজারে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব, কিন্তু পথটা বড়ই দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর। শেষ পর্যন্ত প্রায় পৌঁছে গেলাম। বাজার আর মার্কেট স্ট্রিটের কোনায় একটু দাঁড়ালাম; কপাল বেয়ে ঘাম নেমে চোখের ভেতর ঢুকে অন্ধ করে দিচ্ছে; একটু দাঁড়িয়ে ঘামটা মুছে নিতে চাইলাম। খেয়াল করিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি; আসলে, আমি এটা নিয়ে ভাবিইনি; চারপাশের হৈচৈটা বেশ ভীতিজনক।

হঠাৎ কেউ চেঁচিয়ে উঠল, একটা তীব্র সাবধান-বাণী। আমি শুনলাম, স্পষ্ট শুনলাম, আর একপাশে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, আমার খারাপ পা-টা নিয়ে যতটা সম্ভব। দৈত্যের মতো একটা রুটির গাড়ি আমার গা ঘেঁষে চলে গেল, চাকাটা আমার কোট ছুঁয়ে গেল; চেষ্টা করলে হয়তো আর একটু তাড়াতাড়ি সরতে পারতাম। যাই হোক, আর কিছু করার নেই, একটা পায়ে যন্ত্রণা অনুভব করলাম, পায়ের দুটো আঙুল থেঁতলে গেছে, জুতার মধ্যে গুটিয়ে গেছে।

কচোয়ান সর্বশক্তি দিয়ে লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামাল। ও গাড়ির ওপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল আমার লেগেছে কিনা। ওঃ, খারাপ হতে পারত, আরো খারাপ... না, অতটা বিপজ্জনক কিছু হয়নি... মনে হয় কোনো হাড়-টাড় ভাঙেনি। ওঃ ভগবান...

আমি কোনো রকমে তাড়াতাড়ি করে একটা সীটে গিয়ে বসে পড়লাম। এত লোক দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। যাই হোক, কোনো মারাত্মক আঘাত তো লাগেনি; তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে,

আমার ভাগ্য ভালো, অল্পে বেঁচে গেছি, নইলে আমার ওপরে তো দুর্ভাগ্যই নেমে আসার কথা। তবে সবচেয়ে খারাপ জিনিস হল, আমার জুতাটা চাকার তলায় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জুতার ডগার দিকে সোলটা আলগা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। আমি পাটা তুলে দেখলাম, ফাঁক দিয়ে রক্ত চোখে পড়ল। যাই হোক, কোনো পক্ষই ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেনি। লোকটার তো আমার খারাপ করবার উদ্দেশ্য ছিল না; বরঞ্চ ওকে বেশ চিন্তান্বিতই দেখা গেল। এটা নিশ্চিত যে, আমি যদি ওর গাড়ি থেকে একখানা রুটি চাইতাম তো ও দিয়ে দিত। ও নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে দিয়ে দিত। ঈশ্বর ওকে আশীর্বাদ করুন, ও যেখানেই যাক না কেন!

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, বুঝতে পারছি না নিজের এই নির্লজ্জ ক্ষুধাকে নিয়ে কী করব। সীটে বসে এপাশ-ওপাশ করে যন্ত্রণায় ককাতে লাগলাম, বুকটা হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে আনলাম। আমি প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। যখন অন্ধকার হয়ে এল, আমি পা টেনে টেনে টাউন হল অবধি পৌঁছলাম, কি করে পৌঁছলাম ঈশ্বর জানেন। আর স্তম্ভশ্রেণীর ধারটায় গিয়ে বসলাম। কোটের একটা পকেট ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে লাগলাম, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কিন্তু আমার মুখচোখে উগ্রভাব আর চোখ দুটো তাকিয়ে আছে সোজা শূন্য পানে, কিন্তু কিছুই দেখছি না। আমার আশেপাশে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি আর সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝতে পারছি কিছু পথচারী পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে; এছাড়া আমি কিছুই দেখছি না।

হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপল, নিচের মাংসের বাজারে যাই আর একটুকরো কাঁচা মাংস চেয়ে নিয়ে আসি। আমি সোজা বাজারের অপরদিকের বাড়িটায় চলে গেলাম আর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলাম। নিচের তলায় দোকানগুলোতে প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তাকিয়ে পেছনের দিক দেখিয়ে শাসানির ভঙ্গী করলাম, যেন আমি ওপরে একটা কুকুরের সঙ্গে কথা বলছি আর সোজা প্রথম মাংসের দোকানের বিক্রেতাকে বললাম, আমার কুকুরটার জন্য একটা হাড় দিন তো? শুধু হাড় দেবেন, হাড়ের গায়ে যেন কিছু না থাকে, ও ওটা মুখে করে নিয়ে বাড়ি যাবে।'

একটা হাড় পেলাম, বেশ ভালো একটা হাড়ের টুকরো, যার গায়ে এখনও একটু মাংস লেগে আছে। আমি কোটের তলায় হাড়টা লুকিয়ে লোকটাকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড সজোরে লাফাচ্ছে। কামারশালাগুলোর পাশে একটা গলিপথে অলক্ষে ঢুকে গেলাম, যতখানি সম্ভব ভেতরে ঢুকলাম আর একটা ভাঙাচোরা দরজার পাশটায় দাঁড়ালাম, যেখান দিয়ে পেছনের উঠোনে যাওয়া যায়। কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না, আমার চারপাশে অন্ধকার। এবার আমি হাড়টাকে কামড়াতে লাগলাম।

কোনো স্বাদ নেই, কাঁচা রক্তের গন্ধ বেরোচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেল। আবার নতুন করে শুরু করলাম। যদি কোনোরকমে পেটের ভেতর ধরে রাখতে পারি, কিছুটা কাজ তো দেবেই। শুধু জোর করে পেটের ভেতর ধরে রাখতে

হবে। কিন্তু আবার বমি হল। আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম, হাড়ের ওপরে মাংসটায় রাগের চোটে কামড় বসালাম।

এক কুচি মাংস ছিঁড়ে নিলাম আর স্রেফ ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে এই মাংসের কুচিটা গিলে ফেললাম। তবু কাজ হল না। আমার পেটের ভেতর গিয়ে মাংসের কুচিগুলো গরম হতেই, গলা দিয়ে বের হয়ে এল, দুর্ভাগ্য। আমি উত্তেজনায় হাত মুঠি করলাম, অসহায় হয়ে চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে এল, তবু ভূত-গ্রস্তের মতো হাড়ের টুকরোটা কামড়ে চললাম। কাঁদছি, হাড়টা আমার চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে, নোংরা হয়ে যাচ্ছে, বমি করছি, অভিশাপ দিচ্ছি, আর আর্তনাদ করছি, বুক-ভাঙা কান্না কাঁদছি, আবার নতুন করে বমি করছি। আমি উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বের যাবতীয় ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে নরকের জঘন্যতম শাস্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি।

চারিদিকে নৈঃশব্দ্য কেউ কোথাও নেই- আলো নেই- কোনো আওয়াজ নেই। আমি একটা ভয়াবহ উত্তেজনার ঘোরের মধ্যে রয়েছি। জোরে জোরে শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছি। আর দাঁত কিড়মিড় করে কাঁদছি, প্রত্যেকবার মাংসের কুচিগুলো, যা আমাকে কিছুটা হলেও তৃপ্ত করতে পারত, বেরিয়ে আসছে। যখন দেখলাম, এত চেষ্টা করেও কোনো কাজ হচ্ছে না, আমি হাড়ের টুকরোটা দরজায় ছুঁড়ে ফেললাম। একটা অক্ষম ঘৃণায় মনটা ভরে গেল; আকাশের দিকে তাকিয়ে দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে চেঁচাচ্ছি, ঈশ্বরের নাম ধরে ডাকছি ফ্যাঁসফেসে গলায় আর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আঙুল বেঁকিয়ে থাবার মতো করে তুলছি...

'আমি তোমাকে বলছি, ওহে স্বর্গের পবিত্র ভুয়ো ঈশ্বর, তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে আমি তোমাকে এমন অভিশাপ দেব, যে তোমার স্বর্গ, নরকের আগুনে শিউরে উঠবে। তোমাকে বলছি, তুমি তোমার স্বর্গ ভরেছ এই নিচের পৃথিবীর খানদানী বেশ্যাদের দিয়ে, যারা মৃত্যুকালে তোমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চেয়েছিল। তোমাকে বলছি, তুমি আমার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করেছ, আর তুমি জানো না, তুমি একটা চিরকালীন অনস্তিত্ব; যে আমি কখনও নত হইনি। সারাটা জীবন, আমার দেহের প্রতিটি কোষ, আমার আত্মার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি, তোমাকে বিদ্রূপ করতে, তুমি একটা উচ্চাসীন মহান দৈত্য। তোমাকে বলছি, একথা আমি বলে যাব এই পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের আত্মাকে, প্রতিটি ফুলকে, প্রতিটি পাতাকে, বাগানের প্রতিটি শিশির বিন্দুকে। শেষের সেদিনে আমি তোমাকে উপহাস করে যাব, তোমার মূর্তির সীমাহীন অকর্মণ্যতাকে অভিশাপ দিয়ে যাব। তোমাকে বলছি, এই মুহূর্ত থেকে আমি তোমার সমস্ত কীর্তি, সমস্ত আড়ম্বরকে পরিত্যাগ করব। তোমার সম্বন্ধে কোনো চিন্তা যদি আমার মনে উদয় হয়, তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেব, কখনও যদি আমার ঠোঁট তোমার নাম উচ্চারণ করে, তাহলে এই ঠোঁট আমি ছিঁড়ে ফেলব। তোমাকে বলে যাচ্ছি, যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে আমার জীবৎকালে বা মৃত্যুর মুহূর্তে আমার শেষ কথা, তোমাকে চিরবিদায় জানাচ্ছি, চিরকালের জন্য

আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তোমাকে আমার শেষ বিদায় জানাচ্ছি, এর কোনো অন্যথা হবে না। আমি এখন নীরব, তোমার দিকে পেছন ফিরিয়েছি, আর নিজের পথে চলে যাচ্ছি...,' নৈঃশব্দ।

আমি উত্তেজনায় আর ক্লান্তিতে কাঁপছি, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর তখনও ফিসফিস করে শপথ করে যাচ্ছি, গালাগাল দিয়ে যাচ্ছি, এত জোর কান্নার পরে হিক্কা উঠছে, উন্মত্ত ক্রোধের সমাপ্তিতে ভেঙে পড়েছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেঁচকি আর ফিসফিসানির পর দুজন লোকের কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম। ওরা ওই গলিপথ ধরে আসছিল। আমি দরজার কাছ থেকে চোরের মতো সরে গিয়ে বাড়িগুলোর দেয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগলাম আর খানিক পরে আবার আলোকিত রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। যখন আমি পা টেনে টেনে ইয়ংস হিল ধরে যাচ্ছি, মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা এল। মার্কেট প্লেসের এক কোনায় যে সেকেন্ড-হ্যান্ড কাপড় রাখার আর অন্য পুরনো জিনিসপত্র রাখার ছোট ছোট ভাঙাচোরা ঘরগুলো রয়েছে ওগুলো বাজারের চেহারাটাই নষ্ট করে দিচ্ছে, শহরের কলঙ্ক। ছিঃ, ওই সব জঞ্জাল হটানো দরকার। তারপরই ভাবতে লাগলাম জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভের ওই সুন্দর বাড়িটা, যেটা ওখানে রয়েছে আর যখনই আমি পাশ দিয়ে যেতাম, আমাকে বাড়িটা আকর্ষণ করত, ওই বাড়িটা ওখান থেকে সরাতে গেলে কত খরচ পড়বে। দুশ বা তিনশ পাউন্ডের কমে হবে বলে মনে হয় না। পকেট খরচা হিসাবে তিনশ পাউন্ড বেশ ভালোই। হাঃ, হাঃ! শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট, তাই না? তারপর আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলাম যে শুরু করার জন্য পকেট খরচা হিসাবে তিনশ পাউন্ড বেশ যথেষ্ট। আমার সারা শরীর তখনও কাঁপছে, আর সেই কান্নার পরের হেঁচকি তখনও মাঝে মাঝে উঠছে। মনে হচ্ছে আমার শরীরে প্রাণ আর বেশিক্ষণ থাকবে না, আমি বোধহয় আমার শেষ গান গেয়ে যাচ্ছি। এতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না। আমি শহর থেকে নিচের দিকে জেটিঘাটের দিকে চলতে লাগলাম। আমার ঘর থেকে আরো আরো দূরে। আমি অবশ্য মরবার জন্য সটান রাস্তায় শুয়ে পড়তে পারতাম। আমার এই অসহনীয় কষ্ট আমাকে বেপরোয়া করে তুলছে। আমার চোট-খাওয়া পায়ের পাতা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দপদপ করছে; কি রকম যেন মনে হচ্ছে, যন্ত্রণাটা ওপর দিকে উঠে পুরো পায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এতেও আমার তেমন ভোগান্তি হচ্ছে না; এর থেকে অনেক বেশি কষ্ট আগেও ভুগেছি।

এই করতে করতে, রেলওয়ের জেটিতে পৌঁছে গেলাম। কোনো লোক চলাচল নেই, কোনো আওয়াজ নেই- শুধু এখানে ওখানে এক আধটা ছুটকো লোক, একটা কুলি, কিংবা একটা নাবিক, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। একটা খোঁড়া লোক চোখে পড়ল, ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় ও আমার দিকে তীব্র চোখে তাকাল। আমি দাঁড়িয়ে মাথার টুপিতে হাত দিয়ে, জানতে চাইলাম, 'নান' জাহাজ ছেড়ে গেছে কিনা ও কি জানে? এই জাহাজটার কথা আমি একেবারে ভুলে গেছিলাম। অবশ্য ওর সম্বন্ধে ভাবনাটা ভেতরে ঠিক ছিল। আমি অচেতনে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

হ্যাঁ, 'নান' ছেড়ে চলে গেছে।

কোথায় গেছে, বলতে পারবে কি?

লোকটা খানিক চিন্তা করল, ওর একটা ভালো পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আর খোঁড়া পাটা শূন্যে ঝুলিয়ে তারপর বলল, 'না, বলতে পারব না; আপনি কি জানেন, এখান থেকে কী মাল ওর তোলার কথা?'

'না,' আমি উত্তর দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমার 'নান' সম্বন্ধে সব উৎসাহ উবে গেছে। আর তাই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে হোমস্ট্র্যান্ড কতদূর হবে, পুরনো মাইলের হিসেবে।

'হোমস্ট্র্যান্ড? মনে হয়...'

'অথবা ভেরলাঙস্ল্যাশ কত দূর হবে?'

'আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম? হোমস্ট্র্যান্ড কতদূরে...'

'ওহ, বলতে হবে না; এইমাত্র আমার মনে পড়ে গেছে।' আমি ওকে বাধা দিলাম, 'আপনি একটু তামাক পাতা দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না, অল্প একটু?'

তামাক পাতা নিয়ে লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। তামাক পাতাটা ব্যবহারই করলাম না, পকেটে রেখে দিলাম। ও কিন্তু তখনও আমার দিকে চেয়ে আছে, বোধহয় কোনোভাবে ওর কিছু সন্দেহ হয়েছে। আমি দাঁড়িয়েই থাকি, কিংবা হাঁটতেই থাকি, ওর সন্দেহের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করেই চলেছে। এই সামান্য লোকটা আমাকে হয়রাণ করবে, এটা সহ্য করা যায় না। আমি ঘুরে, নিজেকে টেনে নিয়ে এলাম ওর কাছে, বললাম,

'বাইন্ডার!' মাত্র একটা কথা, 'বাইন্ডার।' আমি ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ ধরে, চোখ দিয়ে নয়, সর্বশরীর দিয়ে যেন ওকে দেখছি। তারপর আবার পা টেনে টেনে রেলওয়ে স্কোয়ার-এর দিকে গেলাম। লোকটা একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, শুধু আমার দিকে স্থির দৃষ্টি।

'বাইন্ডার!' হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। এই কথাটাই কি ভাবিনি, যেই মুহূর্তে ওই লোকটাকে আমি দেখলাম? মনে হচ্ছে, ওকে আগে কোথায় যেন দেখেছি। হ্যাঁ, এক উজ্জ্বল সকালে, গ্র্যান্ডসেন-এ, যখন আমি আমার ওয়েস্ট কোটটা বন্ধক রাখছিলাম। মনে হচ্ছে, কতদিন আগেকার কথা!

যখন এই সব কথা ভাবছি, তখন আমি রেলওয়ে স্কোয়ার আর হার্বার স্ট্রিটের মোড়ে একটা বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ শরীরটা শিউরে উঠল আর আমি গুঁড়ি মেরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পালাতে না পেরে আমি সব লজ্জা শরম বিসর্জন দিয়ে উগ্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম। কোনো উপায় নেই। 'কমোডর' এর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেছি। বয়েই গেল, কিছু যায় আসে না, এই রকম উগ্র ভাব করলাম, তারপর দেয়াল থেকে এক পা সরে যাবার চেষ্টা করলাম, যাতে ওঁর নজরে পড়ি। ওঁর সহানুভূতি পাওয়ার জন্য নয়, নিজেকে মেরে ফেলার জন্য, হাড়িকাঠে গলা দেওয়ার জন্য। রাস্তায় শুয়ে পড়ে ওঁকে

বলতে পারতাম আমার শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য, আমার মুখের ওপর পা দিয়ে হাঁটবার জন্য। ওঁকে শুভ সন্ধ্যাও জানালাম না।

বোধহয় 'কমোডর' আন্দাজ করলেন যে, আমার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। উনি হাঁটার গতি শ্লথ করলেন আর আমি ওকে থামানোর জন্য বললাম, 'একটা লেখা নিয়ে অনেক আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কিন্তু এখনও কিছুই লেখা হয়ে ওঠেনি।'

'তাই?' উনি জিজ্ঞাসুভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'তাহলে লেখাটা শেষ হয়নি বলুন?'

'না, শেষ করে উঠতে পারিনি।'

ওঁর এই সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে আমার চোখে জল এসে গেল আর আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার তিক্ত প্রচেষ্টায় কাশতে লাগলাম। 'কমোডর' নাকটা খামচে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'ইতিমধ্যে বেঁচে থাকার কোনো রসদ জুটেছে কি?' উনি প্রশ্ন করলেন।

'না,' আমার জবাব, 'তা-ও জোটেনি। আজকে আমি কিছুই খাইনি, কিন্তু ...'

'ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার পক্ষে না খেয়ে মরাটা ঠিক হবে না।' উনি পকেটে হাত দিয়ে বললেন।

এতে আমার মধ্যে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব জাগল আর আমি দেওয়ালের দিকে কোনোরকমে সরে গিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, উনি ওর টাকার ব্যাগের মধ্যে আঙুল ঢোকালেন, আর একটা আধ গিনি বার করে আমাকে দিলেন।

উনি কোনো ব্যস্ততা দেখালেন না, স্রেফ আমার হাতে একটা আধ গিনি গুঁজে দিলেন আর একই সঙ্গে বলতে থাকলেন, আমাকে না খেয়ে মরতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। আমি তোতলাতে তোতলাতে একটু আপত্তি জানালাম আর সঙ্গে সঙ্গেই টাকাটা নিতে চাইলাম না। এটা আমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার... এটা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি...

'তাড়াতাড়ি কর,' উনি বললেন নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, 'আমি ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম; ট্রেন এসে গেল শুনতে পাচ্ছি।'

আমি টাকাটা নিলাম। আনন্দে বাকরোধ হয়ে গেছে, একটাও কথা বলতে পারছি না; এমনকি ওঁকে একবার ধন্যবাদও জানালাম না।

'এই ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েছ, এমন ভাবার কোনো দরকার নেই,' 'কমোডর' শেষ পর্যন্ত বললেন, 'আমি জানি, তুমি লিখতে পারবে।'

এই বলে উনি চলে গেলেন।

যখন উনি বেশ কয়েক পা এগিয়েছেন, আমার মনে পড়ল যে, এই মহানুভবতার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। আমি ওঁকে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি হাঁটতেই পারলাম না। আমার পা চলছে না, প্রায় মুখ থুবড়ে পরে যাচ্ছিলাম। উনি আমার থেকে দূরে, আরো দূরে চলে যাচ্ছেন। আমি আর চেষ্টা করলাম না। একবার ভাবলাম, ডাকি, কিন্তু সাহস হল না। তারপরে যখন সাহস

সঞ্চয় করে দু'একবার ডাকলাম, ততক্ষণে উনি বহুদূর চলে গেছেন আর আমার গলার স্বরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি, ওঁর দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দে শান্তভাবে কেঁদে চলেছি 'এ রকম মানুষ আর দেখিনি,' নিজেকে বলছি, 'উনি আমাকে আধ গিনি দিলেন।' আমি পেছন ফিরে ঠিক সেই জায়গাতে গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানটায় উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওর সমস্ত হাবভাবগুলো নকল করলাম, আধ গিনিটা আমার ভেজা চোখের সামনে ধরে, এপিঠওপিঠ ভাল করে দেখে, গলায় সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করে শপথ করলাম যে, কোনো সন্দেহ নেই, আমি হাতে যেটা ধরে আছি, সেটা একটা আস্ত আধ গিনি। ঘণ্টাখানেক পরে, একটা লম্বা ঘণ্টা, কারণ ততক্ষণে আমার চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, আমি ১১ নম্বর টমটেগাডেন-এর সামনে দাঁড়িয়ে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠাণ্ডা করে আমি দ্বিতীয়বার বাড়িটার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, সোজা 'পর্যটকদের জন্য খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা আছে' লেখা বাড়িটায়। ভেতরে ঢুকে আশ্রয় চাইলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিছানা পেয়ে গেলাম।

মঙ্গলবার।

একটা উজ্জ্বল, সূর্যকরোজ্জ্বল দিন। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে। চারিদিকে প্রাণোচ্ছল আনন্দ, খুশি খুশি মুখ আর, হাসি আর হাসি। ফোয়ারাগুলো পিচকারির মতো জল ছিটাচ্ছে, রোদ পড়ে জলের রঙ সোনালী আবার আকাশের রঙের মতো নীল।

দুপুর বেলা টমটেগাডেনের বাড়ি থেকে বেরোলাম- তখনও আমি ওখানেই থাকি আর বেশ আরামে আছি- শহরের দিকে চললাম। প্রফুল্ল মেজাজে সারাটা বেলা সবচেয়ে বেশি ভীড়ের রাস্তাগুলোয় অলসভাবে হাঁটলাম আর পথচারীদের দেখতে থাকলাম। সাতটার আগেই সেন্ট ওলাভ'স প্লেসের দিকে মোড় নিলাম আর ২ নম্বর বাড়ির জানালার দিকে চোরা দৃষ্টি হানলাম। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা হবে। সারাক্ষণ একটা সুস্বাদু ভয় ভয় ভাব। কী হবে? ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসলে আমি কি বলব? 'শুভ সন্ধ্যা?' নাকি, শুধু হাসব? ঠিক করলাম, মুখে হাসি থাকবে, অবশ্যই ওকে ঝুঁকে অভিবাদন করব।

এত তাড়াতাড়ি এসে গেছি ভেবে লজ্জা হল, তাই পালিয়ে এলাম। কার্ল যোহান-এর পথে খানিকটা ঘুরলাম আর ইউনিভার্সিটি স্ট্রিটের ওপর নজর রাখলাম। ঘড়িতে যখন আটটা বাজল, আমি ঘুরে আবার সেন্ট ওলাভ'স প্লেসের দিকে গেলাম। যেতে যেতে মনে হল বোধহয় কয়েক মিনিট দেরি হয়ে যাবে, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পা চালালাম। পায়ে খুবই চোট, এছাড়া আর কোনো অসুস্থতা নেই।

ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে শ্বাস টানলাম। ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ২ নম্বরের জানালার দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু ও এল না। ঠিক আছে, অপেক্ষা করব, কোনো

তাড়া নেই। ওর হয়তো দেরি হচ্ছে, আমি অপেক্ষা করতে থাকি। এতো নয় যে পুরো ব্যাপারটাই আমি স্বপ্ন দেখেছি। যে রাতে আমি প্রলাপ বকছিলাম শুয়ে শুয়ে, ওর সাথে আমার প্রথম দেখা সে রাতের কল্পনা নয়তো? আমি হতবুদ্ধি হয়ে ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম, মোটেই নিশ্চিত হতে পারছি না।

'হ্যালো!' আমার পেছন থেকে আওয়াজ এল। আমি শুনলাম, হালকা পায়ের শব্দ আমার কাছে এসে থামল এ-ও শুনলাম, কিন্তু ঘুরলাম না। শুধু সামনের সিঁড়ির দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

'শুভসন্ধ্যা,' সম্ভাষণ এল। আমি হাসতে ভুলে গেলাম; প্রথমে তো টুপিটা খুলিই নি, এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওকে পেছন থেকে আসতে দেখে।

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ?' ও জিজ্ঞেস করল। হেঁটে এসেছে বলে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস একটু দ্রুত।

'না, না, আমি একটু আগেই এসেছি,' আমি জবাব দিলাম। 'তাছাড়া বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেই বা কী ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি অন্যদিক থেকে আসবে।'

'মায়ের সঙ্গে কারো বাড়িতে গিয়েছিলাম। মা ওদের সঙ্গেই সন্ধেটা কাটাবে।'

'ও, তাই,' আমি বললাম।

আমরা আপন মনে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার কোনায় একজন পুলিশম্যান দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল।

'কিন্তু, আমরা যাচ্ছি কোথায়?' ও থেমে জিজ্ঞেস করল।

'যেখানে তুমি যেতে চাও।'

'ও! আচ্ছা। কিন্তু নিজে নিজে ঠিক করতে ভালো লাগে না।'

একটু বিরতি। তারপর কিছু বলার জন্যই আমি বললাম, 'তোমার জানালা অন্ধকার ছিল।'

'হ্যাঁ,' ও প্রফুল্ল স্বরে বলল, 'কাজের লোকের আজ সন্ধ্যাবেলা ছুটি, কাজেই বাড়িতে আমি একা।'

আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে ২ নম্বরের জানালাটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলাম যেন, আগে কখনো দেখিনি।

'তাহলে চল ওপরে তোমার ঘরে যাই' আমি বললাম, 'আমি না হয় সারাক্ষণ দরজায় বসে থাকব যদি তুমি চাও।'

তারপরেই আমার অনুতাপ হল যে, বড় বেশি আগে বেড়ে গিয়েছি। যদি এখন ও রেগে যায়, আমাকে ছেড়ে চলে যায়? যদি ওর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা না হয়? আঃ, আমার এই জঘন্য পোশাক। আমি ব্যাকুল হয়ে ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।

'তুমি নিশ্চয়ই দরজায় বসবে না,' ও বলল। খুব নরম করেই বলল, ঠিক এই কথাই বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই দরজায় বসবে না।'

আমরা ওপরে গেলাম।

ছোট বৈঠকখানাটা অন্ধকার, ও আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। আমার চুপ করে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, ও বলল, আমি কথা বলতে পারি। আমরা ঘরে ঢুকলাম। ও যখন মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, ল্যাম্পবাতি নয়, মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, তখন একটু হেসে বলল,

'তুমি আমার দিকে দেখবে না। ওঃ, আমার ভীষণ লজ্জা করছে, আর কখনো এমন করব না।'

'আর কখনো কী করবে না?'

'আমি আর কখনো,... না... দিব্যি... আমি আর কখনো তোমাকে চুমু খাব না।'

'খাবে না?' আমি বললাম, আর দুজনেই হেসে উঠলাম। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, ও পাশ দিয়ে পিছলে বেরিয়ে টেবিলের উল্টোদিকে চলে গেল। আমরা খানিকক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম, দুজনের মাঝখানে মোমবাতি।

'পারো তো আমাকে ধর,' ও বলল; আমি হাসতে হাসতে ওকে ধরতে চেষ্টা করলাম। ও লাফ দিয়ে সরে গেল, ওড়নাটা আলগা করল, টুপিটা খুলে ফেলল। ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো আমার নড়াচড়া লক্ষ করে যাচ্ছে। আমি নতুন উদ্যমে চেষ্টা করলাম, আর কার্পেটে পা আটকে পড়ে গেলাম, আমার চোট পাওয়া পা আমাকে আর খাড়া রাখতে পারল না। খুব লজ্জা পেয়ে কোনো রকমে উঠে দাঁড়ালাম।

'হা ঈশ্বর, তুমি কেমন লাল হয়ে গেছ।' ও বলল, 'কি বাজে ব্যাপারটা হল!'

'হ্যাঁ, খুব বাজে ব্যাপার,' আমি সহমত হলাম এবং নতুন করে ওকে ধরার চেষ্টা শুরু করলাম।

'মনে হচ্ছে, তুমি একটু খোঁড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বোধহয় একটু– মানে সামান্য একটু।'

'আগের বারে তোমার আঙুলে চোট ছিল, এবারে তোমার পায়ে চোট; তোমার চোটের সংখ্যা তো বিপজ্জনক।'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ। ক'দিন আগে আমার পায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে।'

'গাড়ি চলে গেছে! আবার মাতাল? হায় ভগবান, কেন? হে যুবক, তুমি কেমন জীবন যাপন কর?' ও আমাকে আঙুল তুলে শাসাল আর খুব গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল।

'এস, বসা যাক। না, না, দরজার কাছে নয়; তুমি তো সাংঘাতিক রক্ষণশীল। এখানে এস, তুমি ওখানে, আমি এখানে, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে... যাঃ, চাপা লোকের সঙ্গ কি বিরক্তিকর! নিজেকেই সব বলতে হবে, করতে হবে, কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। উদাহরণ দিচ্ছি; ধর, তুমি আমার চেয়ারের পেছনে হাত রাখলে; তুমি নিজেই ভেবে নিয়ে এই কাজ করতে পার, পার না? কিন্তু আমি যদি এ রকম কিছু বলি, তুমি বড় বড় চোখ করে তাকাবে, যেন বিশ্বাসই করতে পারছ না আমি কি বলছি। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। আমি অনেকবার এটা লক্ষ্য করেছি; তুমি এখন এটা

করছ; কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করাতে চেও না যে, তুমি সব সময়েই এমন লাজুক। যখন তুমি অন্যরকম কিছু করতে সাহস কর না, কেবল তখনই। যেদিন তুমি একটু মাতাল ছিলে, সেদিন তো খুব সাহস দেখিয়েছিলে, একেবারে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পেছু ধাওয়া করেছিলে আর তোমার রসিকতা দিয়ে আমাকে চিন্তায় ফেলেছিলে। মাদাম, আপনার বইটা পড়ে গেছে; আপনার বইটা নিশ্চয়ই পড়ে গেছে মাদাম। হাঃ হাঃ তুমি অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো এসব করেছিলে।'

আমি মনমরা হয়ে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে প্রচণ্ড জোরে, শিরার মধ্যে দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর এটার মধ্যে একটা অনন্য উপভোগ করার আনন্দ।

'কিছু বলছ না কেন?'

'তুমি কী ভালো!' আমি বললাম, 'আমি তো এখানে বসে তোমাকে দেখে মোহিত হয়ে যাচ্ছি, পুরোপুরি তোমাতে মজে গেছি... কোনো উপায় নেই– তুমি একটি অসাধারণ নারী যে,... কখনও কখনও তোমার চোখ দুটো এমন দ্যুতি ছড়ায় যে আমি এর মতো আর কোথাও দেখিনি... তোমার চোখ দুটোকে দেখে মনে হয় দুটি ফুল... আমি দারুণভাবে তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আর এটা এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার, কারণ ঈশ্বর জানেন, আমার তো কোনো সুযোগ নেই, এক ফোঁটা সুযোগ নেই। আচ্ছা, তোমার নামটা কী? না, না, আমাকে বলতেই হবে, তোমাকে সবাই কী নামে ডাকে। কাল সারাদিন আমি এটা নিয়ে ভেবেছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করার কথাও ভেবেছি, কিন্তু..., তুমি জানো তোমায় আমি কী নাম দিয়েছি? তোমার নাম দিয়েছি, ইয়ালাজালি। কী, নামটা পছন্দ তো? নামটায় কেমন সুন্দর একটা হালকা ওড়ার মতো ভাব আছে...'

'ইয়ালাজালি?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কি একটা বিদেশি ভাষা?'

'হুম। না তো, এটা তো বিদেশি নয়!'

অনেকক্ষণ আলোচনার পর আমরা পরস্পরকে নিজেদের নাম বললাম। ও সোফাতে আমার পাশে ঘেঁষে বসেছে, পা দিয়ে চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা গল্প করে যাচ্ছি।

'তুমি আজ সন্ধেবেলা দাড়ি কামিয়েছ,' ও বলল, 'আগের বারের চেয়ে একটু ভালোই লাগছে, মানে সামান্য একটু ভালো। ভেবো না যে,... না থাক; আগের দিন তুমি খুব অপরিচ্ছন্ন ছিলে, আর তোমার আঙুলে একটা ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো ছিল আর সেই অবস্থাতে তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে, আর তোমার সঙ্গে মদ খেতে, চেয়েছিলে; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি যাইনি।'

'ও, তার মানে আমার ওই ভ্যাগাবন্ড-এর মতো চেহারার জন্যই তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাওনি?'

'না,' ও চোখ নামিয়ে উত্তর দিল, 'ঈশ্বর জানেন, তা নয়। আমি ওরকম ভাবিই নি।'

'শোন,' আমি বললাম, 'তুমি এখানে একটা কল্পরাজ্যে বাস করছ, ভাবছ, আমি আমার পছন্দ মতো পোশাক পরতে পারি, পছন্দ মতো জীবন কাটাতে পারি, তাই না? আমি কিন্তু ঠিক সেইটাই করতে অসমর্থ; কারণ আমি অত্যন্ত গরিব।

ও আমার দিকে তাকাল। 'সত্যিই?' ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমার দুর্ভাগ্য, আমি তাই।'

কিছুক্ষণ পরে;

'ভালো, আমিও গরিব,' ও বেশ খুশি খুশি মাথা নাড়িয়ে বলল।

ওর সব কথাই আমার নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে, আমার হৃৎপিণ্ডে ফোঁটা ফোঁটা মদের মতো ঝরে পড়ছে। আমি যখন কিছু বলছি, তখন ও যেভাবে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে আমার কথা শুনছে, ওর এই ভঙ্গিটা আমায় মুগ্ধ করে তুলছে আর টের পাচ্ছি, ওর নিঃশ্বাস আমার গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে।

'তুমি কি জানো,' আমি বললাম, 'যে, ... রাগ করো না,... যখন কাল রাত্রে আমি শুতে গেলাম, আমার এই হাতটা এইভাবে ছড়িয়ে রেখেছিলাম, যেন তুমি এই হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছ... তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'সত্যিই?' কী সুন্দর!' একটু থেমে, 'কিন্তু তুমি খালি দূর থেকেই এইসব করতে সাহস কর, নইলে অন্য রকম...'

'তুমি বিশ্বাস কর না, আমি অন্য রকমও করতে পারি?'

'না, আমি বিশ্বাস করি না।'

'ও! আমার কাছ থেকে তুমি সবকিছু আশা করতে পার,' আমি বললাম আর ওর কোমরটা আমার হাত দিয়ে বেড় দিয়ে ধরলাম।

'আমি আশা করতে পারি?' ও বলল।

ও আমাকে ভীরু, নরম স্বভাবের মানুষ বলে মনে করে, এতে আমার বিরক্তি হল, প্রায় আহত হলাম বলা চলে। আমি নিজেকে শক্ত করে নিয়ে ওর হাত ধরলাম। ও আস্তে করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে বসল। আমার সাহস একেবারে উবে গেল; খুব লজ্জা পেলাম, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। আমি সত্যিই এখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত, নিজেকে কেউকেটা ভাবার মতো অবস্থায় নেই। যখন আমি মান্যগণ্য ভদ্রলোকের মতো থাকতাম, আমার সেই পুরনো, সচ্ছলতার দিনগুলোতে, যখন নিজের চেহারা বজায় রাখার মতো যথেষ্ট সংগতি ছিল, সেই সময়টায় যদি ওর সঙ্গে আমার দেখা হত, তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। আমার নিজেকে একেবারে অধঃপতিত মনে হল।

'এই যে, যে কেউ বুঝতে পারবে!' ও বলল, 'যে কেউ বুঝতে পারবে যে, সামান্য একটু ভুরু কোঁচকালেই তোমাকে দমানো যায়, তোমার কাছ থেকে একটু সরে বসলেই, তোমাকে লজ্জা পাইয়ে দেওয়া যায়'... ও চোখ বন্ধ করে, দুষ্টুর

মতো, আকর্ষণীয় উপহাসের ভঙ্গীতে হাসতে লাগল, যেন ওর দিকে তাকালেও ও সহ্য করতে পারবে না।

'ঠিক আছে, এবার দেখ, কী করি,' আমি বললাম, আর ওর কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার মারাত্মক রাগ হয়ে গেছে। মেয়েটার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? ও কি ভাবছে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ? হাঃ! তাহলে আমি,... কেউ বলতে পারবে না যে, আমি এ ব্যাপারে পেছু পা! মেয়েটার ওপর শয়তান ভর করেছে! যদি এটা কিছু করার ব্যাপার হয়, তাহলে...

ও চুপ করে বসে আছে। দুচোখ বোঁজা; আমরা কেউই কথা বলছি না। আমি ওকে শক্ত করে লোভীর মতো আমার বুকের ওপর জড়িয়ে ধরলাম, ও একটাও কথা বলল না। ওর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ওরটা, আমারটা, দুটোই। শব্দটা মনে হচ্ছে যেন দৌড়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ।

আমি ওকে চুমু খেলাম।

আমার নিজের সম্বন্ধে আর কোনো বোধ নেই। অর্থহীন কথাবার্তা বলছি, ও হাসছে, আমি ওর মুখে আদরের নাম ফিসফিস করে বলছি, ওর গালে আদর করছি আর বারবার চুমু খাচ্ছি। ওর জামার কয়েকটা বোতাম খুললাম আর জামার ভেতরে ওর স্তনের আভাস পেলাম- সাদা সুডৌল দুটি স্তন, জামার আড়াল থেকে দুটো মিষ্টি আশ্চর্যের মতো উঁকি দিচ্ছে।

'আমি দেখব,' বললাম আর জামার ফাঁকটা বড় করবার জন্যে আরও কয়েকটা বোতাম খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার হাতটা খুব কর্কশ; আমি নিচের বোতামগুলো খুলতেই পারলাম না, তাছাড়া জামাটা নিচের দিকে খুব টাইট।

'আমি দেখব, একটুখানি দেখব।'

ও আমার গলা জড়াল দুটি হাত দিয়ে, ধীরে, নরম ভঙ্গীতে, ওর কেঁপে কেঁপে ওঠা গোলাপী নাক থেকে সুগন্ধি নিঃশ্বাস সোজা আমার মুখে এসে লাগছে। তারপর এক হাত দিয়ে একটি একটি করে বোতাম খুলতে লাগল। লজ্জিত মুখে একটু হাসি, ছোট্ট একটু হাসি, মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দেখছে ওর ভয় ভয় ভাবটা আমি লক্ষ করছি কিনা। ও ফিতেটা আলগা করল, ভেতরের জামাটার হুক খুলল, মন্ত্রমুগ্ধ, ভীত আর আমি আমার জড়োসড়ো হাতের আঙুলে ওর পোশাকের বোতাম, ফিতে, এগুলো...

ও কী করছে, সেটা থেকে আমার মনোযোগ সরিয়ে নেবার জন্য ও বাঁ হাত দিয়ে আমার কাঁধে চাপড় দিতে লাগল আর বলল, 'তোমার মাথা থেকে কত চুল উঠেছে!'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম আর ওর স্তনে আমার মুখ লাগাবার চেষ্টা করলাম। এই মুহূর্তে ও সমস্ত জামাকাপড় আলগা করে শুয়ে আছে। হঠাৎ ও মত পরিবর্তন করল, ভাবল, অনেক দূর এগিয়েছে, আর নয়। এবং জামাকাপড় ঠিক করে গা ঢেকে নিল

আর একটু উঠে পড়ল; এবং ওর জামাকাপড়ের ব্যাপারে অস্বস্তিটা ঢাকবার জন্য, আমার মাথার চুল উঠে উঠে কাঁধের ওপর পড়েছে, এই ব্যাপারে নতুন করে মন্তব্য করতে লাগল।

'কী কারণে তোমার মাথার চুল উঠে যাচ্ছে?'

'জানি না।'

'ও, নিশ্চয়ই। কারণ তুমি খুব বেশি মদ খাও, আর হয়তো... ছিঃ, আমি ওসব বলতে পারব না। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। না, আমি তোমার এ রকম কোনো ব্যাপার বিশ্বাস করি না। তোমার মতো অল্পবয়েসি যুবক, এখনই তার এত এত চুল উঠে যাচ্ছে, এটা ভাবা যায় না। এবার বলতো, তুমি কী রকম জীবন কাটাও। আমি নিশ্চিত যে, সেটা খুব ভয়াবহ! সত্যি কথা বল, শুনছ, এড়িয়ে যেও না। যাই হোক, তুমি চেপে গেলেও আমি ঠিক ধরে ফেলব- এবার বল!'

'ঠিক আছে, বলছি; তার আগে তোমার বুকে একটু চুমু খাব, তারপর।'

'পাগল? বলতে শুরু কর।'

'না প্রিয়, আমাকে আগে চুমু খেতে দাও।'

'না, এখনই নয়... পরে.... আগে আমি শুনতে চাই তুমি কেমন লোক, হ্যাঁ আমি জানি যে, সেটা খুবই ভয়াবহ।'

আমার খুব আঘাত লাগল যে, ও আমাকে এত খারাপ ভাবে। ওকে বরাবরের মতো সরিয়ে দিতে ভয় লাগছে আবার আমার জীবন-যাপন সম্বন্ধে ওর ভুল ধারণাও সহ্য করতে পারছি না। আমাকে ওর উপযুক্ত হতে হবে, দুর্নাম ঘোচাতে হবে, ওকে দেখাতে হবে যে ও একজন দেবদূতের মতো লোকের পাশে বসে আছে। আমার কতবার পদস্খলন হয়েছে, আমি হাতে গুনতে পারি। আমি ওকে সব বললাম, সব সত্যিগুলোই বললাম। যা যা হয়েছিল, তার থেকে খারাপ কিছু বলিনি, বা ওর সহানুভূতি আদায় করার কোনো ইচ্ছেই আমার হয়নি। ওকে আমি এও বললাম যে, এক সন্ধ্যায় আমি পাঁচ শিলিং চুরি করেছিলাম।

ও চুপচাপ বসে আমার কথা শুনছিল, মুখটা অল্প হাঁ হয়ে আছে, মুখটা ফ্যাকাশে, ভীত, চকচকে চোখ দুটো একেবারে বিভ্রান্ত। আমি এবার দুঃখের আবহাওয়াটা সরানোর চেষ্টা করলাম আর সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

'আরে, ওসব শেষ হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'এ রকম ব্যাপার আর ঘটবে না। আমি রক্ষা পেয়েছি...'

কিন্তু ও খুব ভেঙে পড়েছে। 'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।' শুধু এই কথাই বলে চুপ করে গেল। মাঝে মাঝেই এই একই কথা বার বার বলতে লাগল, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।' আর তারপরেই চুপচাপ।

আমি হাসি ঠাট্টা করতে লাগলাম, ওকে ধরলাম, সুড়সুড়ি দিলাম, বুকের ওপর চেপে ধরলাম। ও ওর জামায় আবার বোতাম লাগিয়ে নিয়েছে। এতে আমার শুধু বিরক্তি হল, তাই নয়, রীতিমতো আঘাত পেলাম। ও নিজের জামাটার বোতাম

আবার আটকাল কেন? আমার মাথার চুল উঠে যাওয়ার জন্য আমি নিজে যদি দায়ী হতাম, ওর চোখে কি আমি তার চেয়েও অযোগ্য? আমি যদি লম্পটের মতো ব্যবহার করতাম, তাহলে কি ও আমার কথা আরো বেশি করে ভাবত? আর কোনো অর্থহীন ব্যাপার নয়, যা করতে চাই, সেটা করতেই হবে, অতএব... আমি ওকে সোফায় শুইয়ে দিলাম। ও একটু মৃদু লড়াই চালাল, আর অবাক হয়ে গেল।

'না.... তুমি কী চাও?' ও জিজ্ঞেস করল।

'আমি কী চাই?' হাঃ, ও জিজ্ঞেস করছে আমি কী চাই। আমি এটা করতে চাই, সোজা সাপটা কথা, এটা করতে চাই। আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমি তেমন লোক নই, যাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যায়, যাকে ভ্রূ কুঁচকে দমানো যায়। না, না, এটা সত্যি; আমি আগে কখনোই আমার উদ্দেশ্য সফল না করে এই রকম একটা কাজ থেকে সরে আসিনি..... কাজেই আমি ওই কাজেই এগিয়ে গেলাম।

'না! না, ... কিন্তু?'

'হ্যাঁ, আমি এটাই করতে চাই।'

'না, না, শোন!' ও চেঁচিয়ে উঠল আর এই যন্ত্রণাদায়ক কথাগুলো উচ্চারণ করল, 'তুমি যে পাগল নও, সে সম্বন্ধে আমি তো নিশ্চিত নই।'

আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় নিজেকে সংযত করলাম, বললাম, 'কি বলছ তুমি?'

'ঈশ্বর জানেন, আমি ঠিকই বলছি! তুমি কীরকম অদ্ভুতভাবে তাকাও! আর যেদিন তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে, সেদিন তুমি তো মাতাল ছিলে না?'

'না; কিন্তু আমি তখন ক্ষুধার্তও ছিলাম না; একটু আগেই খেয়েছিলাম...'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আরও খারাপ ছিল।'

'তুমি কি চাও যে, আমার মাতাল হওয়াই ভাল ছিল?'

'হ্যাঁ,... আঃ... আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

আমি খানিকক্ষণ চিন্তা করলাম। না, এখন ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই ভর সন্ধেবেলা সোফার ওপরে, ছেড়ে দেওয়া যায় না। 'শায়া খুলে ফেল!' হাঃ, এই সব মুহূর্তে কী অজুহাত বার করবে ও, আমি তো জানি ও সতীত্বপনা দেখাচ্ছে। আমি অত কাঁচা নাকি? 'এই যে, চুপ, একদম চুপ, কোনো বাজে কথা নয়!'

ও অস্বাভাবিক শক্তিতে আমার সঙ্গে লড়াই করল, প্রচণ্ড গায়ের জোরে, লজ্জা-টজ্জা নয়। ওই সময় অসতর্কভাবে, আমার হাতে লেগে আলোটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল। ও হতাশ হয়ে লড়াই চালিয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত ফোঁপাতে লাগল।

'না, ওটা না- ওঃ, ওটা না! চাও তো আমার বুকে চুমু খেতে পার, কিন্তু ওটা নয়; হায় ঈশ্বর, দয়া কর...'

আমি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। ওর কথাগুলো থেকে এত ভয়, এত অসহায়তা ফুটে বেরোল যে, আমার হৃদয়ে তা আঘাত করল। ও আমাকে ওর বুকে চুমু খেতে দিয়ে আমার ক্ষতিপূরণ করতে চায়। কী মনোহর সারল্য! ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসা উচিত।

'কিন্তু প্রিয় সুন্দরী,' আমি বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'বুঝতে পারছি না, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না তুমি কী খেলা খেলছ।'

ও উঠে কাঁপা কাঁপা হাতে মোমবাতিটা জ্বালাল। আমি সোফায় হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। এখন কী হতে যাচ্ছে? আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।

ও দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

'এইরে, কাজের মেয়েটা এসে পড়বে!' ও বলল; এই প্রথম ও কথা বলল অনেকক্ষণ পরে। আমি ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালাম। ও নিজের জ্যাকেট নিয়ে পরতে গেল, কি ভেবে না পরে আবার রেখে দিয়ে ফায়ার প্লেসের কাছে গেল। ও যে আমাকে দরজা দেখাচ্ছে, এটা যাতে না মনে হয়, তাই আমি বললাম, 'তোমার বাবা কি আর্মিতে ছিলেন?' আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

'হ্যাঁ, উনি আর্মিতে অফিসার ছিলেন। তুমি জানলে কী করে?'

'আমি জানতাম না; হঠাৎ মাথায় এল।'

'এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ; কোনো কোনো জায়গায় এলে আমার এ রকম অন্তর্দৃষ্টি হয়। হাঃ হাঃ। এ-ও আমার এক ধরনের পাগলামি, কি বল?'

ও চট করে মুখ তুলে আমাকে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। মনে হল, আমার উপস্থিতি ওর বিরক্তি উৎপাদন করছে, আর তাই আমি যাবার জন্য তৈরি হলাম। দরজার দিকে এগোলাম। ও আমাকে আর চুমু খাবে না? আমার দিকে হাতও বাড়িয়ে দেবে না? আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম।

'তুমি তাহলে এখন যাচ্ছ?' ও বলল, কিন্তু ফায়ার প্লেসের কাছেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আমি উত্তর দিলাম না। হতবুদ্ধির মতো কোনো কথা না বলে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। যখন আর কিছুই হবে না, তাহলে আমাকে শান্তিতে যেতে দিচ্ছে না কেন? ওর কী হয়েছে? আমি যে চলে যাবার জন্যে তৈরি, মনে হচ্ছে, এতে ওর কিচ্ছু যায় আসে না। ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য আমি কথা খুঁজতে লাগলাম, এমন কথা, যা বেশ ভারী, ওজনদার, ওকে আঘাত করবে আর ওর ধারণাটাও পালটে যাবে। এত সব ভেবেও, আমি কিন্তু নিজের গর্ব, গাম্ভীর্য এবং আত্মসম্মানের কথা ভুলে গিয়ে, তুচ্ছ কথা বলতে লাগলাম। ভারী, আঘাত করা কথা মুখে আসছে না, কেবল অর্থহীন যত কথাবার্তা। ও আমাকে কেন সোজাসুজি চলে যেতে বলতে পারছে না? আমি জানতে চাইলাম। সত্যিই তো, কেন বলছে না? এর জন্য অস্বস্তি হওয়ার কোনো দরকার নেই। কাজের মেয়েটা এসে পড়বে, এটা না মনে করিয়ে দিয়ে, সোজা বলতে পারত, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও, আমার এখন মাকে আনতে যেতে হবে, আর রাস্তা দিয়ে তোমার সঙ্গে আমি যেতে চাই না।' ও কি এ রকম ভাবছে না? আমি নিশ্চিত যে, ও এটাই ভাবছে।

'হা ঈশ্বর, ও কথা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর! ওটা হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে,' ও বলে উঠল; কিন্তু তারপরেও ও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, আমার দিকে এগিয়ে এল না।

'এবার তাহলে আমি যাচ্ছি। দেখছ না, আমার হাত দরজার হাতলে? বিদায়,' আমি বললাম, 'আমি দু'বার বিদায় বললে, তুমি উত্তর দেবে। আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করার কথা বলছি না, কারণ তাতে তোমার মনঃকষ্ট বাড়বে। কিন্তু বল, তুমি কেন আমাকে শান্তি দিলে না? আমি তোমার কী করেছি? আমি তো তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। তাহলে কেন তুমি আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, যেন আমাকে তুমি চেনই না? তুমি আমাকে একদম ফাঁকা করে দিয়েছ, আগে যা ছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত করে দিয়েছ; তবু জেনো, আমি পাগল নই। তুমি জানো, তুমি ভেবে দেখ, আমার কিছুই হয়নি। কাছে এসো, হাত বাড়িয়ে দাও, নইলে আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমি খালি তোমার সামনে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসব। এক মিনিটের জন্যে, বসব কি? না, না, ঠিক আছে, বসব না, তুমি ভয় পাচ্ছ। ঈশ্বর, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো নড়ছি না! তোমার পায়ের কাছে, কার্পেটের ওই লাল জায়গাটায়, আমি শুধু হাঁটু মুড়ে বসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম, তোমার চোখে ভয়, তাই আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ, আমার কাছে আসতে চাইছ না। আমি খালি ভাবছি, তুমি কেমন মানুষ, আমাকে পাগল বলতে তোমার বাধল না? এটা তো সত্যি নয়, আর তুমি বিশ্বাসও কর না। অনেক দিন আগে, এক গ্রীষ্মকালে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। খুব পরিশ্রম করছিলাম, আর ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়া উচিত ছিল। অথচ আমি অন্য ব্যাপারে বড় বেশি চিন্তা করছিলাম। এটা কিন্তু দিনের পর দিন ঘটেছে। আমার মনে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু ভুলে যেতাম– ঈশ্বর জানেন, কথাটা সত্যি! যদি মিথ্যা বলি, আমার যেন মৃত্যু হয় এই মুহূর্তে, এইখানেই। কাজেই বুঝতে পারছ, তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ। আমার অন্ন-সংস্থান ছিল না বলেই এটা করেছিলাম, তা নয়। আমি ধার পেতে পারতাম, ইঙ্গেব্রেট এর কাছে, অথবা গ্রেভসেন-এর কাছে। কখনও কখনও আমার পকেটে অনেক টাকা-পয়সাও থাকত, অথচ তা সত্ত্বেও, আমি খাবার কিনিনি, কারণ আমি খেতেই ভুলে যেতাম। শুনছ? কিছু বলতে হবে না, উত্তর দিতে হবে না, আগুনের কাছ থেকে একদম নড়বে না, ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যাচ্ছি।'

ও দৌড়ে আমার কাছে চলে এল, আর হাত বাড়িয়ে দিল। আমি অবিশ্বাসের চোখে ওর দিকে তাকালাম। ও কি এটা আন্তরিকভাবে করছে, না, আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে করছে? ও আমার গলা জড়িয়ে ধরল; ওর দুচোখে জল। আমি শুধু দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ও মুখটা উঁচু করে বাড়িয়ে ধরল। আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না; নিশ্চয়ই ও স্বার্থত্যাগ করছে, এই সব কিছু শেষ করে দেবার জন্যে।

ও কিছু একটা বলল; মনে হল, 'এসব কিছু সত্ত্বেও, তোমাকে আমার ভাল লাগে,' এই জাতীয় কিছু। খুব নিচু, অস্পষ্ট স্বরে ও কথাটা বলল। হয়তো, আমি ঠিকমতো শুনতে পেলাম না। হয়তো, ও এই কথাগুলোই বলেনি। কিন্তু ও অধৈর্যভাবে আমার বুকের ওপর পড়ে কিছুক্ষণ আমার গলা জড়িয়ে ধরে রইল, পায়ের ডগায় ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে উঠে আমাকে পুরো এক মিনিট জড়িয়ে ধরে রইল। আমার ভয় হল, ও হয়তো জোর করে ওর কোমলতা আমাকে দেখাতে চাইছে, তাই আমি শুধু বললাম, 'তুমি কত ভালো!'

আর বেশি কিছু বললাম না। ওকে সজোরে একবার বুকে চেপে ধরলাম, তারপর পিছু হটে দরজার দিকে এসে, বাইরে বের হয়ে এলাম। ও আমার পেছনে, ভেতরে দাঁড়িয়ে রইল।

৪

শীত পড়ে গেছে– কড়া, ভিজে শীত, প্রায় তুষারপাতহীন। সারা সপ্তাহ ধরে কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার, দীর্ঘ রাত্রি, রাত-ভর একঝলক টাটকা তাজা বাতাসও নেই। রাস্তায় প্রায় সারা দিন-ভর গ্যাসের বাতি জ্বলে, তবু কুয়াশায় পথচারীরা একজন আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সব রকম শব্দ, গির্জার ঘণ্টার শব্দ, ঘোড়াগাড়িগুলোর ঘোড়ার গলার ঘণ্টির শব্দ, লোকজনের গলার আওয়াজ, ঘোড়ার খুরের শব্দ, সব যেন মুখচাপা শব্দ মনে হয়, ঘন বাতাসের মধ্যে দিয়ে চাপা খন্‌খনে শব্দ করে আসে, সব কিছুর মধ্যে ঢুকে গিয়ে মৃতপ্রায় করে তোলে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ আবহাওয়া একই রকম থেকে যায়।

আর আমি একইভাবে ভেটারল্যান্ডে পড়ে আছি। এই সরাইখানাটার সঙ্গে আমি বেশি বেশি জড়িয়ে যাচ্ছি, এই পর্যটক আবাসের সঙ্গে, যেখানে আমি আশ্রয় পেয়েছি, এই সব কিছু আমার উপোসী অবস্থা সত্ত্বেও। আমার টাকা পয়সা বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, তবু আমি এই জায়গাতেই পড়ে আছি, যেন এর ওপর আমার অধিকার জন্মে গেছে, যেন এটাই আমার বাড়ি। বাড়িওয়ালি এখনও পর্যন্ত কিছুই বলেনি। কিন্তু ওকে টাকা পয়সা দিতে পারছি না বলে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে, বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, আমি আবার লেখা শুরু করেছি। কিন্তু যা লিখছি, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। যদিও খুব ভোর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু ভাগ্য আমার সহায় হচ্ছে না। আমি যাই লিখি না কেন, সব অর্থহীন, বাজে লেখা হচ্ছে। সৌভাগ্য উড়ে পালিয়েছে, আমি অকারণ পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

তিন তলার একটা ঘরে, সবচেয়ে ভালো অতিথিদের জন্য ঘরে, আমি বসে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যখন আমার হাতে টাকা ছিল, সেই প্রথম সন্ধ্যা থেকেই আমি এই

ঘরে শান্তিতে বাস করছি। সব সময় আমার মনে আশা ছিল যে, যে কোনো বিষয়ে একটা ভালো লেখা লিখে ফেলতে পারব, যাতে এই ঘরের ভাড়া এবং আর যে সব ধারটার আছে, সব শোধ দিতে পারি। এই জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। একটা লেখা শুরু করেছি যেটা নিয়ে আমার অনেক আশা– আগুন সম্বন্ধে একটা রূপক– একটা গভীর অর্থবহনকারী রচনা, যেটার ওপর আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ করব এবং 'কমোডর'-এর কাছে নিয়ে যাবো তাঁর দেনা শোধ করতে। 'কমোডর' বুঝতে পারবেন যে, তিনি একজন দক্ষ লেখককে সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি শেষ পর্যন্ত এটা বুঝবেন; আমাকে এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আমার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হয় এবং আমার লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি। আমি এখন সম্পূর্ণ ঠিক আছি। বাড়িওয়ালি রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমাকে কিছু খেতে দেয়, অল্প একটু রুটি-মাখন, আর আমার স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রায় সেরেই গেছে। আমার এখন আর লেখার সময় হাতে কাপড় জড়াবার দরকার হয় না আর তিনতলার জানালা থেকে নিচের রাস্তায় সোজা তাকাতে পারি। মাথা ঘোরে না। আমি এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি, আর তাই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, এতদিনেও আমার রূপক-বর্ণনা লেখাটা শেষ হল না। আমি বুঝতেই পারছি না কেন...

কিন্তু একদিন এল, যেদিন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমি কত দুর্বল হয়ে পড়েছি, আর আমার মগজ কি রকম ভোঁতা আর কর্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ওইদিন আমার বাড়িওয়ালি আমার কাছে একটা হিসাবের কাগজ নিয়ে এল আর আমাকে ওটা দেখতে বলল। ও বলল হিসাবে কোথাও গণ্ডগোল আছে, কারণ ওর নিজের হিসাবের খাতার সঙ্গে এই কাগজের হিসাব মিলছে না; অথচ ও ভুলটা কোথায় আছে, ধরতই পারছে না।

কাজে লেগে গেলাম। বাড়িওয়ালি আমার উল্টোদিকে বসে দেখছে। আমি একবার ওপর থেকে নিচে, তারপর নিচ থেকে ওপরে, দু'বার যোগ করলাম। যোগফল একই হল, কোনো ভুল নেই। আমি মেয়েলোকটার দিকে তাকালাম, ও আমার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমার নজরে পড়ল, মেয়েলোকটা গর্ভবতী।

'যোগফল ঠিকই আছে,' আমি বললাম।

'না, আরেকবার দেখুন' ও জবাব দিল, 'এত টাকা হতেই পারে না, আমি নিশ্চিত।'

আমি আবার প্রতিটি লাইন মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম- ২টো রুটি $২\frac{১}{২}$ পে. ১টা ল্যাম্প চিমনি ৩ পে. সাবান ৪ পে. মাখন ৫ পে.... মুদি দোকানের জিনিসপত্তরের এই সামান্য ব্যাপারটা হিসাব করতে খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আমি সত্যি সত্যিই চেষ্টা করলাম ভুল বার করতে, কিন্তু কোনো ভুলই নেই। বেশ কিছুক্ষণ এগুলো দেখতে দেখতে, অঙ্কগুলো

আমার মধ্যে নাচতে লাগল। আমি আর জমা বা খরচ কিছুই আলাদা করে বুঝতে পারছি না, সমস্ত জিনিস গুলিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা লাইনে এসে আটকে গেলাম, ৩ $\frac{৫}{১৬}$ পাউন্ড চিজ ৯ পে.।'

আমার মাথা গুবলেট হয়ে গেল। আমি বোকার মতো চিজ-এর দিকে চেয়ে রইলাম, আর এগোতে পারলাম না।

'কি বাজে কাঁকড়ার মতো হাতের লেখা,' আমি বললাম, 'ঈশ্বর রক্ষা করুন, এই যে এখানে ১ পাউন্ডের ১৬ ভাগের ৫ ভাগ চিজ লেখা রয়েছে, হাঃ হাঃ। কেউ কখনো এমন জিনিস শুনেছে? হ্যাঁ দেখুন, নিজেই দেখুন।'

'হ্যাঁ, ও বলল, 'এটা ডাচ চিজ, এভাবেই লেখা হয়ে থাকে। আর ১৬ ভাগের ৫ ভাগ মানে ৫ আউন্স, কাজেই এটা ঠিকই আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেটা জানি,' আমি বাধা দিয়ে বললাম, যদিও সত্যি বলতে কি, আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

আর একবার এই ছোট্ট হিসাবটা মেলাতে চেষ্টা করলাম, কয়েক মাস আগে হলে এক সেকেন্ডে করতে পারতাম। আমি ঘেমে গেলাম, চোখ পিটপিট করে সর্বশক্তি দিয়ে এই অঙ্কের রাশিগুলোকে গুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলাম, পারলাম না। এই ৫ আউন্স চিজ আমাকে একদম মেরে ফেলল। আমার মাথার ভেতর কিছু যেন ছিঁড়ে গেল। তা সত্ত্বেও ওকে দেখাবার জন্য আমি ঠোঁট নাড়ালাম, দু'একটা সংখ্যা জোরে জোরে আওড়ালাম, আস্তে আস্তে নিচের দিকে আঙুল নামিয়ে গুনবার ভান করলাম, যেন এইবার যোগফলটা বেরিয়ে যাবে। ও চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব ভালো করে দেখলাম, আমার মতে, এই হিসাবে কোনো ভুল নেই।'

'নেই? সত্যিই কোনো ভুল নেই?' মেয়ে লোকটা বলল। কিন্তু আমি বুঝলাম যে, ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি আর মনে হল, ওর কথার মধ্যে খানিকটা অপমান মিশিয়ে দিল। যা আমি আগে কোনোদিন ওর কথায় শুনিনি। ও মন্তব্য করল, আমি বোধহয় ১৬ ভাগের হিসাব আগে কোনোদিন দেখিনি বা করিনি। কাজেই ও অন্য কাউকে হিসাবটা দেখাবে, যে ১৬ ভাগের হিসাব বোঝে। আমাকে আঘাত করার জন্য কিন্তু ও একথা বলল বলে মনে হল না। মনে হল ও খুব চিন্তিত হয়েই বলল। দরজার কাছে গিয়ে ও আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'মাপ করবেন, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।' তারপর চলে গেল।

একটু পরেই আবার দরজা খুলে ও ঢুকল। বুঝলাম সিঁড়ি অব্দি গিয়েই ও ফিরে এসেছে।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, তাই না? আপনি এখানে আসার পর গতকালই তিন সপ্তাহ হয়ে গেল। এত বড় সংসার চালানো সোজা নয়। কাজেই আমি ধারে লোক রাখতে পারি না।'

আমি ওকে থামালাম। 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমি একটা লেখা লিখছি। ওটা শেষ হলেই আপনার টাকা পেয়ে যাবেন... নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'ঠিক আছে; কিন্তু আপনার এই লেখা কোনোদিন শেষ হবে না।'

'আপনি কি তাই মনে করেন? আমার অন্তরাত্মা আগামীকাল, হয়তো আজ রাত্রেই আমাকে দিয়ে লেখাটা শেষ করিয়ে দেবে, খুব বেশি হলে পনেরো মিনিটেই এবং আজ রাত্রেই। আমার লেখার ধরনটা অন্য লোকের মতো নয়। রোজ বসে বসে কিছুটা করে লেখা, এটা আমার আসে না। আমাকে ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় এবং কেউ বলতে পারে না কখন আমার অন্তর্নিহিত শক্তি আমায় দিয়ে কাজ করাবে– তার নিজস্ব সময় আছে...'

বাড়িওয়ালি চলে গেল বটে, কিন্তু মনে হয় আমার ওপর ওর ভরসা নষ্ট হয়ে গেল। একা হতেই আমি লাফিয়ে উঠে হতাশায় চুল ছিঁড়তে লাগলাম। আমার উদ্ধার নেই, কোনো উদ্ধার নেই! আমার মগজে আর কিছু নেই, দেউলে হয়ে গেছি।

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালাম। কয়েকটা বাচ্চা ফুটপাথে খেলছে। গরিব পাড়ার গরিব, জীর্ণ পোশাক পরা বাচ্চারা। একটা খালি বোতল নিয়ে লোফালুফি করছে আর চেঁচাচ্ছে। একটা গাড়ি যাচ্ছে, পুরনো আসবাবপত্র ঠাসা, হয়তো কোনো গরিব পরিবার বাসা পাল্টাচ্ছে। পোকায় খাওয়া বিছানা, বিছানার চাদর, পুরনো ঘুনধরা কাঠের ড্রয়ার, তিন ঠ্যাং ওয়ালা লাল রংয়ের চেয়ার, পুরনো গদি, পুরনো ইস্ত্রি, টিনের বাসন-কোসন। একটা বাচ্চা মেয়ে– নাক দিয়ে সর্দ্দি গড়াচ্ছে, জিনিসপত্রগুলোর ওপরে বসে আছে, দুটো ছোট ছোট নীল হয়ে যাওয়া হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে, যাতে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে না যায়। আর, রাস্তার বাচ্চাগুলোর খালি বোতল লোফালুফির খেলা দেখছে...

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছি। বাড়িওয়ালির কাজের মেয়েটা আমার ঘরের পাশেই রান্নাঘরে গান গাইছে, শুনতে পাচ্ছি। চেনা গান, শুনছি, কোথাও বেসুরো গাইছে কিনা। আমার হুঁশ একদম ঠিক আছে।

হঠাৎ রাস্তায় দুটো বাচ্চা লাফিয়ে উঠল আর পরস্পরকে গাল দিতে লাগল। দুটো ছোট ছেলে; তার মধ্যে একটাকে আমি চিনি, বাড়িওয়ালির ছেলে। আমি জানালাটা খুলে দিলাম ওরা কী বলছে শোনবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য বাচ্চাগুলো জানালার নিচে ভীড় করে দাঁড়িয়ে গেল আর লুব্ধ চোখে ওপর দিকে চেয়ে রইল। ওরা কী আশা করছে? ওপর থেকে কিছু নিচে ছুঁড়ে ফেলা হবে? শুকনো ফুল, মাংসের হাড়, সিগারেটের টুকরো, অথবা অন্য কিছু, যা নিয়ে ওরা খেলতে পারবে, মজা করতে পারবে? ওরা ওপর দিকে তাকিয়ে, ওদের বরফে ঠাণ্ডা মুখ আর অবর্ণনীয় লুব্ধ চোখ। লড়ুয়ে বাচ্চা দুটো কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

দুটো ছেলেরই মুখ থেকে ভনভনে মশা মাছির মতো খারাপ খারাপ কথা বেরিয়ে আসছে। চোর ছ্যাঁচোরদের মতো অশ্রাব্য গালিগালাজ, নাবিকদের দিব্যি গালা,

যেগুলো জাহাজঘাটা থেকে শিখেছে, আর ওরা লড়াই-এ এমনই মত্ত যে, কখন বাড়িওয়ালি বেরিয়ে এসেছে, খেয়ালই করেনি।

ওর ছেলে বলল, 'ও আমাকে গলা টিপে ধরেছিল, আমি অনেকক্ষণ শ্বাস নিতে পারিনি,' তারপর অন্য ছেলেটার দিকে ঘুরে তাকিয়ে চিৎকার করল, 'নরকে যা, নোংরা বাঁদরের বাচ্চা! তোর মতো পোকা-মাকড় আমার মতো ভদ্রলোকের গলা টিপে ধরবে? তোকে আমি...'। অন্য ছেলেটা দাঁত বের করে হাসছে।

ওই গর্ভবতী মা-টা ওর বিশাল শরীর নিয়ে পুরো রাস্তাটা দখল করে ওর দশ বছরের ছেলের হাত চেপে ধরে টানতে লাগল। 'শ্ শ্! মুখ বন্ধ কর। এই রকম কাঁচা খিস্তি করছিস, মনে হচ্ছে বেশ্যা পাড়ায় অনেক দিন ছিলি। চল, ভেতরে চল!'

'না, যাবো না।'

'যাবি না? চল ভেতরে।'

'না, যাবো না।'

আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, মা-টার মেজাজ গরম হচ্ছে। এই কদর্য দৃশ্যটা আমাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি চেঁচিয়ে বাচ্চাটাকে ওপরে আমার কাছে আসতে বললাম। দু'বার ডাকলাম, যাতে ওদের মনোযোগ আকর্ষিত হয় আর গোলমালটা থেমে যায়। দ্বিতীয়বারের ডাকটা বেশ জোরে হওয়ায় মা-টা শুনতে পেল আর ওপরে আমার দিকে তাকিয়েই নিজেকে সামলে নিল। তারপর আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাচ্চাকে টানতে টানতে ভেতরে ঢুকে গেল। যেতে যেতে বাচ্চাটাকে বলল, 'ছিঃ, অন্য লোকে তোর বদমায়েসি দেখল, তোর লজ্জা হওয়া উচিত।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলাম, শুনলাম, কিছুই নজর এড়াল না। প্রখর মনোযোগ, সব ছোট ছোট ব্যাপারগুলোও আমার চেতনা শুষে নিল। কাজেই আমার মাথা ঠিকই আছে, ঠিকই কাজ করছে। আমার মাথায় কোনো গণ্ডগোল নেই। নিজেকে বললাম, শুধু শুধু নিজের মাথা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ কেন? এসব মূর্খামির শেষ হওয়া উচিত। পাগল হলে কী এই সব ছোটখাটো ব্যাপারগুলোও নিখুঁতভাবে লক্ষ করতে আর গ্রহণ করতে পার? ওই তুচ্ছ, হাস্যকর ভিখারির খাদ্য ১৬ ভাগের ৫ ভাগ চিজ-টার ব্যাপারটা আর ওই মুদি দোকানের হিসাবটার জন্য তোমার ব্যাপারস্যাপার দেখে হাসি পায়। হাঃ হাঃ, একটা চিজ তার ওপর লবঙ্গ আর গোলমরিচ দেওয়া। এই চিজ-এর ওপর পোকার চাষ করা যায়। যে কোনো চালাক, বুদ্ধিমান লোকও এই হাস্যকর চিজটার ব্যাপারে বিভ্রান্ত হতে পারে। আরে ওই চিজটার গন্ধেই লোকের বারোটা বেজে যাবে... এইভাবে এই চিজ এবং অন্য সমস্ত ডাচ চিজের নামে উপহাস করতে লাগলাম... আরে, কোনো ভালো খাবার জিনিসের হিসেব করতে দাও, আমি বললাম, ভালো ডেয়ারি মাখনের ১৬ ভাগের ৫ ভাগ হিসাব করতে দাও, তবে তো কথা।

নিজের খেয়ালে জ্বরো রোগীর মতো হাসতে লাগলাম, আর এটাতে মনটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। আমি এখন বেশ ভালো আছি, বলতে গেলে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছি। মাথাটা ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বেশ ভালো লাগছে, মেঝেতে পায়চারি করছি। জোরে জোরে হাসছি। মনটা খুব উৎফুল্ল। মনে হচ্ছে, এই ফুরফুরে মেজাজ, কোনোদিকে কোনো চিন্তা নেই, এ রকম ঘণ্টাখানেক পেলে মাথাটাকে আবার কাজ করার অবস্থায় নিয়ে আসতে পারব।

টেবিলে বসে পড়লাম এবং আমার ওই রূপক-রচনাটা নিয়ে কাজে লাগলাম। লেখাটা সাঁতার কাটার মতো স্বচ্ছন্দে এগোতে লাগল, বহুদিন ধরে যা হয়নি, তার চেয়ে অনেক ভালো; লেখাটা খুব দ্রুত এগোচ্ছে না, তা ঠিক, কিন্তু মনে হচ্ছে, যা লিখছি, সেটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ক্লান্ত না হয়ে, ঘণ্টাখানেক ধরে লিখে চললাম।

এই রূপক-রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, বই-এর দোকানের ভেতর একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড, সেই জায়গাটা নিয়ে লিখতে চেষ্টা করছি। এই জায়গাটা এত গুরুত্বপূর্ণ আর জমজমাট যে তুলনায় লেখার অন্য জায়গাগুলো কিছুই নয়। আমার ভাবনাটাকে একটা গভীর ব্যঞ্জনাময় রূপ দিতে চাইছি। বই পুড়ছে না, পুড়ছে মগজ, মানুষের মগজ। এই জ্বলন্ত মগজের একটা নিখুঁত বার্থোলোমিউ-এর রাত্রির রূপ দিতে চাইছি।

ঠিক এমনি সময়ে আমার ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল আর বাড়িওয়ালি ঢুকল। ও সোজা ঘরের মাঝখানে চলে এল, দরজায় দাঁড়াল না।

আমি ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, মনে হল যেন একটা ঘুঁষি খেয়েছি।

'কি? আপনি কিছু বললেন মনে হচ্ছে। আমাদের কাছে একজন পর্যটক এসেছেন, এই ঘরখানা তাকে দিতে হবে। আপনাকে আজ রাত্রে নিচের তলায় আমাদের সঙ্গে শুতে হবে। হ্যাঁ, ওখানে আপনার নিজের একটা বিছানা পাবেন।' আমার উত্তর পাবার আগেই ও কোনো কথা না বলে টেবিলের ওপরের আমার কাগজপত্রগুলো বাণ্ডিল করে উল্টোপাল্টা করে রেখে দিল।

আমার ফুরফুরে মেজাজ বাতাসে উবে গেল; আমি রাগে, দুঃখে উঠে দাঁড়ালাম। ও টেবিল পরিষ্কার করছে, আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করলাম না। ও কাগজপত্রগুলো আমার হাতে গুঁজে দিল।

কিচ্ছু করার নেই। আমাকে জোর করে ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। আর এর সাথেই আমার মূল্যবান সময়টকুও নষ্ট হয়ে গেল। সিঁড়িতে নতুন পর্যটক-এর সাথে দেখা হল। যুবকটির দুই হাতের পেছন দিকে নীল রঙের নোঙর উল্কি দিয়ে আঁকা আছে। ওর পেছন পেছন আসছে একজন জাহাজঘাটার কুলি, তার কাঁধে একটা নাবিকদের কাঠের বড় বাক্স। লোকটি তাহলে একজন নাবিক, সাময়িক স্থিতি, রাতের পথিক। কাজেই মনে হচ্ছে, আমার ঘরটা ও বেশিদিন দখলে রাখবে না। হয়তো আগামীকালই লোকটা চলে যাবে, আর আমার লেখার মুহূর্তগুলো ফিরে

আসবে। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য একটা ঐশ্বরিক প্রেরণা চাই, আর তাহলেই আমার ওই বই-এর দোকানের অগ্নিকাণ্ডের রচনাটা লেখা সম্পূর্ণ হবে। এখন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

আগে এদের পারিবারিক ঘরটায় ঢুকিনি, এটা একটা সর্বজনীন ঘর, এই ঘরেই স্বামী, স্ত্রী, স্ত্রীর বাবা এবং চার ছেলেমেয়ে সবাই দিনরাত্তির থাকে। কাজের মেয়েটা রান্নাঘরে থাকে, রাত্তিরে ওখানেই শোয়। আমি অবজ্ঞাভরে দরজায় শব্দ করলাম। কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু আমি ভেতরে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমি ঘরে ঢুকলাম। বাড়িওয়ালির স্বামী কোনো কথা বলল না, শুধু একবার আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, আমার ব্যাপারে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া ও তখন অন্য একটা লোকের সঙ্গে বসে তাস খেলছিল। লোকটাকে আমি চিনি, ওর নাম 'পেন অফ গ্লাস'। জাহাজঘাটায় ওকে দেখেছি। বিছানায় একটা শিশু শুয়ে খেলা করছে; একটা বুড়ো লোক, বাড়িওয়ালির বাবা, আর একটা বিছানায় কুঁজো হয়ে হাতের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে, মনে হয় বুকে বা পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। ওর চুল প্রায় সব সাদা, ওর ওই কুঁজো হয়ে বসে থাকার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন একটা লম্বা গলা সরীসৃপ কিছু শুনবার জন্য কান পেতে আছে।

'আমার দুর্ভাগ্য, আজ রাত্রে আমাকে এই ঘরে থাকতে হবে।' আমি লোকটাকে বললাম।

'আমার স্ত্রী বলেছে?' ও জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, একজন নতুন অতিথি আমার ঘরে এসেছে।'

লোকটা আর কিছু বলল না। তাস ঘাঁটতে লাগল। এই লোকটা দিনের পর দিন এইখানে বসে বসে, যে-ই বাড়িতে আসে, তার সঙ্গেই তাস খেলে, কোনো কিছুর জন্যে নয়, স্রেফ সময় কাটাবার জন্য। ও কোনো কাজ করে না, আর ওর স্ত্রী সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে, সারাক্ষণ কাজ করে যায় আর বাড়িতে খদ্দের নিয়ে আসে। জাহাজঘাটার কুলি, ডকের কর্মী, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, আর ওরা নতুন খদ্দের নিয়ে এলে, তার জন্য ওদের কিছু টাকা দেয়, কখনো বা রাত্রে শুতেও দেয়। আজকে 'পেন অফ গ্লাস' ওই নতুন খদ্দেরকে নিয়ে এসেছে।

দুটো বাচ্চা ঘরে এল। দুটো ছোট মেয়ে। ওদের রোগা, ব্রণ-ওঠা, নর্দমার কাদা খোঁচার মতো মুখ; ওদের পোশাকের একেবারে জীর্ণ দশা। কিছু পরে বাড়িওয়ালি ঢুকল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম রাত্তিরে কোথায় শুতে দেবে। ও বলল, এই ঘরে সবার সঙ্গে শুতে পারি, অথবা পাশের ছোট ঘরে সোফার ওপরও শুতে পারি। যা ইচ্ছা। ও আমার দিকে একবারও তাকাল না। ঘরের টুকটাক কাজ করতে লাগল।

ওর উত্তর শুনে দমে গেলাম।

আমি দরজার কাছে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একরাত্রের জন্য আমার ঘরটা অন্য কারো সঙ্গে বদল করে আমি খুশিই আছি, এই রকম ভাব দেখালাম। ও

যাতে বিরক্ত না হয়। আর বাড়ি থেকে বার করে না দেয়, সে জন্য আমি বন্ধু-সুলভ মুখ করে রাখলাম।

'আপনাকে বলা দরকার যে, কাউকে এখানে ধারে থাকা-খাওয়া দেবার ক্ষমতা আমার নেই,' ও বলল, 'আর আগেও আপনাকে একথা বলেছি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মহাশয়া, এটা মাত্র কয়েকদিনের জন্য, যতক্ষণ না আমার লেখাটা শেষ হয়,' আমি বললাম, 'আর আমি আপনাকে অতিরিক্ত পাঁচ শিলিং দেব, স্বইচ্ছায়।'

মনে হল, আমার লেখার ওপর ওর কোনো আস্থা নেই। আর আমারও অহংকার দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে যাবার মতো অবস্থা নয়, এই সামান্য অপমানকর কথায়। আমি জানি যে, যদি আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, তাহলে আমার পরিণাম কী হতে পারে।

কয়েকদিন কেটে গেল। আমি তখনও নিচে পুরো পরিবারের সঙ্গে একত্রেই আছি, কারণ, পাশের ছোট ঘরটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ও ঘরে কোনো আগুন জ্বালানোর স্টোভ নেই। রাত্রেও আমি ওই ঘরে মেঝেতে ঘুমোই।

বিদেশি নাবিকটি আমার ঘরেই আছে এবং তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দুপুর বেলা বাড়িওয়ালি এসে জানাল যে, নাবিকটি এক মাসের আগাম টাকা দিয়ে দিয়েছে। ও নাকি যাবার আগে ফার্স্ট মেট্-এর পদের জন্য পরীক্ষা দেবে আর তাই ওকে শহরে থাকতে হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুনলাম এবং বুঝলাম যে, আমার ঘরটি বরাবরের জন্য হারালাম।

পাশের ঘরটায় গিয়ে বসলাম। যদি ভাগ্যবলে কিছু লিখতে পারি, তাহলে সেটা করতে হবে এই ঘরটায়, কারণ এই ঘরটা নিরিবিলি, চুপচাপ। আগের ওই রূপক-রচনাটা আর আমার মাথায় নেই; একটা নতুন ভাব মাথায় এসেছে, একটা নিখুঁত চমৎকার প্লট; একটা একাঙ্ক নাটক– "দ্য সাইন অফ দ্য ক্রস।" মধ্যযুগ থেকে বিষয়টা নেওয়া। মূল চরিত্রগুলোর ব্যাপারে সবকিছু ভাবা হয়ে গেছে; একটা প্রচণ্ড গোঁড়া বেশ্যা, যে মন্দিরে পাপ করেছে, দুর্বল মানসিকতায় কিংবা ইচ্ছা করে নয়, স্বর্গের প্রতি ঘৃণাতে; একেবারে বেদির সামনে, বেদির ওপর বিছানো কাপড়টা মাথার তলায় রেখে পাপ করেছে, স্বর্গের প্রতি তীব্র ঘৃণায়।

যত সময় যাচ্ছে, ততই আমার এই সৃষ্টির প্রতি বেশি বেশি আবিষ্ট হয়ে পড়ছি। শেষ পর্যন্ত এই বেশ্যা মেয়েটি আমার চোখের সামনে একবারে যেন স্পষ্ট শরীরী রূপ ধারণ করে দাঁড়াল, ঠিক যেমনটি ওকে দেখতে চেয়েছি, তেমনই। ওর শরীরটা বিকলাঙ্গ, লম্বা, খুব রোগা, গায়ের রংটা ময়লাটে আর দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী। আর যখন ও হাঁটে, ওর লম্বা লম্বা হাত-পাগুলো প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওর পোশাকের মধ্যে থেকে প্রকট হয়ে ওঠে। ওর কান

দুটোও বেশ বড় বড় করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ওর মধ্যে চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। ওর প্রতি আমার আগ্রহ হবার কারণ একটাই, ওর ওই অপূর্ব নির্লজ্জতা, ভেবেচিন্তে যে দুঃসাহসিক পাপটা করেছে, সেটা। ওর চিন্তাটা আমাকে যেন দখল করে নিয়েছে, এই অসাধারণ বিকৃত প্রাণীটি আমার মস্তিষ্কের ভেতরটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দিয়েছে, আর আমি না থেমে, একটানা দু'ঘণ্টা নাটকটা লিখে গেলাম। যখন প্রায় দশ-বারো পাতা লেখা শেষ হল, যথেষ্ট পরিশ্রম করে, কখনও অনেক সময় নিয়ে লিখে, আবার পাতার পর পাতা ছিঁড়ে আবার নতুন করে লিখে, আমি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লাম, ঠাণ্ডায় ও পরিশ্রমে গা-হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। আমি উঠে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। গত আধ ঘণ্টা ধরে বড় ঘরটায় বাচ্চাগুলো কাঁদছিল আর আমার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর লিখতেও পারতাম না। প্রায় সন্ধে পর্যন্ত বাইরে থাকলাম, হাঁটছি আর ভাবছি, নাটকটা কীভাবে শেষ করব। তারপরই একটা ঘটনা ঘটল।

আমি কার্ল যোহান স্ট্রিটে একটা জুতার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় রেলওয়ে স্কোয়ার-এর কাছাকাছি। এখানে যে কেন দাঁড়িয়ে আছি, ঈশ্বর জানেন। আমি কাচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখছি, জুতার কথা মনে পড়ছে না, আমার ভাবনা তখন অন্য জগতে। দলে দলে লোকেরা আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের কথা-বার্তা আমার কানেও ঢুকছে না। তখনই কানের কাছে একজন বলে উঠল, "শুভ সন্ধ্যা।" তাকিয়ে দেখি "মিসি।"

"কেমন আছ?" ও জানতে চাইল।

"আমি সবসময়েই ভালো থাকি... বরাবর।"

"আরে, তুমি কি এখনও ক্রিষ্টির দোকানেই আছ নাকি? তুমি একবার বলেছিলে, ক্রিষ্টির দোকানে হিসাব-রক্ষকের কাজ কর?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো শেষ হয়ে গেছে। ক্রিষ্টির মতো লোকের কাছে কাজ করা মুশকিল।"

"কেন?"

"আরে আমি একদিন একটা ভুল তারিখ লিখেছিলাম, তাই।"

"ভুল, না, মিথ্যা?"

আমি মিথ্যা লিখেছি? এইখানে দাঁড়িয়ে "মিসি" আমাকে অপমান করছে? আমি জবাব দিলাম না। ওর দিক থেকে ঘুরে পেছন ফিরেছি, চোখে পড়ল একটা লাল পোশাক-পরা মহিলা রাস্তা ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে একজন পুরুষ। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, লাল পোশাক আমাদের কাছাকাছি আসছে, আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল। মনে মনে উচ্চারণ করলাম, "ইয়া-লাজালি।"

এতক্ষণে "মিসি" পেছন ফিরেছে আর ওদের দুজনকে দেখতে পেয়েছে, ভদ্রমহিলা আর তার সঙ্গী ভদ্রলোকটি। ও টুপি খুলে ওদের দুজনকে অভিবাদন করল

তার চোখ দিয়ে ওদের অনুসরণ করতে লাগল। আমি টুপি তুলিনি, কিংবা হয়তো অন্যমনস্কভাবে তুলেছিলাম, মনে নেই। লাল পোশাক কার্ল যোহান স্ট্রিট ধরে এগিয়ে গিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

"মহিলার সঙ্গে কে ছিল?" "মিসির" জিজ্ঞাসা।

"দেখতে পেলে না, ডিউক? তথাকথিত ডিউক। তুমি ভদ্রমহিলাকে চেন?"

"হ্যাঁ, বলা যায়, চিনি। তুমি চেন?"

"না," আমি বললাম।

"আমার মনে হল তুমি ওদের একটা আন্তরিক অভিবাদন জানালে?"

"তাই কি?"

"হাঃ হাঃ, হয়তো তা করনি!" "মিসি" বলল, "অদ্ভুত লাগছে, ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকাতে তাকাতে গেল।"

"তুমি ওকে চিনলে কী করে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ও বলল যে, ও আসলে মহিলাকে চেনে না। তবে গত শরৎকালে এক সন্ধ্যায় ওরা তিন বন্ধু গ্র্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ভদ্রমহিলাকে দেখে। ওরা খুব স্ফূর্তির মেজাজে ছিল আর ওদের মধ্যে একজন সাহসী, কাউকে ভয় পায় না, এগিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ জমায় এবং ওকে বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

"তাই নাকি? তারপরে কী হয়েছিল?" আমি দমবন্ধ করে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

"কী আবার হবে? ভুলে যেও না, উনি একজন ভদ্রমহিলা।"

আমি চুপ করে রইলাম। তাহলে "ডিউক" এখন ওকে সঙ্গ দিচ্ছে। দিক্, আমার কি? আমি তো ওকে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছি। কাজেই আমার এতে কিছুই যায় আসে না। আমি ওর সম্বন্ধে খারাপ খারাপ কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। শুধু নিজের ওপর বিরক্তি জাগল এই ভেবে যে, এই জুড়িকে আমি টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়েছি! এরকম লোকের জন্যে টুপি খুলব কেন? ওর জন্যে তো আমি এখন আর মোটেই কেয়ার করি না। ওকে দেখতেও এখন সুন্দর লাগে না। ওর তো অধঃপতন হয়েছে। শয়তান জানে, আমি ওকে কিরকম নোংরা অবস্থায় দেখেছি। হতে পারে, আজকে ও আমাকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল আর এতে আমি অবাকও হইনি। হয়তো ওর মনে এখন অনুতাপ এসেছে। তার মানে এই নয় যে, আমি নিজেকে ছোট করব, বোকার মতো ওদের সেলাম করব, বিশেষ করে যখন ও নিজেকে ইদানীং এত কলঙ্কিত করেছে। ঠিক আছে, "ডিউক"কে ওর জীবনে স্বাগত জানাই, 'ডিউক'-এর আনন্দ কামনা করি। এমন একদিন আসবে যেদিন আমিও রাস্তায় ওর পাশ দিয়ে না তাকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে হেঁটে যাব। ও যদি আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকায়, তবু। যদি রক্তের মতো লাল গাউন পরে থাকে, তবু। হাঃ হাঃ, সেটাই হবে আমার জয়। আমি যদি নিজেকে ঠিকমতো জানি, আজ রাত্রের মধ্যেই আমার নাটকটা লেখা শেষ করার ক্ষমতা আমার আছে আর আগামী আট

দিনের মধ্যেই আমি এই যুবতীকে তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করব, হাঃ হাঃ! তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে।...

"বিদায়," "মিসিকে" বললাম, কিন্তু ও আমাকে ধরে রাখল, জিজ্ঞাসা করল, "এখন সারাদিন কী কর?"

"কী করি? লিখি, এছাড়া অন্য কী করব? লেখাটাই কি আমার পেশা নয়? লেখাতেই তো বেঁচে আছি। এখন একটা মহান নাটক লিখছি, 'দ্য সাইন অফ দ্য ক্রশ,' বিষয়টা মধ্যযুগ থেকে নিয়েছি।"

"তাই নাকি!" "মিসি" বলল, "যদি এটাতে সফল হও, তাহলে... "

"কোনো চিন্তা নেই," আমি বললাম, "আর দিন আষ্টেকের মধ্যেই তুমি এবং আরো অন্যান্য লোকেরা আমার সম্বন্ধে শুনতে পাবে।"

এই বলে আমি চলে এলাম।

বাড়িতে এসে আমি সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িওয়ালির কাছে একটা ল্যাম্প চাইলাম; ল্যাম্পটা পাওয়া খুব জরুরী, কারণ আজ রাত্রে আমি শোবো না, নাটকটা মাথার ভেতর তোলপাড় করছে, সকাল পর্যন্ত একটানা অনেকটা লিখে ফেলতে পারব। ওকে বললাম যে নাটকটা অসাধারণ, মাত্র দুটো দৃশ্য লেখা বাকি আছে আর হয়তো শিগ্‌গিরই কোনো থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে পারে, কাজেই আমার একটা ল্যাম্প পেতেই হবে।

কিন্তু বাড়িওয়ালির কোনো ল্যাম্প নেই। ও বলল যে, রান্নাঘরে একটা ল্যাম্প আছে বটে, কিন্তু রাত বারোটার আগে ওটা পাওয়া যাবে না। আমি কেন একটা মোমবাতি কিনে নিচ্ছি না?

আমি চুপ করে রইলাম। একটা মোমবাতি কিনবার মতো একটা ফার্দিং-ও আমার কাছে নেই আর বাড়িওয়ালি সেটা ভালোই জানে। এদিকে কাজের মেয়েটা এ ঘরে আমাদের সঙ্গেই বসে আছে, রান্নাঘরে নয়। কাজেই রান্নাঘরে ল্যাম্পটা জ্বালাই হয়নি। আমি তবু কিছু বললাম না। কাজের মেয়েটা হঠাৎ আমাকে বলল, 'খানিকক্ষণ আগে আপনাকে যেন প্যালেস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম; ওখানে ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলেন নাকি?' ও জোরে হেসে উঠল। আমি আবার বসে পড়লাম আর এখানে বসেই লিখব বলে কাগজপত্র বার করলাম। হাঁটুর ওপর কাগজ রেখে মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, যাতে মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়, কিন্তু এতেও কোনো লাভ হল না, একটুও এগোতে পারলাম না। বাড়িওয়ালির ছোট মেয়ে দুটো ঘরে ঢুকে ওদের বিড়ালটাকে নিয়ে হৈ হৈ করতে লাগল। বিড়ালটা কেমন যেন অদ্ভুত, অসুস্থ, গায়ের লোম প্রায় সব উঠে গেছে। মেয়ে দুটো ক্রমাগত বিড়ালটার চোখে ফুঁ দিতে লাগল, শেষকালে বিড়ালটার চোখ থেকে জল বেরিয়ে নাক বেয়ে পড়তে লাগল। বাড়িওয়ালা এবং আরো দুটো লোক একটা টেবিলে বসে তাস খেলছে। ওর স্ত্রীই কেবল ব্যস্ত, বসে বসে একটা পোশাক সেলাই করছে। ও ভালোই খেয়াল করছে যে, আমি একবিন্দুও লিখতে পারছি না এত গণ্ডগোলের মধ্যে; কিন্তু ওর তাতে বয়েই গেল; এমনকি, ও

কাজের মেয়েটার কথায় হাসল পর্যন্ত। পুরো পরিবারটাই আমার বিরুদ্ধে হয়ে গেছে। যেন, কোনো বিদেশিকে আমার ঘরটা ছেড়ে দেওয়ায় আমার যে হেনস্থা হল, তার ফলে মানুষ হিসাবে আমার কোনো মূল্য রইল না। এমনকি, কাজের মেয়েটা, একটা ছোট বাদামি-চোখো রাস্তার মেয়ে, যার কপালের ওপর ঝামর চুল আর একদম সমতল বক্ষদেশ, সন্ধেবেলা আমাকে যখন রুটি আর মাখন খেতে দেয়, তখন আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কোথায় আমার খাওয়া সারি, কারণ গ্র্যাণ্ডের বাইরে ও আমাকে কখনও দাঁত-খড়কে ব্যবহার করতে দেখেনি। এটা পরিষ্কার যে ও আমার চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা জানে এবং তাই আমাকে উপহাস করে মজা পায়।

হঠাৎ আমার মাথায় এইসব ভাবনা এসে যাওয়ায় আমি আমার নাটকের একটা সংলাপও লিখতে পারলাম না। বার বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মাথার ভেতর কেমন যেন বোঁ বোঁ আওয়াজ হচ্ছে, আমি হাল ছেড়ে দিলাম। কাগজগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকালাম। কাজের মেয়েটা আমার উল্টোদিকে বসে আছে। আমি ওর দিকে চাইলাম, ওর সরু পিঠ, ঝুঁকে-পড়া কাঁধ, ওগুলো এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি। ও কেন আমার পেছনে লেগেছে? আমি যদি প্যালেস থেকে বেরিয়ে আসি, তাতেই বা ওর কী? ওর কি কোনো ক্ষতি হচ্ছে? গত ক'দিন ধরেই ও খুব দুর্বিনীত ভাবে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে যখনই আমি হয়তো সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছি, কিংবা ঘরের দেওয়ালের কোনো পেরেকে খোঁচা লেগে আমার কোটটা ছিঁড়ে গেছে। এই তো গতকালই ও আমার ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এই ঘরে এসে সবার সামনে সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরো থেকে আমার নাটকের অংশগুলো জোরে জোরে পড়েছে সবাইকে শুনিয়ে আর আমাকে নিয়ে মজা করেছে। ওর সঙ্গে আজ পর্যন্ত আমি কোনো অশালীন আচরণ করিনি বা ওকে আমার কোনো কাজও করতে বলিনি। পাশের ঘরের মেঝেতে আমার বিছানা আমি নিজেই পাতি, যাতে ওকে কোনো কষ্ট না দিতে হয়। আমার চুল উঠে যাচ্ছে, তা নিয়েও ও ঠাট্টা করে। সকালবেলা বেসিনে মুখ ধোওয়ার সময় আমার মাথার চুল বেসিনের জলের মধ্যে পড়ে ভাসতে থাকে, তাতেও ও খুব মজা করে। তারপর আমার জুতা নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকে। জুতাজোড়া ইদানীং একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ওই পাটিটা, যার ওপর দিয়ে রুটির গাড়িটা চলে গিয়েছিল। "ঈশ্বর তোমাকে আর তোমার জুতাজোড়াকে আশীর্বাদ করুন," ও বলে, "ওগুলো তো কুকুরের ঘরের দরজার মতো হাঁ হয়ে গেছে।" ও ঠিকই বলে, কারণ জুতাজোড়া আর পরা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার তো জুতা কেনার মতো অবস্থা নেই। বসে বসে এইসব কথা ভাবছি আর কাজের মেয়েটার এই বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহারে অবাক হয়ে যাচ্ছি, সেই সময় ছোট মেয়ে দুটো বিছানায় বসা ওদের দাদুকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করল। বুড়োর চারপাশে লাফিয়ে

লাফিয়ে ঘুরতে লাগল আর খড়ের কুচি নিয়ে বুড়োর কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। খানিকক্ষণ দেখলাম, কোনো বাধা দিলাম না। বুড়ো নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়ল না, খালি ওদের দিকে হিংস্র চোখে চেয়ে রইল আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়াতে লাগল। আমি ভয়ানক বিরক্ত হচ্ছি, চোখ সরাতে পারছি না। ওদের বাবা তাস থেকে মুখ তুলে বাচ্চাদুটোর দিকে চেয়ে হাসল আর দুই সঙ্গীকেও ব্যাপারটা দেখাল। বুড়ো নড়ছে না কেন? বাচ্চাদুটোকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে না কেন? আমি বিছানার দিকে এক পা এগোলাম।

"ওদের খেলতে দাও! বুড়োর তো পক্ষাঘাত!" বাড়িওয়ালা ডেকে বলল। এই রাত্তিরে যদি বাড়ি থেকে বার করে দেয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম আর চুপ করে রইলাম। কি দরকার বাবা, এদের পরিবারের এই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে নাক গলিয়ে নিজের আশ্রয় আর রুটি-মাখনটা হারাব? একটা আধ-মরা বুড়োর জন্যে এই মূর্খামি করার কোনো মানে হয় না। আমি পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বাচ্চাগুলো বুড়োকে অত্যাচার করেই যাচ্ছে। বুড়ো মাথাটা শক্ত করে রাখতে পারছে না, এতে ওদের আরো মজা। ওরা বুড়োর চোখে আর নাকেও খড়ের টুকরোটা দিয়ে খোঁচা দিতে লাগল। বুড়ো ওদের দিকে হাস্যকর ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে, হাত নাড়তে পারছে না। হঠাৎ ও শরীরের ওপরের অংশটা একটু উঁচু করল আর একটা বাচ্চা মেয়ের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল, আবার শরীরটাকে একটু উঁচু করে, দ্বিতীয় মেয়েটার দিকে থুতু ছুঁড়ল, কিন্তু থুতুটা ওর কাছ পর্যন্ত পৌঁছল না। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, বাড়িওয়ালা তাসগুলো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে বুড়োর বিছানার কাছে চলে গেল। ওর মুখ রাগে ফুলে উঠেছে, ও চিৎকার করল, "বুড়ো ভাম্ কোথাকার! এইখানে বসে বসে লোকের চোখে থুতু ছিটানো হচ্ছে, অ্যাঁ?"

"কিন্তু, ঈশ্বর সাক্ষী, ওরা ওকে কীরকম অত্যাচার করছিল!" আমিও রাগে চিৎকার করলাম।

"অ্যাঁ, শোনো শোনো, এর কথা শোনো! এতে তোমার কী হচ্ছে, শুনি? একদম মুখ বন্ধ রাখো, এই বলে দিলাম, নইলে তোমার ভালো হবে না।"

এইবার ওর স্ত্রীর গলা শোনা গেল, সারা বাড়ি ওর বকুনি আর গালাগালির চোটে গরম হয়ে উঠল।

"ঈশ্বর রক্ষা করুন, তোমরা সবাই কি পাগল হয়ে গেলে, না ভূতে ধরেছে?" ও চিল চিৎকার করল, "এ বাড়িতে থাকতে হলে মুখ বন্ধ করে থাকতে হবে, তোমাদের দুজনকেই। রাস্তার পোকামাকড়দের জন্যে বাড়ি খোলা রাখতে হবে, তাদের খাবার জোগাতে হবে, আবার তাদের ঝগড়া, লড়াই, সবরকম শয়তানি এই বসার ঘরেই হবে, এ তো সহ্য করা যায় না। এ্যাই বাচ্চাগুলো, চুপ কর্, নাক মোছ্, না পারলে আমি গিয়ে তোদের নাক মোছাচ্ছি। আমি এরকম লোক দেখিনি। রাস্তা

থেকে উঠে এসে বাড়িতে ঢুকছে, পকেটে মশা-মারার পাউডার কেনার জন্যে একটা পেনিও নেই, আর মাঝ-রাত্তিরে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। আমি আর সহ্য করব না, বুঝেছ? যারা এ বাড়ির লোক নয়, তারা নিজের নিজের রাস্তা দেখ। আমি আমার বাড়িতে শান্তি চাই, শান্তি, বুঝেছ?" আমি একটা কথাও বললাম না, একবারও মুখ খুললাম না। দরজার কাছে বসে বসে হৈ চৈ-টা শুনতে লাগলাম। ওরা সবাই একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে, বাচ্চাগুলো পর্যন্ত। আমি যদি চুপ করে থাকি, এই গোলমাল আস্তে আস্তে থেমে যাবে। আমি যদি একটাও কথা না বলি, তাহলে হয়তো আমার খারাপ কিছু হবে না। তাছাড়া, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে, বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, শীত। না, আর বোকামি নয়!... কাজেই আমি চুপ করে রইলাম, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কোনো চেষ্টাই করলাম না। আমি লজ্জা পেলাম না, যদিও আমাকে প্রায় দরজা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ বাড়িওয়ালি ওর আক্রমণ চালিয়ে গেল, আমি ঠাণ্ডা মাথায়, পাথরের মতো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যেখানে যিশুখ্রিস্টের একটা নকল তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে।

একজন তাস খেলার খেলুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাদাম, আপনি যদি চান আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, আমার কোনো অসুবিধা নেই।" অন্য খেলুড়েরাও উঠে দাঁড়াল।

"না, আমি আপনার কথা বলিনি– আপনারও না," বাড়িওয়ালি ওদের বলল, "যদি দরকার পড়ে, আমি কাকে বলছি, শিগ্‌গিরই দেখিয়ে দেব... "

বাড়িওয়ালি থেমে থেমে, মাঝে মাঝে আমার দিকে ঘুরে, পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চাইল যে, ও আমাকেই এই সব কথা বলছে। আমি নিজেকে বললাম, "চুপ, একদম চুপ!" ও তো আমাকে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় চলে যেতে বলেনি। সাহস ধর, অনর্থক অহংকার করো না! খ্রিস্টের ওই নকল তৈলচিত্রতে একটা অনন্য সবুজ চুল দেখা যাচ্ছে। এটা খানিকটা সবুজ ঘাসের মতো দেখতে, অথবা ঠিক করে বললে, অস্বাভাবিক মোটা মাঠের ঘাস। হাঃ! একদম সঠিক বর্ণনা, অস্বাভাবিক মোটা মাঠের ঘাস... এই সময় আমার মধ্যে এক ঝাঁক ভাব কিলবিল করতে লাগল। সবুজ ঘাস থেকে এই উদ্ধৃতি, "প্রত্যেকটি প্রাণই জ্বলন্ত ঘাসের মতো"; তার থেকে শেষ বিচারের দিন, যখন সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে; তার থেকে একটু ঘুরে লিসবন-এর ভূমিকম্প, যেটা সম্বন্ধে ইয়ালাজালি-র বাড়িতে দেখা একটা স্পেনদেশের পেতলের থুক্‌দানি এবং একটা আবলুস কাঠের কলমের হাতল নির্দেশ করছে এরকম কিছু একটা আমার সামনে দিয়ে ভেসে গেল। হ্যাঁ, সবই তো পরিবর্তনশীল, জ্বলন্ত ঘাসের মতো। সব কিছুই শেষ হচ্ছে চার-টুকরো কাঠের বাক্স আর শবাচ্ছাদন-বস্ত্রতে। "মিস অ্যাণ্ডারসেন-এর দোকানে শবাচ্ছাদন-বস্ত্র পাওয়া যায়, দরজার ডান দিকে"... আর আমার বাড়িওয়ালি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার বিষাদময় মুহূর্তগুলিতে এই সবই আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল।

"ও শুনতে পাচ্ছে না," বাড়িওয়ালি চেঁচাল, "আমি বলছি, তুমি বাড়ি ছাড়। এখন তুমি জানতে পারলে! ঈশ্বর আমাকে মেরে ফেলুন, আমি বিশ্বাস করি, লোকটা পাগল! তুমি এক্ষুনি বেরোও এখান থেকে, আর কোনো কথা নয়।"

আমি দরজার দিকে তাকালাম, না, বেরোনোর জন্য নয়। একটা উন্মাদ চিন্তা মাথায় এল, যদি দরজায় একটা চাবি আটকানো থাকত, তাহলে সেই চাবি দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে সবাইকে এই ঘরে বন্ধ করে রাখতাম, নিজেকেও, যাতে কেউ পালাতে না পারে। আবার রাস্তায় বেরোনোর ব্যাপারে আমার প্রবল ভীতি রয়েছে।

হঠাৎ বাড়িওয়ালা কথা বলে উঠল। আমি বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে লোকটা একটু আগেই আমাকে শাসানি দিয়েছিল, ও-ই আমার পক্ষ নিয়ে বলল, "রাত্তির বেলা কোনো লোককে বাড়ি থেকে বার করে দিতে নেই। তুমি জানো না, এরকম করলে তোমার শাস্তি হতে পারে।" এরকম কোনো শাস্তি আছে কিনা, আমি জানি না। বলতে পারব না, থাকতেও পারে। যাই হোক্, মেয়েলোকটা খানিক চিন্তা করল, তারপর শান্ত হয়ে গেল, আর কোনো কথা বলল না।

আমার সামনে রাত্রের খাবার জন্য দু-টুকরো রুটি আর মাখন রাখল, কিন্তু ওর স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত আমি ওগুলো ছুঁলাম না। আমি ভান করলাম যেন শহর থেকে কিছু খেয়ে এসেছি।

খানিক পরে, যখন আমি শোবার জন্য পাশের ছোট ঘরে এলাম, ও আমার পেছন পেছন এল, আর দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, "শুনে রাখ, আজ রাত্তিরেই কিন্তু তোমার এই বাড়িতে শেষ শোয়া।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম।

কালকে হয়তো কোনোভাবে একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া যাবে, যদি ঠিকমতো চেষ্টা করি। কোনো একটা লুকোনোর জায়গা পাবই। আপাতত রাত্রে যে বাইরে যেতে হচ্ছে না, সেটাই উপভোগ করা যাক।

ভোর পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যের সময় পর্যন্ত ঘুমোলাম। যখন জাগলাম, তখনও আলো ফোটেনি, তবু আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। ঠাণ্ডার জন্যে আমার যাবতীয় জামা-কাপড় পরেই শুয়েছিলাম, তাই পোশাক পরবার কোনো প্রয়োজন হল না। একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে, আস্তে দরজাটা খুলে সোজা বেরিয়ে গেলাম, কারণ বাড়িওয়ালির মুখোমুখি হওয়ার ভয় ছিল।

দু'জন পুলিশ, যারা সারারাত পাহারায় ছিল, কেবল এই দুটি প্রাণীকেই রাস্তায় দেখলাম। খানিক পরে, কিছু লোক রাস্তার বাতিগুলো নেভাতে শুরু করল। আমি লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কির্কেগেড-এ পৌঁছলাম, ওখান থেকে রাস্তাটা সোজা দুর্গের দিকে নেমে গেছে। ঠাণ্ডায় কাবু, ঘুম-জড়ানো চোখ, লম্বা হাঁটার পর হাঁটুতে আর পিঠে ব্যথা আর দারুণ খিদে, এই নিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম আর ঝিমোতে লাগলাম অনেকক্ষণ ধরে। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমার বাড়িওয়ালির সকাল-সন্ধ্যায় দেওয়া রুটি আর মাখনের ওপরই বেঁচে রয়েছি। আর এখন

চব্বিশঘণ্টা হয়ে গেছে আমার শেষ খাওয়ার পর। খিদে আবার বিশ্রীভাবে আমার পেটে কামড়াতে লাগল; তাড়াতাড়ি এর একটা সুরাহা করতে হবে। ভাবতে ভাবতে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আশেপাশে লোকের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে, আর লোকজন রয়েছে চারপাশে। আমি উঠে হাঁটতে শুরু করলাম। টিলার ওপর দিকে সূর্য উঠে পড়ল, আকাশটা ফ্যাকাশে আর নরম রোদে ভরা, আর অনেকগুলো অন্ধকার, বিষণ্ন সপ্তাহের পর এই মনোরম সকালটা পাওয়ার আনন্দে আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলাম আর মনে হল অন্য সময়ে এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় কাটিয়েছি। বুকে চাপড় মেরে এক টুকরো গানও গাইলাম। আমার গলার স্বর এত জঘন্য, এত পরিশ্রান্ত শোনাল যে আমার চোখে জল এসে গেল। এই চমৎকার দিনটি, রোদে সাঁতার কাটা সাদা, ঝকমকে আকাশ আমার ওপর এমন শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করল যে, আমি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম।

"আপনার কী হয়েছে," একটা লোক জিজ্ঞেস করল। আমি উত্তর না দিয়ে মুখ লুকিয়ে মানুষজনের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। পুলের কাছে পৌঁছলাম। রাশিয়ার পতাকা লাগানো একটা বড় পালতোলা জাহাজ থেকে কয়লা খালাস হচ্ছিল। জাহাজের গায়ে নাম লেখা ছিল, পড়লাম, "কোপেগোরো।" এই বিদেশি জাহাজে কী হচ্ছে, সেটার দিকে মনোযোগ চলে গেল। জাহাজটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে।

সূর্য, রোদ, সমুদ্রের নোনা হাওয়া, এই ব্যস্ত, আনন্দময় জীবন আমাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গেল, আর আমার শরীরে রক্ত তেজে ছুটোছুটি করতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, এই সময় এইখানে বসে আমার নাটকটার কয়েকটা দৃশ্য লিখে ফেলা যায়, আর তাই আমি পকেট থেকে কাগজ বার করলাম।

এক সন্ন্যাসীর মুখে একটা সংলাপ দেবার চেষ্টা করলাম, এমন একটা সংলাপ, যেটায় একাধারে গর্ব এবং অসহিষ্ণুতা, দুটোই থাকবে, কিন্তু কোনো লাভ হল না। কাজেই আমি সন্ন্যাসীর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে একটা ভাষণ লিখবার চেষ্টা করলাম, একজন বিচারকের ভাষণ, মন্দিরের পবিত্রতা বিনষ্টকারীকে বলছেন,– আধ-পাতা লেখার পর থেমে গেলাম। যেখানে বসে লিখছি, সেখানকার পরিবেশ, চারপাশের গোলমাল, কাঠের খুপরিগুলো, জাহাজের গ্যাংওয়েতে হৈচৈ, আর লোহার চেনের অবিরত ঘর্ঘর শব্দ, আমার নাটকের বিষয়বস্তু, সেই অস্পষ্ট, ধূসর মধ্যযুগের ছাতা-পড়া হাওয়া, যা আমার নাটককে একটা কুয়াশার মতো ঘিরে থাকবে, তার সঙ্গে মোটেই মানান্‌সই নয়।

আমি কাগজ-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম।

যাই হোক, খুশি খুশি মেজাজে আছি আর মনে আত্মবিশ্বাস আছে যে, সবকিছু যদি ঠিকঠাক চলে, আমি কিছু করতে পারব।

শুধু যদি একটা যাবার জায়গা থাকত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম কিন্তু শহরের মধ্যে কোথাও এমন একটা শান্ত জায়গা মনে এল না, যেখানে আমি

একঘণ্টা বসে লিখতে পারি। আর কোনো রাস্তা খোলা নেই, আমাকে ভেটারল্যাণ্ডে সেই পুরনো পর্যটক-আবাসেই যেতে হবে। ভাবতেই কুঁকড়ে গেলাম আর নিজেকে বললাম, না, এ সম্ভব নয়। তবু আমি এগিয়েই চললাম আর ধীরে ধীরে ঐ নিষিদ্ধ জায়গার কাছাকাছি এসে গেলাম। মনে মনে ভাবছি যে, এটা অত্যন্ত অপমানজনক, কিন্তু কোনো উপায় নেই। আমি লোকটা মোটেই অহংকারী নই; জোর করে বলতেও পারি না যে, আমি এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানুষদের একজন। আমি এগিয়ে গেলাম।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আর একবার চিন্তা করলাম। ফলাফল যাই হোক্ না কেন, সাহস করে এটা করতেই হবে। তাছাড়া এটা নিয়ে এত হৈচৈ করার কি আছে! প্রথমত, এটা তো কেবলমাত্র ঘণ্টাদুয়েকের জন্য; দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর না করুন, আমাকে যেন কখনও এইরকম বাড়িতে আশ্রয় না নিতে হয়। বাড়ির উঠোনে ঢুকলাম; অসমতল পাথরগুলোর ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনটা অস্থির, আর দরজার কাছে পৌঁছেও প্রায় ফিরে আসছিলাম। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ভাবলাম, না, কোনো অহংকার নয়! আরে, যদি তেমন হয় তো বললেই হবে যে, আমি বিদায় জানাতে এসেছি আর আমি যে এ বাড়ির কাছে ঋণী, সে কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে এসেছি।

লম্বা ঘরটার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার ঠিক সামনেই, মাত্র কয়েক পা দূরে, বাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথায় টুপি নেই, গায়ে কোট নেই, ও পরিবারের বড় ঘরে ঢোকার দরজার চাবির ফুটোয় উঁকি মেরে কিছু দেখছে। ও হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে চুপ করে থাকতে বলল, তারপর আবার ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে থাকল।

"এদিকে আসুন," ও ফিসফিস করে বলল। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। "এখানে দেখুন," ও বলল, মুখে আগ্রহ আর ঔৎসুক্যের হাসি, "উঁকি মারুন! হিঃ হিঃ, ওই যে ওরা! আর বুড়োটাকেও দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন?" খ্রিস্টের তেল-রঙা নকল ছবিটার নিচে বিছানার ওপর দুটো শরীর, বাড়িওয়ালি আর ওই বিদেশি নাবিক। গাঢ় রঙ-এর বিছানার চাদরের ওপর বাড়িওয়ালির পা দুটো ধবধবে সাদা আভা ছড়াচ্ছে, আর দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা বিছানার ওপর বাড়িওয়ালির বাবা বসে আছে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বুড়ো মানুষটা, আর দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে যেমন ভাবে বসে থাকে, তেমনিভাবে বসে তাকিয়ে দেখছে, ওর নড়বার ক্ষমতা নেই।

আমি বাড়িওয়ালার দিকে ঘুরে তাকালাম। ও অতিকষ্টে হাসি চেপে আছে, জোরে হাসতে পারছে না। "বুড়োটাকে দেখলেন?" ও ফিসফিস করল, "হা ঈশ্বর! বুড়োটাকে দেখলেন? ও বসে বসে দেখছে," ও আবার চাবির ফুটোয় চোখ দিল।

আমি জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। এই দৃশ্যটা আমার সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে নির্দয়ভাবে লণ্ডভণ্ড করে দিল আর আমার খুশির মেজাজটা নষ্ট করে দিল। আচ্ছা, এতে

আমার কি যায় আসে? ওর স্বামীই যদি এতে রাজি থাকে, এমনকি এতে দারুণ মজা পায়, তাহলে আমার তো কিছু মনে করার কোনো কারণ নেই! আর বুড়ো মানুষের কথাটা ধরলে, বুড়ো হচ্ছে বুড়ো, হয়তো কিছু লক্ষ্যই করেনি, কিংবা হয়তো বসে বসে ঢুলছিল। ঈশ্বর জানেন, ও হয়তো মরে গেছে। আমি মোটেই অবাক হব না, যদি বুড়ো মরে গিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমার বিবেক পরিষ্কার।

আমি আবার কাগজগুলো বার করলাম আর এইসব অনাবশ্যক ব্যাপারগুলোকে মন থেকে হঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিচারক তাঁর রায় শোনাচ্ছেন, তাঁর ভাষণের একটি বাক্যের মাঝখান পর্যন্ত লিখে থেমে গেছিলাম– "ঈশ্বর এবং আইনের এই নির্দেশ, আমার মন্ত্রণা পরিষদের এই নির্দেশ, আমি এবং আমার বিবেকের এই নির্দেশ... " আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম তার বিবেক তাকে কি নির্দেশ দেবে। ভেতরের ঘর থেকে কিছু কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এল, আসুক, তাতে আমার কি? তাছাড়া, বুড়োটা বোধহয় মরেই গেছে, আজ ভোরে রাত চারটে নাগাদ হয়তো মরে গেছে; কাজেই কি নিয়ে গোলমালটা হচ্ছে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি কেন এই সব নিয়ে চিন্তা করব? "আমি এবং আমার বিবেকের এই নির্দেশ...।" কিন্তু সবকিছুই যেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে লোকটা কেবলই ছটফট করছে, চাপা হাসি হাসছে, হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বাইরে রাস্তাতেও কিছু একটা হচ্ছে, যাতে আমার মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। উল্টোদিকের ফুটপাথে একটা ছোট ছেলে রোদে বসে আছে, মজা করছে, কারো কোনো ক্ষতি করছে না, কেবল কাগজের টুকরো মুড়ে মুড়ে খেলা করছে। হঠাৎ ও লাফিয়ে উঠল, অভিশাপ দিতে লাগল, পেছু হঠে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দেখল তিনতলার খোলা জানালা দিয়ে একটা লাল দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোক ঝুঁকে ওর মাথায় থুতু ফেলেছে। বাচ্চা ছেলেটা প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করতে লাগল, জানালার দিকে তাকিয়ে অধৈর্য ভাবে গাল দিতে লাগল; বয়স্ক লোকটা ওর মুখের ওপর হাসতে লাগল। এইভাবে প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। ওই ছোট বাচ্চাটার চোখের জল সহ্য করতে না পেরে জানালা থেকে সরে এলাম।

"আমি এবং আমার বিবেকের এই নির্দেশ... " এর বেশি এগোনো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। আমার মনে হল এ যাবৎ যতখানি লিখেছি, সমস্তটাই ব্যবহারের অযোগ্য, মানে আমার পুরো কল্পনাটাই ঘৃণ্য আবর্জনা। মধ্যযুগে বিবেক-এর কথা বলা যায় কি? বিবেক তো প্রথম আবিষ্কার করেন নাচের শিক্ষক শেক্‌স্‌পিয়ার; সেক্ষেত্রে আমার পুরো ভাষণটাই ভুল। তার মানে, এই যে এতগুলো পাতা লিখলাম, এর কোনো মূল্য নেই? আমি পাতাগুলো আবার পড়লাম আর নিজের সন্দেহ দূর করলাম। আমি দেখলাম, অনেকগুলো জায়গায়, অসাধারণ প্রশংসনীয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন লেখা রয়েছে– আর তাই আবার আমার নাটকটা শেষ করার ইচ্ছা হল।

আমি উঠে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম, বাড়িওয়ালার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। আমি মন শক্ত করে ফেলেছি। আমি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে আমার আগের ঘরে ঢুকে পড়লাম। লোকটা ঘরে নেই, কিছুক্ষণ বসে গেলে ক্ষতি কি? আমি ওর কোনো জিনিসে হাত দেব না, ওর টেবিলও ব্যবহার করব না। দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসেই আমি খুশি থাকব। আমি তাড়াতাড়ি হাঁটুর ওপর কাগজ বিছিয়ে লিখতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ সুন্দরভাবে কেটে গেল। একটার পর একটা ভাব আমার মাথায় আসতে থাকল আর আমি অব্যাহতভাবে লিখে যেতে লাগলাম। একটার পর একটা পাতা ভরে উঠল আর আমি খুশি মেজাজে পরমানন্দে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম। আমার যেন হুঁশ নেই, আর এই মুহূর্তে নিজের চাপা হাসির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

হঠাৎ একটা অসাধারণ আইডিয়া মাথায় এল। গির্জায় একটা ঘণ্টা। নাটকের একটা চরম মুহূর্তে গির্জার ঘণ্টাটা বেজে উঠবে। সব কিছুই দ্রুততালে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। আমি কাঁপতে লাগলাম; একদম সোজা হয়ে বসে আছি, পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, ভয়ে কাঁপছি, সব কিছুতে ভয় পাচ্ছি আর খিদের জ্বালায়-ও উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। আর একটা শব্দও লিখতে পারছি না, হাতে পেন্সিলটা ধরে ঘাবড়ে গিয়ে শুনছি, পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে গেল, আর নিচ থেকে একজোড়া মানুষ ঘরে ঢুকল।

আমি কেনো কৈফিয়ৎ দেবার আগেই, বাড়িওয়ালি চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! ঈশ্বর রক্ষা করুন, এই লোকটা এখানে বসে আছে!"

"মাপ করবেন," আমি বললাম, এবং আরো কিছু বলতে যাচ্ছি, কিন্তু বাড়িওয়ালি দরজাটা হাট করে খুলে ধরে চেঁচাল, "এই মুহূর্তেই যদি না বেরোও, আমি কিন্তু পুলিশ ডাকব!"

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"আমি শুধু আপনাদের বিদায় জানাতে এসেছিলাম," আমি বিড়বিড় করলাম, "আর আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এ ঘরে কোনো কিছুই ছুঁইনি, শুধু চেয়ারে বসেছিলাম।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এতে কোনো ক্ষতি হয়নি," লোকটা বলল, "কি আসে যায়? ওঁকে একলা থাকতে দাও। উনি... "

ততক্ষণে আমি সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেছি। হঠাৎ আমার এই মোটা, ফোলা-ফোলা চেহারার মেয়েলোকটার ওপর ভয়ানক রাগ হয়ে গেল, ও আমার পায়ে পায়ে নিচে নেমে এসেছে আমাকে বার করে দেবে বলে। আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়লাম, জিভের ডগায় বাছা বাছা অশ্রাব্য গালিগালাজ, ওকে উগ্‌রে দেব বলে। কিন্তু সময়মতো নিজেকে সামলে নিলাম এবং ওই বিদেশি নাবিকের সম্মানার্থে শান্তি বজায় রাখলাম। ও মেয়েছেলেটার পেছন পেছন নেমে এসেছিল আর আমার

গালাগালগুলো সব শুনতে পেত। মেয়েলোকটা কিন্তু আমার পায়ে পায়ে গালাগাল দিতে দিতে আসছে আর আমার রাগ আরো বেড়ে যাচ্ছে।

নিচে উঠোনে পৌঁছলাম। আমি আস্তে আস্তে হাঁটছি, তখনও চিন্তা করে যাচ্ছি, ওকে গালাগাল দেব নাকি! ততক্ষণে আমি রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি, আর মনে মনে সবচেয়ে খারাপ গালাগালগুলো খুঁজছি, যেটা উচ্চারণ করলে ওকে পেটে লাথি মারার মতোই আঘাত করবে, ওকে ওইখানেই মারাত্মক আঘাত করবে। একজন উর্দিপরা থিয়েটারের প্রহরী দরজার কাছে এসে মাথার টুপি খুলে অভিবাদন করল আর বাড়িওয়ালির সঙ্গে কথা বলল। আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, লোকটা আমার নাম করে আমার সম্বন্ধে জানতে চাইছে। আমি কিন্তু দাঁড়ালাম না, হাঁটতে লাগলাম। লোকটা দু'চার পা হেঁটে এসে আমাকে পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড় করাল। তারপর আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল। আমি ওটা অনিচ্ছায় ছিঁড়ে দেখি, ভেতরে একটা আধ গিনি রয়েছে, আর কোনো চিঠি নেই, একটা শব্দও নয়। আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে? কে দিল এই চিঠি?"

"আজ্ঞে, তা আমি বলতে পারব না!" ও জবাব দিল, "তবে একজন ভদ্রমহিলা এটা আমায় দিয়েছেন।"

আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। দ্বার-রক্ষী চলে গেল।

আধা গিনির মুদ্রাটাকে আবার খামে ভরে, দুমড়ে মুচড়ে, পেছন ফিরে ফের সোজা চলে গেলাম বাড়িওয়ালির কাছে, ও দরজায় দাঁড়িয়ে তখনও আমার ওপর নজর রাখছিল। দোমড়ানো মোচড়ানো টাকাটা সমেত খামটা আর একটাও কথা না বলে ওর মুখের ওপর ছুড়ে দিলাম, এটুকু দেখলাম যে, ও খামটা খুলে দেখছে কী আছে! তারপর চলে এলাম। হাঃ! একেই বলে সম্মানজনক আচরণ করা! একটাও কথা নয়, খামে কী আছে, তা বলা নয়, শুধু এত বড় একটা মুদ্রা দুমড়ে মুচড়ে খামসমেত অত্যাচারীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া! একেই বলে মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে প্রস্থান। এইভাবেই জানোয়ারদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়!...

টম্‌টেগাডেন আর রেলওয়ে প্লেসের মোড়ে যখন এলাম, তখন হঠাৎ রাস্তাটা যেন আমার চোখের সামনে সাঁতার কাটতে লাগল; মাথার মধ্যে ফাঁকা, ঝিঁ ঝিঁ করছে, আর আমি একটা বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। আর হাঁটতে পারছি না, এক পা-ও এগোতে পারছি না, যেভাবে কুঁকড়েমুকড়ে দাঁড়িয়ে আছি, সোজা হতেও পারছি না, যেভাবে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলাম, আর ধীরে ধীরে আমার চেতনা লুপ্ত হতে লাগল। আমার উন্মাদ রাগই আমায় নিঃশেষিত অবস্থায় এনে ফেলেছে। পা তুললাম, ফুটপাথে পা ঠুকলাম। আরো নানাভাবে শরীরে শক্তি আনতে চেষ্টা করলাম; দাঁতে দাঁত চাপলাম, ভুরু কোঁচকালাম, হতাশ চেষ্টায় দু'চোখ ঘোরাতে লাগলাম; একটু কাজ হল। আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো স্বচ্ছ হয়ে এল। এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমি এখন মরতে বসেছি। আমি দু'হাত ছড়িয়ে দেওয়ালে চাপ মেরে নিজেকে সোজা

দাঁড় করালাম। রাস্তাটা এখনও প্রবলভাবে আমার চারপাশে নেচে চলেছে। রাগে আমার হেঁচকি উঠতে লাগল, আমি আমার দুর্দশার সঙ্গে অন্তরাত্মা দিয়ে লড়াই চালাতে লাগলাম, প্রচণ্ড চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে ডুবে না যাই। আমি ভেঙে পড়তে চাই না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরতে চাই। একটা মালবাহী গাড়ি ধীরে ধীরে সামনে দিয়ে যাচ্ছে, দেখলাম ওটায় আলু বোঝাই করা হয়েছে। কিন্তু আমার রাগ আর একগুঁয়েমি থেকে আমার মাথায় এটা ঢুকে গেল যে, ওগুলো আলু নয়, বাঁধাকপি আর আমি ভয়ংকর সব দিব্যি গেলে বলতে লাগলাম যে, ওগুলো বাঁধাকপি। আমি কি বলছি, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আর এই মিথ্যা দিব্যি গেলে যাওয়াটাও বেশ বুদ্ধি করে করছি, বারবার করছি আর মিথ্যা শপথ করার তীব্র আনন্দ উপভোগ করছি। আমার এই তুলনাহীন পাপ কাজের চিন্তায় আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে গেলাম। আমি আকাশের দিকে তিনটে আঙুল উঁচু করে কাঁপা কাঁপা স্বরে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে শপথ করে বললাম যে, ওগুলো বাঁধাকপি।

সময় কেটে যাচ্ছে। থাকতে না পেরে পায়ের কাছে একটা ধাপে বসে পড়লাম। কপাল, ঘাড়, গলা থেকে ঘাম শুকিয়ে নিলাম, দুটো লম্বা শ্বাস টানলাম আর জোর করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। সূর্য ডুবতে চলেছে, বিকেল গড়িয়ে আসছে। আমি আবার নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলাম। আমার খিদেটা সত্যিই একটা কলঙ্ক এবং আর কয়েক ঘণ্টা পরেই রাত্রি নেমে আসবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সময় থাকতে থাকতে একটা প্রতিকারের কথা ভাবা। আমার চিন্তাটা আবার ওই পর্যটক-আবাসে উড়ে গেল, যেখান থেকে আমি বিতাড়িত হয়েছি। কোনোক্রমেই আমি ওখানে ফিরতে পারি না, কিন্তু তবু মনটা ওই জায়গার কথাই ভাবছে। ঠিকমতো বলতে গেলে, মেয়েলোকটি কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। আমি কি করে আশ্রয় আশা করতে পারি, যদি আমি তার জন্যে পয়সা না দিই? তাছাড়া, ও তো মাঝে মাঝেই আমায় খেতে দিয়েছে; এমনকি গতকাল সন্ধ্যাতেও, আমি ওকে বিরক্ত করা সত্ত্বেও, ও আমাকে রুটি আর মাখন দিয়েছিল। ওর স্বভাব ভালো বলেই ও আমাকে খেতে দিয়েছিল, কারণ ও জানত যে, আমার খাবার প্রয়োজন ছিল; কাজেই আমার তো নালিশ করার কিছু নেই। আমি ওইখানে বসে বসেই আমার ব্যবহারের জন্যে মনে মনে ওর কাছে ক্ষমা চাইলাম। বিশেষ করে, একদম শেষকালে আমি অকৃতজ্ঞের মতো ব্যবহার করেছি আর ওর মুখের ওপর আধা গিনি ছুঁড়ে দিয়েছি, এর জন্যে আমার তিক্ত অনুশোচনা হতে লাগল।

আধা-গিনি! আমি শিস্ দিয়ে উঠলাম। পত্রবাহক যে চিঠিটা এনে দিয়েছিল, সেটা কার কাছ থেকে এসেছিল? এই এতক্ষণে আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ভাবার চেষ্টা করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম, কীভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল। মানসিক যন্ত্রণা এবং লজ্জায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কয়েকবার মৃদু উচ্চারণ করলাম, "ইয়ালাজালি" ভগ্নস্বরে এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে। মাত্র গতকালই আমি ভেবেছিলাম যে, ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে পাশ

দিয়ে চলে যাব। তার পরিবর্তে আমি ওর সহানুভূতি জাগিয়েছি আর ওর কাছ থেকে ভিক্ষা আদায় করেছি। না, না, না, আমার এই অধঃপতনের কি কোনো শেষ নেই! আমি ডুবে গেছি, চারদিক থেকেই ডুবে গেছি, হাঁটু পর্যন্ত, কোমর পর্যন্ত, আর কোনোদিন উঠতে পারব না! এটাই চূড়ান্ত। ভিক্ষালব্ধ একটা আধা-গিনি, প্রচ্ছন্ন দাতাকে ছুড়ে ফেরত দিতে অসমর্থ; সুযোগ আসলেই আধা-পেনির জন্যে হুড়োহুড়ি করা, তারপর তা দিয়ে রাত-কাটানোর পয়সা দেওয়া, নিজের প্রচণ্ড অনীহা সত্ত্বেও...

আচ্ছা, কোনোরকমে ওই আধা গিনিটা উদ্ধার করা যায় না? বাড়িওয়ালির কাছে গিয়ে ওটা ফেরত চাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কোনো রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। যদি ভেবে বার করতে পারি, সর্বশক্তি দিয়ে ভেবে বার করতে হবে। সাধারণভাবে ভাবলে চলবে না। আধা গিনিটা পাবার রাস্তা খুঁজে বার করতেই হবে।

এখন প্রায় চারটে বাজে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যায়। যদি নাটকটা শেষ করতে পারতাম!

যেখানে বসেছিলাম, ওখানেই পাণ্ডুলিপিটা বার করলাম আর শেষ ক'টা দৃশ্য লিখে শেষ করব বলে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। আমি ভাবছি, ঘেমে যাচ্ছি, প্রথম থেকে আবার পড়ছি, কিন্তু একটুও এগোতে পারছি না। না,... নয়, কোনো গোঁয়ার্তুমি নয়! আমি নাটকটা লিখে চলেছি, যা মাথায় আসছে, তাই লিখে যাচ্ছি, যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করে বেরিয়ে যেতে পারি। নিজেকে এই বলে বোঝালাম যে, একটা অসামান্য মুহূর্ত এসে গেছে; নিজেকে মিথ্যা বোঝালাম, জেনে শুনে নিজেকে প্রবঞ্চনা করলাম এবং লিখে চললাম, যেন কোনো শব্দ খোঁজার দায় নেই।

"এটা অসাধারণ! এটা সত্যিই একটা নতুন আবিষ্কার!" নিজেকে ফিসফিসিয়ে বললাম; কেবল লিখে যাও! দাঁড়াও! এগুলো তো প্রশ্নাতীত নয়? প্রথম দৃশ্যে যে সংলাপ লেখা আছে, তার থেকে এটাতে অনেক বৈপরীত্য এসে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীর কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে তো মধ্যযুগ উঠে আসছে না? আমি দাঁত দিয়ে কামড়ে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলে লাফ দিয়ে উঠলাম, পাণ্ডুলিপিটা দু'টুকরো করলাম, প্রতিটি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলাম, মাথা থেকে টুপিটা খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললাম আর পা দিয়ে ডলতে লাগলাম। "আমি শেষ!" ফিসফিস করে নিজেকে বললাম। "ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শেষ হয়ে গেছি!" আমি যতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে টুপিটাকে পদদলিত করতে লাগলাম, ততক্ষণ আর একটা কথাও বললাম না।

একজন পুলিশ কিছু দূরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাকে নজর করছিল। আমি মাথা তুলতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হয়তো ও অনেকক্ষণ ধরেই ওখানে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। আমি টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে ওর কাছে গেলাম।

"এখন ক'টা বাজে বলতে পারেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি। ও একটু থেমে ঘড়িটা টেনে বার করল, আমার দিক থেকে চোখ সরাল না।

"প্রায় চারটে বাজে।" ওর উত্তর।

"একদম সঠিক," আমি বলি, "প্রায় চারটে, একদম সঠিক। আপনি আপনার কাজ জানেন, আপনাকে আমার মনে থাকবে।" তারপর আমি চলে এলাম। ও আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল, ওর মুখটা হাঁ হয়ে আছে, হাতে তখনও ঘড়িটা ধরা।

আমি রয়্যাল হোটেলের সামনে এসে পেছন ফিরে তাকালাম। ও তখনও একই ভঙ্গিতে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

হাঃ হাঃ! এই সব বদ্‌মায়েশদের সাথে এইরকম ব্যবহারই করতে হয়। এইরকম সূক্ষ্ম ঔদ্ধত্য! এতে এই বদ্‌মায়েশগুলো প্রভাবিত হবে– ঈশ্বরের প্রতি ভয় জন্মাবে... আমি অদ্ভুতভাবে সন্তুষ্টি লাভ করলাম আর গানের একটা কলি গাইতে শুরু করলাম। আমার প্রতিটি স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। আর কোনো যন্ত্রণাবোধ নেই, কোনোরকম অস্বস্তিবোধ সম্বন্ধে সচেতন নই, আমি পুরো বাজার-চত্বরটা হেঁটে চললাম, পালকের মতো হাল্‌কা। স্টলগুলোর কাছে এসে থামলাম আর আমাদের পরিত্রাতার গির্জার কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। আধা গিনিটা ফেরত দিলাম কি দিলাম না, তাতে কি যায় আসে? যখন ওটা আমি পেয়েছিলাম, তখন ওটা আমার হল; আর যেখান থেকে ওটা এসেছিল, সেখানে নিশ্চয়ই অভাব ছিল না। তাছাড়া, যেহেতু ওটা আমার জন্যই পাঠানো হয়েছিল, সেহেতু আমাকে ওটা নিতেই হত। পত্রবাহককে ওটা রাখতে দেওয়ার তো কোনো মানেই হয় না। আবার ওটা ফেরত দেওয়ারও কোনো মানে হয় না, একটা পুরো আধা-গিনি, যেটা আমাকেই পাঠানো হয়েছে। কাজেই, কিছু করার নেই।

আমার চারপাশের বাজারের কলরব শুনতে আর নিজের মনটাকে আজে-বাজে ভাবনায় সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফল হলাম না। ওই আধা-গিনি আমার সমস্ত চিন্তা দখল করে আছে। শেষকালে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে প্রচণ্ড রেগে গেলাম। ওটা ফেরত দিলে ও কষ্ট পাবে। তাহলে করবটা কি? আমি তো সবসময়েই নিজেকে ভালো প্রমাণ করবার চেষ্টা করতাম, মাথা হেলিয়ে বলতাম, "না, ধন্যবাদ!"– এখন বুঝতে পারছি, এর ফল কী হয়! আবার রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সুযোগ থাকতেও আমি ওই আবাসের উষ্ণ আতিথেয়তা ধরে রাখতে পারিনি। না; আমার অহংকার দেখাতে হবে, প্রথম কথাতেই লাফিয়ে উঠতে হবে আর দেখাতে হবে যে, আমি এমন একটা মানুষ, যাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না, ডাইনে-বাঁয়ে আধা গিনি ছুঁড়ে ফেলতে হবে, তারপর নিজের পথে চলে যেতে হবে... ওই আবাসের উষ্ণ আশ্রয় ছাড়ার জন্য আর নিজেকে এই অসহায় দুর্দশার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আমি নিজেকেই দোষারোপ করতে লাগলাম।

বাকি যা কিছু, সব শয়তানের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমি আধা-গিনিটার জন্য ভিক্ষা চাইনি, হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি, এমন মানুষকে, যার সঙ্গে আমার আর কখনো দেখাই হবে না। এই রকমের মানুষ আমি। ধার শোধ করার

জন্য আমার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দিয়ে দিই। আর আমি যদি ইয়ালাজালিকে ঠিকমতো চিনে থাকি, সে-ও আমাকে টাকাটা দেওয়ার জন্য কোনো অনুশোচনা করবে না; কাজেই এইখানে বসে বসে রাগে ফুলতে থাকার কোনো মানে হয়? সোজা কথায় বলতে গেলে ওর মাঝে মাঝে আমাকে আধা গিনি পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না। কারণ বেচারী মেয়েটি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে– হাঃ! হয়তো মারাত্মকভাবে প্রেমে পড়ে গেছে... আমি বসে বসে এই সব কল্পনা করে ফুলে উঠতে লাগলাম। কোনো সন্দেহ নেই, হতভাগ্য মেয়েটি আমার প্রেমে পড়ে গেছে!

পাঁচটা বাজল! আবার আমি দীর্ঘ স্নায়বিক উত্তেজনায় ডুবে গেলাম। মাথার ভেতর একটা ফাঁপা ঘরঘরে আওয়াজ আবার শুরু হল, আমি সোজা তাকিয়ে রইলাম সামনে, দৃষ্টি স্থির আর সামনের ওষুধের দোকানের ওপর নিবদ্ধ। এই মুহূর্তে আমার পেটের ভেতর খিদে ধুন্ধুমার লড়াই চালাচ্ছে আর আমার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এইভাবে বসে সামনে শূন্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা অবয়ব একটু একটু করে আমার স্থির দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠতে লাগল। শেষপর্যন্ত আমি ওটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম আর চিনতেও পারলাম। এটা হচ্ছে সেই কেক-বিক্রেতা মেয়েলোকটা, যে ওই ওষুধের দোকানের পাশেই সাধারণত বসে। আমি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে ওষুধের দোকানের দিকে চললাম। কোনো বাজে কথা নয়! ওটা পাপের বেতনই হোক্ কিংবা সৎপথে রোজগার করা নরওয়েজিয়ান মুদি দোকানের রৌপ্য মুদ্রাই হোক, তাতে আমার কী? আমি আর ঠকতে চাই না; অতিরিক্ত অহংকার করে মরব নাকি?

আমি ওখানে গিয়ে মেয়েলোকটাকে ভালো করে জরিপ করলাম, তারপর ওর সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। একটু হাসলাম, পরিচিত লোকের প্রতি মাথা নাড়ার মতো করে মাথা নাড়লাম আর এমনভাবে কথা সাজালাম, যাতে মনে হবে যে, এটা তো জানাই ছিল যে, আমি কোনো না কোনোদিন ফিরে আসব।

"গুড ডে," আমি বললাম, "বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না?"

"না," ও ধীরে বলল আর আমার দিকে চাইল।

আমি আরও একটু হাসলাম, যেন ও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, ভান করছে যেন আমাকে চেনে না, তারপর বললাম, "মনে পড়ছে না, একদিন তোমাকে অনেকগুলো রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলাম? ওই সময় আমি কিছু বলিনি, কারণ ওটা আমার স্বভাব নয়। যখন সৎলোকের সঙ্গে লেনদেন হয়, তখন কোনো চুক্তি করার, মানে তুচ্ছ ব্যাপারে কোনো চুক্তি-পত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। হাঃ হাঃ! হ্যাঁ, আমিই তোমাকে টাকাগুলো দিয়েছিলাম।" "না, মানে, আপনিই সেই লোক? হ্যাঁ, এখন আপনাকে মনে পড়ছে বটে... "

ও আমাকে টাকাটার জন্য ধন্যবাদ দেবার আগেই বাধা দিতে চাইলাম, আর তাই ওর টেবিলে খাবার জিনিস কিছু আছে কিনা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "হ্যাঁ, এখন আমি এসেছি কেকগুলো নিতে।"

ও ঠিক বুঝতে পারল না।

"কেক," আমি আবার বললাম, "আমি ওগুলো নিতে এসেছি, নিদেনপক্ষে, প্রথম কিস্তিতে। আজকেই আমার সব চাই না।"

"আপনি কেকগুলো নিতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি তো কেক নিতেই এসেছি," আমি জবাব দিলাম আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম, যেন প্রথম থেকেই ওর বোঝা উচিত ছিল যে, আমি কেক নিতেই এসেছি। টেবিল থেকে একটা কেক তুলে নিলাম, একটা সাদা রোল আর খেতে শুরু করে দিলাম।

এসব দেখে মেয়েলোকটা অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠল, ওর জিনিসগুলো বাঁচানোর জন্যে একটা অনিচ্ছুক প্রয়াস নেবার চেষ্টা করল আর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে, আমি ওর জিনিসগুলি নেবার জন্যে ফিরে আসব, এটা ও আশা করেনি।

"তাই নাকি?" আমি বললাম, "সত্যিই, তাই নাকি?" ও নিশ্চয়ই একজন অসামান্যা মহিলা। ওর কি কোনো সময় এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কেউ এসে ওকে একগাদা শিলিং দিয়ে গেল আর ফিরে আসবে না বা দাবী করবে না বলে? না, না, ভেবে দেখ! তুমি কি ভাবছ, ওটা চোরাই টাকা, যেটা আমি তোমাকে সেদিন দিয়ে গিয়েছিলাম? না, সে তা ভাবে না। বেশ, তাহলে তো ভালো কথা, খুব ভালো কথা! আমাকে যে একজন সৎ মানুষ ভাবছে, সেটা তার অনুগ্রহ! হাঃ হাঃ! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, সে অত্যন্ত ভালোমানুষ!

তাহলে আমি কেন ওকে টাকাটা দিয়েছিলাম? মেয়েলোকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর সেকথা জোরে জোরে বলছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, ঠাণ্ডা মাথায়, জোর দিয়ে বুঝিয়ে বললাম কেন আমি ওকে টাকাটা দিয়েছিলাম। এরকম করা আমার স্বভাব, কারণ আমি মানুষের ভালোত্বে বিশ্বাস করি। যদি কখনও কেউ এর জন্য চুক্তি করতে চায়, তাহলে আমি বলি, না ধন্যবাদ! ভগবান জানেন আমি ঠিক তাই করি।

কিন্তু তবু মেয়েলোকটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। আমি ওকে বললাম, এর আগে কেউ কি কখনও ওকে এইভাবে অগ্রিম দিয়ে যায়নি? বললাম, যাদের টাকা আছে, তারা এইরকমই করে থাকে, যেমন রাষ্ট্রদূত? কখনোই না। কিন্তু তার জন্য আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে কেন, যদি এই ধরনের ব্যাপার ওর সঙ্গে না হয়ে থাকে? বিদেশে তো হামেশাই এই রকম ভাবে লেনদেন হয়। ও কি কখনো দেশের বাইরে যায়নি? তাহলে তো এই ব্যাপারে ওর কোনো মতামতই থাকতে পারে না... আমি আরও অনেকগুলো কেক টেবিল থেকে তুলে নিলাম।

ও রাগে গরগর করতে করতে আমার হাত থেকে একটা কেক ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল আর গোঁয়ারের মতো আমাকে আরো কেক দিতে অস্বীকার করল। আমি রেগে গেলাম, টেবিলে চাপড় মারলাম, পুলিশ ডাকব বলে হুমকি দিলাম। আমি বললাম, আমি ওর প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছি, নইলে যে

প্রচুর টাকা আমি ওকে দিয়েছি, তার পরিবর্তে আইনত আমি ওর টেবিল একদম খালি করে দিতে পারি। কিন্তু আমি এত চাই না, শুধু আমার দেওয়া টাকার অর্ধমূল্যের মাল চাই আর কথা দিচ্ছি, আর কখনো ওকে কষ্ট দিতে আসব না। ভগবান আমাকে এইরকম প্রাণীর হাত থেকে বাঁচান... শেষ পর্যন্ত ও আমাকে আরো কয়েকটা কেক দিল, চার-পাঁচটা, অসম্ভব চড়া দামে আর ওগুলো নিয়ে আমাকে চলে যেতে বলল। আমি ওর সঙ্গে দরাদরি শুরু করলাম, বললাম যে, ও অন্তত এক শিলিং আমাকে ঠকাচ্ছে, তাছাড়া অন্য কেকগুলোর জন্য অসম্ভব চড়া দাম ধরেছে। "তুমি জানো যে, এরকম লোক ঠকানোর ব্যবসা করলে তার শাস্তি আছে?" আমি বললাম, "ঈশ্বর রক্ষা করুন, মূর্খ মেয়েছেলে, এর জন্যে তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে, তুমি জান?" ও তাড়াতাড়ি আরো একটা কেক আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে আমাকে চলে যেতে বলল।

আমি চলে এলাম।

হা! এই অসৎ কেক-বিক্রেতার কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। বাজারের মধ্যে যতক্ষণ আমি এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করছি আর কেক খেয়ে চলেছি, আমি জোরে জোরে এই মেয়েলোকটার নির্লজ্জতার কথা, আমাদের দু'জনের কথোপকথন, সব বলে যাচ্ছি। আমার মনে হল, ওকে হারিয়ে দিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমিই জিতেছি। সকলের সামনেই আমি কেক খেয়ে চলেছি আর বকবক করে চলেছি।

কেকগুলো একটার পর একটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওগুলো যে কোথায় গেল, বুঝতেই পারলাম না। যতই খাই না কেন, আমি তখনও রাক্ষসের মতো ক্ষুধার্ত। ঈশ্বর, এই কেকগুলোতে কোনো কাজ হল না! এতই রাক্ষসী খিদে যে, শেষ ছোট কেকটাও আমি খেতে যাচ্ছিলাম। প্রথম থেকেই আমি ভেবে রেখেছিলাম যে, এটা আমি খাব না, সরিয়ে রেখে দেব, সেই ভন্‌ম্যান্‌স্‌গেড-এর ছোট্ট ছেলেটার জন্যে, যে কিনা বসে বসে কাগজের টুকরো নিয়ে খেলছিল। আমি সবসময়েই ওর কথা ভেবেছি, ও যখন লাফ দিয়ে উঠে গাল দিতে লাগল, সেই মুখটাও ভুলিনি। লোকটা যখন ওর ওপর থুতু ফেলল, ও তখন জানালার দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। ও ওপরে তাকিয়ে দেখছিল, আমিও ওর দিকে তাকিয়ে হাসছি কি না। ঈশ্বর জানেন, ওই পথে গেলে ওর দেখা পাব কিনা।

আমি ভন্‌ম্যান্‌স্‌গেড পৌঁছনোর জন্য জোর কদমে হাঁটা শুরু করলাম, ওই জায়গাটা পার হয়ে গেলাম যেখানে আমার নাটকের পাণ্ডুলিপিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলাম, সেখানে এখনও কিছু ছেঁড়া কাগজের টুকরো পড়ে আছে, আমার ব্যবহারে অবাক হয়ে যাওয়া পুলিশটাকে এড়িয়ে গেলাম আর সেই ধাপগুলোর কাছে পৌঁছলাম, যেখানে বাচ্চাটা বসে ছিল।

ও ওখানে নেই। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা; গোধূলি নামছে, আর ওকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো ও ওর বাড়িতে ঢুকে গেছে। আমি কেকটা সিঁড়ির ধাপের

ওপর রেখে দরজায় দাঁড়িয়ে জোরে আওয়াজ করে ধাক্কা দিলাম, তার পরেই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। "ও নিশ্চয়ই ওটা দেখতে পাবে," আমি নিজেকে বললাম, "ও বাড়ি থেকে বেরোলেই প্রথমেই কেকটা ওর চোখে পড়বে।" ছোট ছেলেটা কেকটা দেখতে পেয়েছে, এটা ভাবতেই আমার দুটো চোখ আনন্দে জলে ভরে গেল।

আমি আবার জাহাজঘাটায় এসে গেলাম।

এখন আর আমার ক্ষুধার বোধ নেই, শুধু অতগুলো মিষ্টি কেক খাওয়ার দরুন শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে। আমার মাথায় নতুন করে দুরন্ত সব চিন্তা জেগে উঠতে লাগল।

ধর, আমি যদি গোপনে ওই জাহাজগুলোর একটার জেটিতে বাঁধা দড়িগুলো সব কেটে দিই? ধর, আমি যদি হঠাৎ "আগুন, আগুন" বলে চিৎকার করে উঠি? আমি জেটি ধরে হেঁটে আরও নিচের দিকে গিয়ে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে পড়লাম, দু'হাত ভাঁজ করে, আর বুঝতে পারলাম, আমার মাথায় ধীরে ধীরে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি নড়ছি না, নিজেকে ঠিক রাখবার কোনো চেষ্টাই করছি না। শুধু বসে আছি, আর রাশিয়ার পতাকা লাগানো পাল-তোলা জাহাজ "কোপেগোরো"-র দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। জাহাজের রেলিং-এ একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। পোর্ট সাইডে যে লাল লণ্ঠনটা টাঙানো রয়েছে, ওটা ওর মাথার ওপর আলো ছড়াচ্ছে। আমি উঠে ওর কাছে গিয়ে কথা বলা শুরু করলাম। কথা বলার কোনো উদ্দেশ্য নেই, তাছাড়া ওর কাছে কোনো উত্তরেরও আশা করিনি। আমি বললাম, "ক্যাপ্টেন, আজ রাত্রেই কি নোঙর তুলছেন?"

"হ্যাঁ; আর কিছুক্ষণ পরেই," লোকটি বলল। ও সুইডিশ ভাষায় কথা বলল।

"হুঁ, আপনার কি কোনো লোকের দরকার পড়বে?"

এই মুহূর্তে, অস্বীকার করবে, কি, করবে না, এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। লোকটি যে জবাবই দিক্ না কেন, আমার কাছে সব সমান, কাজেই আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কী জবাব দেয়।

"না," ও জবাব দিল, "অবশ্য যদি না একটি অল্পবয়েসি যুবক হয়!"

"অল্পবয়েসি যুবক!" আমি সটান্ সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, চুপিসারে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরে গ্যাংওয়ে ধরে জাহাজের ডেকে গিয়ে উঠলাম।

"আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই," আমি বললাম, "কিন্তু যে কোনো কাজ দিলে আমি করতে পারব। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমরা যাচ্ছি লিথ-এ, ক্যাডিজ-এর জন্য কয়লা তুলতে।"

"ঠিক আছে," আমি নিজেকে এগিয়ে দিলাম, "যেখানেই যাই না কেন, আমার কাছে সব সমান। আমি শুধু আমার কাজ করে যেতে চাই।"

"তুমি আগে কখনো সমুদ্রযাত্রা করনি?" ওটা জিজ্ঞেস করলেন।

"না; কিন্তু আপনাকে যেমন বললাম, আমাকে যে কাজ দেবেন, আমি তাই করে ফেলব। সব কাজই আমি কিছু কিছু করতে পারি।"

উনি চিন্তা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যেই আমি নিশ্চিতভাবে ভেবে নিয়েছি যে, আমি এই সমুদ্রযাত্রা করবই, আর তাই আবার আমাকে ডাঙায় নামিয়ে দেবে ভেবে আমার ভয় হল।

"কি ভাবছেন, ক্যাপ্টেন?" আমি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলাম। "আমি সত্যিই যা দেবেন, সেই কাজই করতে পারব। কি বলছি? যা কাজ দেবেন, তার চেয়ে বেশিই করে দেব। আমি একটানা দুটো নজরদারির কাজ করতে পারি, যদি দরকার হয়। এতে আমার ভালোই হবে, আর আমি এটা করতেও পারি।"

"বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাক। যদি তোমার দ্বারা না হয়, তাহলে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।"

"নিশ্চয়ই," আমি আনন্দে বলে উঠলাম, আর বারবার বলতে লাগলাম, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি, যদি আমার দ্বারা কাজ না হয়।

এবং উনি আমাকে কাজে লাগালেন...

খাড়িতে এসে আমি নিজেকে টেনে তুললাম, জ্বর আর নিঃশেষিত ভিজে ভিজে শরীর, ডাঙার দিকে তাকালাম আর ক্রিশ্চিয়ানা শহরকে আপাতত বিদায় জানালাম। শহরে তখন সব বাড়িতে জানালাগুলো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

১৮৫৯ সালে উত্তর নরওয়েতে এক চাষির ঘরে ন্যুট হ্যামসুন-এর জন্ম হয়। তিনি অল্পবয়সেই কাজ শুরু করেন এবং সব-রকমের কাজ করতে পারা জীবন কাটাতে থাকেন। ১৮৮০ তে তিনি দুবার আমেরিকাতে গিয়ে কিছু সময় কাটান। তাঁর প্রথম উপন্যাস হাঙ্গার (১৮৯০)। হ্যামসুন তৎকালীন উপন্যাসের সামাজিক আবিষ্টতাকে পরিহার করেছিলেন এবং তাদের মনের অচেতন প্রাণস্পন্দনকে উপেক্ষা করাকে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস 'মিষ্ট্রিজ' (১৮৯২)-এর মাধ্যমে নতুন ধারার সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত, তা প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। হ্যামসুন-এর অন্যান্য নামকরা উপন্যাসগুলি হল, প্যান (১৮৯৪) এবং ভিক্টোরিয়া (১৮৯৮)। হ্যামসুনের মৃত্যু হয় ১৯৫২ সালে এবং তারপর থেকেই বিপুল সংখ্যক পাঠক তাঁর অসাধারণ অন্তদৃষ্টি এবং কল্পনাশক্তি প্রসূত সাহিত্যকীর্তির প্রতি আকর্ষিত হতে থাকেন।

অনুবাদক : **সৌরীন নাগ** কবিতা, ছড়া এবং গান লেখেন। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। জন্ম বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায়। অনেক ছোটবেলায় দেশ ছেড়েছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় বাস করেন। অপরাধ ও দুর্নীতি দমন পেশায় কেটেছে কর্মজীবন। এ পর্যন্ত সাতটি বই অনুবাদ করেছেন।

হাঙ্গার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯০ সালে এবং এর প্রভাব এখনো স্তিমিত হয়নি।

–লন্ডন রিভিউ অফ বুক্‌স্

আধুনিকতার পথপ্রদর্শক একটি সাহিত্যকর্ম... কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন, কখনো কৌতুককর, কখনো বা স্মৃতি-জাগরুক, বিরক্তিকর। মানবাত্মার গভীরে একটা জাদুকরী ভয়ানক অন্তর্দৃষ্টি। সকলেরই পড়া উচিত।

–দ্য আইরিশ টাইম্‌স্

অসাধারণ... লেখকের অসহায় অবস্থার মধ্যেও সুতীক্ষ্ণ রসবোধের পরিচয়, এটাই বইটির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ...হতাশা এবং সাহিত্যিক দায়বদ্ধতার মিশ্রিত ফলাফলের যে চকমপ্রদ বর্ণনা... মন কেড়ে নেয়া।

–দ্য স্কট্‌সম্যান

প্রচলিত উপন্যাসগুলির মধ্যে এটি এমন একটি, যা মনকে ভীষণভাবে বিচলিত করে।

–টাইম আউট

ISBN 984 70209 0033 7
9 847020 900337